হতাশা নয়—জীবনকে উপভোগ করুন

শ্রীমধুসূদন

নবপত্র প্রকাশন / কলিকাতা-৭৩

- প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৫৯
- প্রকাশক : প্রসূন বসু
  নবপত্র প্রকাশন
  ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩
- কম্পোজ : রঘুনাথ প্রেস
  ৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৬
- মুদ্রক : লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং
  ২০৯ এ বিধান সরণী/ কলিকাতা- ৭০০ ০০৬
- প্রচ্ছদ : প্রতাপ গঙ্গোপাধ্যায়

উৎসর্গ ____________

যারা জীবনের অন্বেষণে জীবনকে কাছাকাছি পেতে চাইছেন— খুঁজছেন জীবনের উদ্দেশ্য আর শান্তির স্বর্গ তাদেরকে ——

শ্রীমধুসূদন রচিত গ্রন্থাবলী

ধর্মগ্রন্থ :

১। শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর কৃষ্ণ অভিসার (ড: নিমাই সাধন বসুর ভূমিকা সম্বলিত)
২। শ্রীশ্রী কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি বিলাস (ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদরসানন্দবন মহারাজের ভূমিকা)
৩। শত কৌরবের শত কাহিনী (ড: অসিত মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা)
৪। কৃষ্ণ আমার আমি কৃষ্ণের
৫। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরসসুধা
৬। শ্রীমদ্ভাগবত (পাঠ ও আলোচনা)

উপন্যাস :

১। ভুলি নাই প্রিয়া
২। সম্রাট নন্দিনী
৩। পরপুরুষ পরমপুরুষ
৪। মানুষ-অমানুষ-বনমানুষ
৫। সীমানা ছাড়িয়ে
৬। শ্বেত পায়রার ডানা
৭। নিষিদ্ধ সমাজ
৮। এই স্বর্গ এই নরক

কিশোর সাহিত্য :

১। আজব কাহিনী আফ্রিকা রজনী

কাব্য :

১। মুখোশের কম্পিটিশন্
২। যেখানে যাই
৩। মুক্তিস্নান

নাটক :

১। ভুলে ভরা পৃথিবী
২। রক্তে রাঙা দাসপুর
৩। বেইমান পৃথিবী
৪। বিদ্রোহী ভগবান
৫। শেষ বিচার
৬। শয়তান কাঁদে ভগবান কাঁদে
৭। সন্তান না শয়তান

মনস্তাত্ত্বিক গ্রন্থমালা :

১। হতাশ হবেন কেন
২। সংসার—বিবাহ ও নারী
৩। সাংসারিক কলহ ও শান্তির উপায়
৪। আয় বৃদ্ধি ও সঞ্চয় প্রকল্প
৫। হতাশা নয়—জীবনকে উপভোগ করুন

প্রাক্‌কথন

একের পর এক মানসিক যন্ত্রণায় সামান্য একটু উপশমের জন্যে এবং জীবনের উদ্দেশ্য কি তা বুঝতে গিয়ে মহান ব্যক্তিদের কাছ থেকে তিল তিল উপকরণ সংগ্রহ করে আমি রচনা করলাম আমার মনস্তাত্ত্বিক গ্রন্থমালা সিরিজের আবার একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ— **হতাশা নয়—জীবনকে উপভোগ করুন**।

সুখের আশায়, শান্তির সন্ধানে যখন আমি পথে বেরিয়ে পড়ি আকাশ যেন আমার সাথে হেঁটে যায়— বাতাস যেন আমার সাথে কথা কয়। কিন্তু পরক্ষণে কানে আসে ব্যর্থ আর্তনাদ— শৈশব থেকে বার্ধক্যের হাজার সমস্যা— নিদারুণ হতাশা আর পারিবারিক সংকট ও অশান্তি।

আমি এই গ্রন্থে সেইসব সমস্যার কিছু কিছু সমাধান করতে সচেষ্ট হয়েছি মাত্র। ইতিপূর্বে 'হতাশ হবেন কেন', 'সংসার-বিবাহ-নারী' এবং 'সাংসারিক কলহ ও শান্তির উপায়' গ্রন্থগুলিতে সংসার জীবনের বহুবিধ উপলব্ধি, দাম্পত্য সমস্যা, যৌন সমস্যা, বেকার সমস্যা এবং মানসিক চাপ সম্পর্কিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছি। তাই এই গ্রন্থে সন্তান পালন, সন্তানের ব্যক্তিত্ব, মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, প্রৌঢ়ত্বের অনুস্মৃতি ও বার্ধক্যের সমস্যার কিছু আলোকপাত করলাম। বিশেষ করে অসহায়-দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দিশেহারা প্রৌঢ় ও বার্ধক্য জর্জরিত মানুষদের আনন্দ দিতে আমার এই গ্রন্থের অবতারণা।

সামাজিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের সম্পর্ক, সুস্থ জীবনবোধ ও বাস্তববাদী চিন্তা গ্রন্থটির মধ্যে কোন কোন স্থানে হয়ত একই প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে— তা কোনমতেই এড়াতে পারিনি। আশা করি পাঠক পাঠিকাগণ নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

এই গ্রন্থের কথাগুলো যদি উপদেশের মত শোনায়, তাহলে জানবেন— সেটা আমার ঔদ্ধত্য নয়— প্রকাশের অক্ষমতামাত্র।

নিজের জন্য আলো জ্বালাতে এসে যদি আপনারা কিছুমাত্র আলো দেখতে পান তাহলে সেটাই হবে আমার এই গ্রন্থ লেখার সার্থকতা।

পরিশেষে আবার জানাই, এই গ্রন্থ আপনাদের বহুমুখী সমস্যাকন্টক জর্জরিত জীবনে তথা শোকে-ব্যথায়-বিপদে আপদে নতুন পৃথিবীর সন্ধান দেবে। কর্মে আনবে তৎপরতা, জড়তায় আনবে চেতনার আভাস, মনে আনবে রোমান্স, উদ্যম ও উদ্দীপনা আর হতাশায় আনবে আশার আলো।

এ গ্রন্থ প্রকাশে যারা সহযোগিতা করলেন, শ্রীযুক্ত আনন্দ মন্ডল ও দেবানন্দ মন্ডলকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন।

ধন্যবাদান্তে
বিনীত—
গ্রন্থকার।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

৭) আপনার উপরওয়ালা ভুল কথা বললেও প্রতিবাদ না করে সংযত থাকুন।
৮) গোষ্ঠী সংগ্রামে ভিন্নমতাবলম্বী হলেও শ্রেণিসংগ্রামে একমত থাকবেন।
৯) অযাচিত উপদেশ, অযাচিত সাহায্য ও বন্ধুত্ব থেকে বিরত থাকুন।
১০) সবাইকে অবগত করিয়েই দান—অথবা সামাজিক কাজকর্ম করবেন। তাতে সামাজিক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।
১১) শুধু হাত নয়, পা, মুখ-চোখ, কান—সবাই আপনার দানের কথা জানুক।
১২) সামাজিক ব্যাপারে কখনো আবেগপ্রবণ হবেন না।

◆ মনে রাখবেন ◆

১৩) You should not treat a man as a means whether the man is other or yourself.
১৪) Humanity is itself the aim.
১৫) Duty for duties shake.
১৬) সামাজিক ব্যক্তিত্ব অর্জনের জন্য আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বকে হত্যা করুন।
১৭) If you want to establish yourself as a social figure you first have to identify or detect the dominating forces of the society concern.
১৮) To be human is to be social.
১৯) Uncalled for help should not be offer always try to avoid undesirable fellows.
২০) Religion is no more a social force today.
২১) Ignoring political force you can not be a social figure.
২২) At first you make a faithful association.

◆ আত্মবিশ্বাস ও চরিত্রই জীবন ◆

১) আমাদের সবই আছে অভাব শুধু অন্তরের।
২) মানুষ পূজা পায় তার চরিত্রের জন্য।
৩) আমরা মহতের ভাব অভ্যাস করতে পারি না কেন?
৪) একজন লোক কেমন করে খাঁটী হতে পারে?
৫) আমাদের মধ্যে বোধজ্ঞানের অভাব কেন?
৬) আমরা মানুষ হতে বাধা পাচ্ছি কেন?

তৃতীয় অধ্যায়

মনসংযম ও আত্মদর্শন জীবনের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য

১৬) গেরুয়া পরলেই ধর্ম হয় না।
১৭) হতাশ প্রাণে আশার আলো দেওয়াই ধর্মের উদ্দেশ্য।
১৮) সকলের কল্যাণই আমাদের কল্যাণ।

◆ আত্মা-পরমাত্মা ও ভগবৎ জ্ঞান ◆

১) মানুষ কখনো মরে না, মরে তার দেহ।
২) ঈশ্বরকে বিশ্বাস করলে নিজেকে খুব মহান বলে মনে হবে।
৩) ভগবৎ মহিমা চারটি বস্তুর উপর নির্ভর করে।
৪) Material happiness is like the mirage of water in the desert.
৫) All our sufferings are due to ignorance.
৬) Without krishna consciousness every one must suffer.
৭) মানুষের ক্ষেত্রে ভগবানহীন জীবন অশান্তিজনক।
৮) A great amounts of money will never give you satisfaction.

চতুর্থ অধ্যায়

ক) বার্ধক্য দশায় শান্তির উপায় ঃ

১) সাধারণ দৃষ্টিতে বার্ধক্যের রূপ।
২) বার্ধক্য জীবনের শেষ দশা।
৩) বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা ও নানাবিধ ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা।
৪) প্রাতঃভ্রমণের বিকল্প নেই।
৫) হাঁটুর বাত হলে কী করবেন? (ডাঃ জয়দেব হাজরার নির্দেশ)
৬) আজ থেকেই শরীরচর্চা ও জগিং করুন।
৭) শেষ জীবনে নেশা করা উচিৎ নয়।
৮) বৃদ্ধ বয়সে মাখন-ঘি থেকে বিরত থাকাই ভাল।
৯) ডায়বেটিস হলে করলা খেলে ভাল হয়। আলু থেকে একশ হাত দূরে থাকবেন।
১০) হাঁপানি রোগীদের পারফিউম এর গন্ধ ক্ষতিকারক।
১১) গ্যাসের রোগীরা কখনো পেট খালি রাখবেন না।
১২) প্রস্রাবে জ্বালা হলে কয়েকটি কথা শুনুন।
১৩) দাঁতের যন্ত্রণায় চিন্তার কারণ নেই।
১৪) দৃষ্টিক্ষীণতা দূর করতে দিনে ১০ বার চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দিন।

পঞ্চম অধ্যায়

১৮) শ্মশানেও বই উপদেশ দেয়— তাই বইকে বন্ধু করুন।
১৯) প্রসারিত বিশ্বদৃষ্টি থাকলে নিজেকে সুখী মনে হবে।
২০) সংসার অরণ্যে বার্ধক্য-জীবনকে কিভাবে রাখবেন?
২১) আজকাল কেউ কারো মনের কথা বুঝতে চেষ্টা করছে না।
২২) বাঁচার জন্য বাঁচতেই হবে, নিজের জন্য নিজেকে ভালবাসুন।
২৩) ছেলেরা আজকাল বৃদ্ধ বাবা-মাকে জীবনবীমার মত দীর্ঘদিন ধরে প্রিমিয়াম দিতে চাইছে না।
২৪) টাকাই এ যুগের পরমেশ্বর।
২৫) জীবন অর্থহীন ও বর্ণহীন হলেও আত্মহত্যা করবেন না।
২৬) দানে শান্তি আছে। বিভব থাকলে দান করুন।
২৭) আনন্দ পাওয়ার উপায় শুনুন।
২৮) স্ত্রী বিচ্ছেদ হলে সামর্থ অনুসারে পুনরায় বিয়ে করুন।
২৯) নিজেকে অপরাধী মনে হলে অনুশোচনা করুন।
৩০) সংসার পালন ইচ্ছায় হয় না।
৩১) যে আনন্দের স্থায়ীত্ব নেই— সে আনন্দ আনন্দই নয়।
৩২) সংসার যদি আপনার কাছে কসাইখানা মনে হয় তবে কি করবেন?
৩৩) সুখ শান্তির চারটি স্রোতে গা ভাসান।
৩৪) শেষ জীবনে দিগ্বিদিক্ রাঙিয়ে দিন।
৩৫) বৃদ্ধবয়সেই খ্যাতি যশ আর আপনার কৃতকর্মের মূল্যায়ন হবে।
৩৬) ধর্ম রক্ষা করুন— বার্ধক্যে শান্তি মিলবে।
৩৭) যথার্থ আনন্দ একা একা লাভ হয় না।
৩৮) পবিত্র থাকার সাতটি নিয়ম পালন করুন।
৩৯) বার্ধক্য উপভোগ করার গোপন কথা।
৪০) যোগী হতে পারলে শান্তি মিলতে পারে।
৪১) বার্ধক্যে সুখ আনয়নের ২৫টি পথ আছে।
৪২) গভীর শোকে প্রাণ খুলে কাঁদতে হয়।
৪৩) বার্ধক্যের ১নং বুলেটিন— সাবধান ও সচেতন থাকুন।
৪৪) কোন জীবনই ব্যর্থ নয়।
৪৫) ব্যস্ত হোন— সুস্থ থাকবেন।
৪৬) বুলেটিন—২
৪৭) বৃদ্ধাশ্রমে যেতে অসুবিধা বোধ করবেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

▶ সর্বব্যাপী ঈশ্বর দর্শন করুন ঃ

১) বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে ভগবান।
২) তিনি ছাড়া আমি নেই।
৩) মৃত্যুর ভয়ে ভীত হওয়া উচিৎ নয়।
৪) মৃত্যু আছে বলেই জীবনের এত তীব্রতা।
৫) মৃত্যু মানে নবজন্মের সূচনা।
৬) আত্মবিশ্বাস হারাবেন না।
৭) মৃত্যুর জন্য বার্ধক্য দায়ী নয়।
৮) আত্মবিশ্বাস শান্তির শ্রেষ্ঠ উপায়।
৯) মামেকং শরণং ব্রজ।
১০) আত্মশ্রদ্ধার গুণাবলি শুনুন।

অষ্টম অধ্যায়

· আনন্দ উপভোগ করতে একটি নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করুন ঃ

১) কি কি উপাদানে নতুন পৃথিবী তৈরী হবে?
২) কোনমতেই অন্তঃরাজ্যের ভিতটি বাইরের রাজ্যে স্থাপন করবেন না।
৩) নতুন পৃথিবীর চিন্তা কিভাবে করবেন?

নবম অধ্যায়

জীবনের শান্তি তুমি প্রভু দয়াময় - - - - - - - - -

Surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Don't fear!

তিনটি কথা

- জীবনের মূল্য পাচ্ছেন না? আজকের নির্বোধ, বিবেকহীন, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে সেই মূল্যবোধের আশা না করাই ভাল।
- যাঁরা আমাদের চলার পথের সন্ধান দেন, যাদের অবদান আমাদের জীবনে আদর্শ হয়ে আসে, যাদের ধরে আমরা উপরে উঠতে পেরেছি, যাদের দয়ায় আমরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছি— তাদের উপেক্ষা করা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা এবং তাঁদেরকে ভুলে যাওয়াটাই যেন আমাদের এ যুগের শিক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমরা কী আত্মবিস্মৃত ও আত্মঘাতী মানুষ বলেই চিহ্নিত হব?
- পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ করে নিজের অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাহলে জীবনের কোন সমস্যাই থাকবে না। স্মরণ রাখতে হবে আমাদের যা প্রাপ্য ভগবান তাই দিয়েছেন। তাতে শান্তি মিলবে। আবার যদি ভগবানের উপর বিশ্বাস না আনতে পারেন তাহলে প্রকৃতিকে ঐ ভগবানের জায়গায় বসিয়ে দিন, কাজ হবে। বিশ্বজগতকে ভগবৎময় মনে হবে।

প্রথম অধ্যায়

জীবনকে কিভাবে উপভোগ করবেন

জীবন যন্ত্রণাময়— একথা শুধু কাব্য সাহিত্যেই শোভা পায় না, প্রতিটি মানুষের মুখে শোনা যায়। এমনকি নিজের জীবনেও অহরহ অনুভব করছি কঠিন যন্ত্রণা, আবার অনেক ব্যক্তির মধ্যে জীবনযন্ত্রণা যেন ক্রনিক ডিজিজের মতো বাস করছে। এই যন্ত্রণা শারীরিক ও মানসিক— দুইই হতে পারে। শারীরিক অসুখ বিসুখের যন্ত্রণাতো প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে। রোগ-শোক ছাড়া কোন মানুষই নেই। এছাড়া রয়েছে মানসিক যন্ত্রণা, নানাবিধ দুশ্চিন্তা, পরীক্ষায় পাশ করতে পারব কিনা— ভবিষ্যতে আমার কি হবে— চাকরী পাব কিনা— কবে বাবা আমার বিয়ে দেবে— আমার বারবার মেয়ে জন্মাচ্ছে কেন— সংসারে এত টাকা পয়সা দিয়ে আমার লাভ কী— আমি ঋণ পরিশোধ করবো কি করে— কিভাবে আমার অসুখ সারবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার একধরণের হিংসাত্মক মনোভাব পাশাপাশি জীবনকে করছে বিধ্বস্ত। পাশের বাড়ীর লোকটিকে কীভাবে ফাঁসাব— কেমন করে ভাইকে জব্দ করব— কীভাবে ওকে হেয় করব— ওর চাকরীটা কীভাবে নষ্ট করব— কেমন করে ধাপ্পা দিয়ে. চিট্ করে নিজে ধনী হব— এইসব চিন্তাধারার শিকার হয়ে বহুবিধ জীবন প্রতিনিয়ত হতাশায় ভুগছে।

কিন্তু আজ আমাদের এই নিরাশা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। জীবন একটাই। We have only one life. যদি কেউ বলেন— 'আবার আসিব ফিরে', তিনি তা বলুন। তাঁকে অনুৎসাহিত করছি না। সেই আশাবাদী জন্মান্তরবাদীকে নমস্কার করি। যিনি বলেন মৃত্যুর পর মানুষ অমর জীবন লাভ করে স্বর্গে যায় তাকে ধন্যবাদ জানাই শত সহস্রবার। যারা বলেন, মৃত্যু মানে আত্মার পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ— তাকেও কোটি কোটিবার প্রণাম।

আমি কিন্তু বলছি মৃত্যু মানেই জীবন শেষ। তাই যা করবেন এখুনি করুন— যা ভাববেন এখুনি ভাবুন— যা হতে চাইছেন এখুনি তা চেষ্টা করুন— ব্যস্ত হোন, সুস্থ থাকুন। স্বর্গবিশ্বাসীরা মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়ে যদি আনন্দ পান তাহলে সে খুব ভাল কথা। তবে স্বর্গে যাবার জন্য গোঁড়া ধার্মিকের মত এ জীবনের ভোগ সুখ ত্যাগ করবেন না। তাতে ইহলোক-পরলোক— দুই লোকই নষ্ট হতে পারে। ন্যায়পথে এ জীবনকে উপভোগ করে চলুন— স্বর্গ যদি থাকে তাতে পদার্পণ করতে আপনার অসুবিধা হবে না।

যাই হোক, অত দূরে আমি যেতে চাইছি না, আমি এ জীবনের সুখভোগের কথাই বলছি। প্রথম থেকেই জীবনকে অবহেলা না করে উপভোগ করুন আর সেই সঙ্গে শেষ জীবনের জন্য সঞ্চয় করুন। বুদ্ধিমানেরা তাই করে।

বহুদিন আগে এক দেশে নিয়ম ছিল যে সে দেশের রাজাকে দশবছর রাজত্ব করার পর কোন এক দ্বীপে নির্বাসিত হয়ে থাকতে হবে। এভাবে দু'তিনজন রাজার নির্বাসনের পর পরবর্তী রাজা করলেন কি জানেন? আপন রাজত্বকালে তিনি একটি দূরবর্তী দ্বীপের সমৃদ্ধি সাধন করতে লাগলেন— যেস্থানে তার নির্বাসন হবে বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। তিনি কিন্তু নিজের দেশের শ্রীবৃদ্ধির সাথেই সেই স্থিরীকৃত নির্বাসন দ্বীপের সমৃদ্ধি সাধন করেছিলেন। তারপর সত্যসত্যই সেই বুদ্ধিমান রাজা নির্বাসিত হয়ে সেই স্থানেই বাস করতে লাগলেন। তাকে নির্জন দ্বীপের নির্বাসনের কষ্ট আর অনুভব করতে হল না, কারণ আগে থেকেই তিনি সেই দ্বীপকে লোকলস্করে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও রাস্তাঘাটের দ্বারা করেছিলেন সমৃদ্ধ।

তাই যৌবনের সুখস্বপ্নের আনন্দ উপভোগের সঙ্গে বার্ধক্যের জন্য সঞ্চয় করে রাখবেন। তাতে সারাজীবনই আনন্দে থাকতে পারবেন। তাবলে ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ নয়, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন নয়, নাতি এসে ঋণ শোধ করবে— একথাও নয়, সামর্থ্য অনুসারে সুযোগ বুঝে জীবনকে আনন্দের মোহনার দিকে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তা নাহলে টকের জ্বালায় ঘুরে ঘুরে তেঁতুলতলাতেই বাস করতে হবে।

যাই হোক, এখন জীবনকে উপভোগ করার কয়েকটি উপায়ের কথা বলছি, তা বিবেচনা করে দেখুন। ভাল লাগলে গ্রহণ করবেন, খারাপ হলে ক্ষমা করবেন।

(১) সংসারে জ্বালা যন্ত্রণা থাকবেই। সেগুলোকে জীবনের একপাশে বা একটি কক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখুন।

(২) রসিকতার দ্বারা সংসারের সমস্ত কঠোরতাকে ভেঙে দিন।

(৩) শ্যালিকা অথবা কোন বন্ধুর স্ত্রী অথবা পছন্দমত কাউকে নিয়ে ট্যুরে যান— বেড়িয়ে আসুন। কোন ব্যাপারে মনকে নীচ করবেন না। সামান্য ব্যাপারকে কঠোরভাবে গ্রহণ করবেন না, no seriously.

(৪) অনেক যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীকে মেলার ভীড়ে অহেতুক ঠেলাঠেলি খেতে দেখেছি, এটা একধরণের আনন্দ উপভোগ। এভাবে ওরা বিভিন্ন মেলায় ঘুরে বেড়িয়ে, পরস্পরকে চিমটি কেটে-স্পর্শ করে আনন্দ অনুভব করে। এইসব ছেলেমেয়েরা সারা বছরই কোন মেলার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। তবে এ বিষয়ে হুঁশিয়ার থাকতে হয়। তা না হলে চড় খাবার আছে খুব ভয়।

(৫) বেকার থাকার চেয়ে বেগার খেটে আনন্দ উপভোগ করুন, মানুষের সহানুভূতি পাবেন।

(৬) মিষ্টি মধুর শুভ্র হাসির দ্বারা (হিউমার) সরলভাবে বৌদিদের সাথে কথাবার্তা বলুন। মুখরোচক আলাপ জমিয়ে সময় অতিবাহিত করুন। **সাবধান, পা যেন না পিছলে যায়।**

(৭) সোমত্ত যৌবনবতী কুমারীকে দেখে সম্পর্ক সঠিক রেখে রহস্য হাসি ও গল্পগুজব করুন। যুবতীগণও সামাজিক কাজে যুবকদের নিয়ে আনন্দে মেতে থাকুন। ভাল লাগবে। তবে জানবেন সোমত্ত যৌবনবতীরা **ফুটন্ত তেলের কড়ার মত**। পাশ দিয়ে সাবধানে চলতে হয়। তাতে পড়ে গেলেই বিপদ।

(৮) নিজেকে বয়স্ক বলে কোনদিন ভাববেন না। বিজ্ঞানের নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার হেতু মানুষ এখন ৭০ বছর পর্য্যন্ত যৌবন রক্ষা করে চলেছেন, সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন। **আজকাল ৭০-এর পর মানুষকে প্রৌঢ় বলে ঘোষিত হয়েছে।** A person is as old as he feels. A man is old when he looks at the menu before he looks at the waittress.

(৯) বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে **মাঝে মাঝে ফিস্ট করুন**। জীবন রঙীন থাকবে।

(১০) আজকাল মানুষ সহানুভূতিসম্পন্ন হতে চলেছেন। **যুবকরা আজ বয়স্ক লোককে বুড়ো দাদু না বলে দাদা কিংবা কাকু বলতে শিখেছেন**। তাই বৃদ্ধবয়সে মন খারাপ করবেন না।

(১১) প্রেমিক-প্রেমিকাকে চিঠি লিখুন। সামর্থ্য থাকলে যাত্রা গান করুন। **মেয়েদের নিয়ে কীর্ত্তনের দল** করে বেরিয়ে পড়ুন।

(১২) **বিগত জীবনের ব্যর্থ প্রেমিকাকে/প্রেমিককে বৃদ্ধবয়সে স্ত্রীহারা অবস্থায় চিঠি লিখুন**। মজা পাবেন। যুবক বয়সে লিখবেন না। তাতে বাড়ীতে অশান্তি হবে। The poetry of the earth is never dead. সমস্ত কাব্য নিয়ে সারা পৃথিবী অপেক্ষা করে রয়েছে। আপনি সেই কাব্যটি পড়ে নিন।

(১৩) প্রৌঢ় বয়সে সেক্সের ট্যাবলেট খেয়ে মনকে, যৌনশক্তিকে চাঙ্গা রাখুন।

(১৪) আজকাল পুরুষকে স্ত্রী বানানো হচ্ছে। পয়সা থাকলে ডাক্তারবাবুর সাথে হাত মেলাতে পারেন।

(১৫) পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে মদ্য ও নারীসঙ্গ করতে পারেন। **তবে যেন আসক্ত না হন। তাতে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।**

(১৬) আপনি বিবাহিত হলেও যথাস্থানে পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে কোন অবিবাহিতা যুবতীর কাছে **নিজেকে বিবাহিত বলে প্রকাশ করুন। তারপর বাড়ীতে এসে বন্ধুদের কাছে গল্প করুন**। মজা পাবেন।

(১৭) পয়সা যদি বেশি না থাকে তাহলে যা আছে— তা দিয়েই বাজার করে এনে বাড়ীতে স্ত্রীকে বলুন— নিরুপমা, তোমার এক আত্মীয়ের সাথে কথা বলতে বলতে দেরী হয়ে গেল। শেষে আমাকে দোকানে বসিয়ে খাইয়ে তবে ছাড়ল। তারপর বাজারে গিয়ে দেখি, ফ্রেশ সব্জী সব আউট। তাই এই সামান্য বাজারপত্র করে আনলাম। দেখবেন, আপনার স্ত্রী হাসিমুখেই আপনাকে গ্রহণ করছেন। কারণ তাকে আপনি তার বাপের বাড়ীর কিংবা তার আত্মীয়ের কথা বলেছিলেন। **বাপের বাড়ীর কথা বললে এমন কোন স্ত্রী নেই যে সে উৎফুল্ল হবে না।**

(১৮) বাড়িতে থাকাকালীন **সর্বদা ফিট্‌ফাট জামাকাপড় পরে থাকুন।** বৃদ্ধবয়স হলে আরো বেশি পরিষ্কার পোশাক পরিচ্ছদ পরুন। নিজেকে খুশী মনে হবে। তাছাড়া সর্বদা প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদের খোঁজখবর নেবেন— খুব আনন্দের সাথে দিন কাটবে। বাড়িতে এমন ভাব নিয়ে থাকুন— বাহির থেকে কেউ এলে যেন সে ভাবতে পারে যে আপনি তার জন্যই অপেক্ষা করে আছেন। আমার দাদু এইরকম ব্যক্তি ছিলেন। বাইরের লোকের জন্য সর্বদা উন্মুখ হয়ে বসে থাকতেন— সবার প্রশংসাও করতেন আর সেজন্য পাড়ার সবাই তার খোঁজ রাখত ও ভালবাসত।

(১৯) **বয়সের এক একটি ধাপে— এক এক ধরনের মানুষকে ছেড়ে দিতে হয়।** সেটাই বয়স অতিক্রম করার উপায়। তাই হতাশা, দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে সমস্ত কিছু বুঝতে চেষ্টা করে খোলা মনে থাকুন।

(২০) আমার পাড়ার এক দাদুর বয়স ৯৫ বছর, শান্ত-সৌম্যভাব। পরপর অনেকগুলি শোকেও তিনি পাথর হয়ে পড়েননি। সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় পরে থাকেন। দেখে মনে হয় যেন— 'সৌম্য মূর্তি— ত্যাগের স্ফূর্তি চিত্ত চমৎকার।' তার চোখের সেকী অভিনব দৃষ্টি! চোখদুটি যেন আশীর্বাদ করছে। পরনে ইস্ত্রিকরা জামাকাপড়। পায়ে সুন্দর মানানসই জুতো। হাতে সুন্দর লাঠি, গলায় ওড়না। মুখখানি সদা পরিষ্কার। এমনভাবে সেজে থাকতেও যেমন আনন্দ লাগে তেমনি দেখতেও ভাল লাগে। **সর্বদা তার কাছে যেতে ইচ্ছে করে।**

(২১) সবাইকে ভালবাসুন। উচিত কথা বলবেন না। প্রয়োজনে ঘুরিয়ে কথা বলুন। অপরের কথায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও হুঁ দিন। সবাই ভালবাসবে।

(২২) যে যেমন ব্যক্তি তার সাথে সেইরকম **ঠান্ডা ইয়ারকি করুন।** গরম ইয়ারকিতে অঘটন ঘটতে পারে। আমার এক ঘনিষ্ঠ প্রাণের দোসর মিঃ হরপ্রসাদ চক্রবর্তী। কোন কারণে রহস্য করে তাকে চিঠিতে একবার লিখেছিলাম— 'তুমি একটি বিষকুম্ভ পয়োমুখম।' কথাটি তার সেন্টিমেন্টে এমনই ভাবে গেঁথেছিল, যার

ফল সে আমার সাথে ১৫ দিন দেখা করেনি। তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছিল।

(২৩) আপনি পৃথিবীর গাছপালা-আকাশ-বাতাস-সমুদ্র-নদী-পাহাড়-পর্বতকে খুব ভালবাসেন। কিন্তু আপনার আত্মীয়স্বজনের বিচ্ছেদব্যথায় আপনি কাতর হয়ে পড়লে আপনার ভালবাসার পৃথিবী আপনার প্রতি এতটুকুও সমবেদনা প্রকাশ করবে না। তারা একইভাবে হেসেই যাবে— গেয়েই যাবে— আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েই দিন কাটাবে। তাই আমাদেরকেও ওদের মত নির্বিকার হতে হবে— নিজের আনন্দে নিজেকেই মশগুল রাখতে হবে।

(২৪) একদিন যারা আপনার উপর পীড়ন করেছিল তারা আজ যদি কোন কারণে সহানুভূতি কিংবা উদারতা দেখায় তাহলে আপনি নিদাঘতপ্ত ধরণীতে প্রথম বর্ষার আবির্ভাবে বৃক্ষলতার আনন্দের মত আনন্দ উপভোগ করুন। অভিমান নয়, রাগ নয়, গোঁসা নয়, এসব ভাল লাগার কথা, এসব ভালবাসার কথা। **কেউ যদি কোনদিন আঘাত দিয়ে পুনরায় ভালবাসে তা আপনি অবশ্যই গ্রহণ করবেন। তবে দেখা দরকার, সেই ভালবাসার পেছনে কোন অভিসন্ধি আছে কী না!**

(২৫) জীবন হতাশাপূর্ণ নয়— দুশ্চিন্তা ঘেরা নয়— মৃত্যুর নামান্তরও নয়। **মৃত্যু আছে বলেই বেঁচে এত সুখ।** আজকাল মৃতদেহকে ডেড্ ব্যাঙ্কে/কোল্ড স্টোরে রাখা হচ্ছে। ব্যক্তি যে রোগে মরেছে ভবিষ্যতে সেই রোগের ওষুধ আবিষ্কার করে তাকে বাঁচানো হবে। তাকে নতুন হৃৎপিন্ড দিয়ে নতুন পৃথিবীর আলো দেখানো হবে, তাই নিজেকে ফুরিয়ে যেতে দেবেন না। এমন একদিন আসবে যেদিন দেহের প্রতিটি কলকব্জা একের পর এক পরিবর্তন করে মানুষকে স্বাভাবিকভাবে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা হবে। যেমন করে কোন একটা ইঞ্জিন বা যন্ত্রকে সাজিয়ে বা চেঞ্জ করে কোন বডিকে দীর্ঘস্থায়ী করা হয়।

(২৬) শরীরের সামান্য ছোটখাটো অসুখে চঞ্চল হবেন না। বাড়ীর কাউকে সামান্য ব্যাপারে বিব্রত করাবেন না। সব বিষয়ে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা দরকার।

(২৭) অন্তরকে আনন্দময়, স্বচ্ছ ও ধারণাপূর্ণ করুন— ভাল থাকা কঠিন হবে না। আসল কথা বোধশক্তির অধিকারী হতে হবে।

(২৮) কারো সাথে মতের অমিল যেন না হয়। মনের অমিল করবেন না। **মনের অমিল হলে কলহের সূত্রপাত হবে।** কারো মতামত পছন্দ না হলে সরাসরি প্রতিবাদ না করে বুদ্ধি দিয়ে ঘুরিয়ে কথা বলুন। না হয় চুপচাপ থাকুন। শান্তি পাবেন।

(২৯) চলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত না হয়ে ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

কোন দায়িত্ব বা পদ থেকে **কারণ যেতেই যখন হবে— তবে ছেড়ে দিতে কষ্ট কেন?**

(৩০) জীবনকে মায়া দিন— হৃদয় দিন। মানুষকে ক্ষমা করুন— তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষমা বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাই ক্ষমা করবেন ভেবে চিন্তে। ক্ষমা করা, ভালবাসা, স্নেহ মমতা দেখানোকে অনেকেই ভীরুতা, বোকামি, বা পাগলামীর নামান্তর বলে মনে করে থাকেন— কিন্তু তারা এটা চিন্তা না করেই বলে থাকেন। তাদের সে কথায় কারো কোন কিছু যায় আসে না। ভগবান মুখ দিয়েছেন— সরকার স্বাধীনতা দিয়েছেন, যে কেউ যখন তখন যেকোন কথা বলতেই পারে। সূর্যকে পাগল বলে খিস্তি করুন না— সে তবু আলো দেবে, মেঘ...... তবু জল দেবে, মাঠ তবু ফসল দেবে, গাছ তবু ফল দেবে। **কারো কোন কথাতে তাই কান না দিয়ে নিজের আনন্দে বিভোর হয়ে আপন আপন মহৎ কর্ম করে যান।** জীবন রঙিন ও উপভোগময় হয়ে উঠবে।

(৩১) সর্বদা মনে রাখবেন— অর্থের চেয়ে মনুষ্যত্ব অনেক বড়। তাই **মানুষকে— সমাজকে মনুষ্যত্ব দেখান। মনুষ্যত্বের অধিকারী হলেই অর্থ পাওয়া যাবে। অপরের বিশ্বাসী হবেন।**

(৩২) অর্থের প্রাচুর্য্যের অভাব হলে সপাসপ ডালভাতই খান। সেটাকেই ভাগ্য বলে মেনে নিন। আপনি কি কোনদিন দেখেছেন একটা ছাগল কী আনন্দে বট-অশ্বত্থ আর কাঁঠাল পাতা চিবোয়? সবুজ তৃণভূমিতে গবাদি পশুর চড়মড় করে ঘাস খাওয়ার স্বাদ ও আনন্দ আপনি কি কোনদিন উপলব্ধি করেছেন? ভাত খেতে বসে আপনি কি তাদের মত স্বাদ ও আনন্দ অনুভব করেন? মোটেই না। তাই বলছি মাংস ভাত নয়— বিরিয়ানি-কোপ্তা নয়, **গভীর আগ্রহ নিয়ে ডালভাত খাওয়ার স্বাদই আলাদা।** বেশী অর্থ থাকলেই জীবন উপভোগ করা যায় না। **উপভোগ করার মানসিকতা চাই।**

(৩৩) এই পৃথিবী সৃষ্টি হল কেন? কে কেমন করে সৃষ্টি করেছেন— **এই ভাবনার উৎস সন্ধানে জীবনকে অতিবাহিত করুন**— বৃদ্ধবয়সে আনন্দ পাবেন। জীবনে একঘেয়েমি লাগবে না।

(৩৪) মরণকে নিশ্চিত জেনে নিজেকে পার্থিব সম্পদ থেকে মনে মনে সরিয়ে রাখুন।

(৩৫) যিনি জীবনকে সব বয়সের সঙ্গে মিলিয়ে রাখতে পারেন— সেই রসিক ব্যক্তির জীবন সর্বদা উপভোগময়। সব বয়সের সঙ্গে তাই সমান ভাবে কথা বলতে চেষ্টা করা দরকার।

(৩৬) শহর-বন্দর অঞ্চলে বিদেশী দোকানদারগণ শরীর ম্যাসেজ্ করার দোহাই দিয়ে অর্থের বিনিময়ে অনেক যুবক যুবতীকে নিয়ে রাত্রিতে আনন্দ উপভোগ করে থাকেন। তারা বলে থাকে যে তারা বিদেশে থেকে যে আনন্দ উপভোগ করে গৃহের স্ত্রীসুখ তার কাছে অতি নগণ্য। জীবনকে উপভোগ করার এটা একধরনের উপায়।

(৩৭) অনেকে Live together হয়ে জীবন কাটিয়ে আনন্দ উপভোগ করেন। কেউবা Kept বা রক্ষিতা রেখে জীবনকে সুখের সাগরে মাতিয়ে রাখেন।

তবে যাই করুন, প্রতিটি জিনিসের সীমা আছে, **কোন ব্যাপারেই সীমা লঙ্ঘন করা উচিৎ নয়। সর্বম্ অত্যন্তম্ গর্হিতম্।**

মানব জীবনের উদ্দেশ্য

মানুষ অমৃতের পুত্র— পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। সে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক। মনুষ্যেতর প্রাণীরা আহার-নিদ্রা আর বংশবৃদ্ধি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মানুষের কিন্তু অনেক কাজ— অনেক উদ্দেশ্য। সারাজীবন ধরে তাকে অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়— অনেক সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে ও নিয়ে তাকে বাঁচতে হয়।

অনেকেই হয়ত বলবেন, গাভী দুধ দিয়ে মানুষের উপকার করে, ছাগল-মুরগী ডিম-মাংস দিয়ে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে— পাখীরা গান শুনিয়ে— বৃক্ষ ফল দান করে— সমুদ্র মেঘ সৃষ্টি করে— মেঘ বৃষ্টি দিয়ে— সূর্য রৌদ্র দান করে— বাতাস প্রাণ বাঁচিয়ে নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধন করে। ফলে মনুষ্যজীবন উপকৃত হয়। অতএব মানুষের চেয়ে পৃথিবীতে এদের ভূমিকা বেশি।

কথাগুলো সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু উল্লিখিত বিষয়গুলি ঘটে একটা প্রাকৃতিক নিয়মে। সৃষ্টিকে রক্ষার জন্যে সূর্যের আলোদান, বাতাসের প্রাণদান, মেঘের বৃষ্টিদান আর বৃক্ষ ও মাঠের ফল ও ফসল দান। এসব দান কিন্তু সৃষ্টির প্রথম থেকেই গতানুগতিকভাবে চলে আসছে। এদের মধ্যে চেতনাবোধ নেই— জ্ঞান বিবেক নেই; নেই কোন বৌদ্ধিক ক্রিয়াকলাপ আর মন ও মানসিকতা।

মানবজীবনের মধ্যে কিন্তু জ্ঞান বিবেক রয়েছে, ভিন্নমুখী চিন্তাধারা রয়েছে। মানুষ ইচ্ছা করলে স্বর্গে উঠতে পারে আবার নরকেও নামতে পারে— ঘরকে পর করতে পারে আর পরকে ঘর করতে পারে। তাই তার জীবনকে শৃঙ্খলের দ্বারা বাঁধতে হয় ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। মানুষকে একটা সুষ্ঠ পথ ধরে চলতে হয়— তা নাহলে সমাজে সে বাঁচতে পারে না। যাই হোক, মানুষকে কতগুলি উদ্দেশ্য নিয়ে জীবন পথে অগ্রসর হতে হয়।

আমি এখানে মনুষ্যজীবনের **তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যের কথা আলোচনা করব। প্রাথমিক বা জাগতিক উদ্দেশ্য**, দ্বিতীয়তঃ **সামাজিক উদ্দেশ্য** আর তৃতীয়তঃ **আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য।**

জীবনের প্রাথমিক বা জাগতিক উদ্দেশ্য

জাগতিক উদ্দেশ্য বলতে জগৎকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সংসারে এসে বিবাহ করা এবং সেই সঙ্গে সন্তান পালন করা। সংসারকে সুষ্ঠভাবে চালানো— মাতা পিতা ও ভ্রাতাদের মানিয়ে নিয়ে সংসারে সুখের স্বর্গ রচনা করাই মানবজীবনের জাগতিক বা প্রাথমিক উদ্দেশ্য। সামাজিক উদ্দেশ্য বলতে সমাজের মানুষকে ভালবাসা ও তাদের হিতসাধন করা। আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য বলতে ভগবৎ সান্নিধ্যলাভ করা। তবে যারা ভগবানে বিশ্বাস করেন না তারা দু'টি উদ্দেশ্য নিয়েই চিন্তা করবেন।

এ প্রসঙ্গে স্বামী স্বরূপানন্দজীর কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ উপদেশ তুলে ধরলাম। তিনি সংসারের যুবক -যুবতীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন— "হে আমার ভ্রাতা ও ভগ্নীবৃন্দ, তোমরা বিচার বিবেচনা পূর্বক বিবাহ করে সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হও। তাতে সুসন্তান আসবে। সহবাসকালে মহামানবদের কথা চিন্তা কর— মহাপুরুষ পুত্র জন্মাবে। তোমাদের মধ্যেইতো ঘুমিয়ে আছে বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-নেতাজী-রবীন্দ্র আর নজরুল। **তোমাদের বিবাহিত জীবনের পবিত্রতার উপর নির্ভর করছে অনাগত কালের মহাজ্ঞানী-মহাপ্রেমী অতিমানব।**

দেহ ও মনের একটিমাত্র স্পন্দন এবং কিছুমাত্র সামর্থ্যকে ব্যর্থ হতে না দিয়ে পরমপুরুষাকার প্রভাবে আত্মার কল্যাণের জন্য, দেশের কল্যাণের জন্য এবং জগতের কল্যাণের জন্য তোমরা সংযত হও। চাতুরী-মিথ্যাশ্রয় বাদ দিয়ে মানবতার পূজারী হও! সহমর্মিতার অধিকারী হও! অপরের দুঃখে দুঃখী ও অপরের সুখে সুখী হও! কঠোর আত্মদান ও আত্মোৎসর্গে কঠোর তপশ্চর্য্যায় তোমাদের দাম্পত্য জীবন— তোমাদের গার্হস্থ লীলা সার্থক হোক। অতিরিক্ত কামচর্চা নয়, বংশধারা রক্ষার জন্যই কামচর্চা। পশু পাখীদের ন্যায় অন্ধ তাড়নায় সন্তান জন্মদান করে যাওয়াই বিবাহের উদ্দেশ্য নয়। সুসন্তান লাভের জন্যই বিবাহ। যে পুত্র বলবান, বীর্যবান ও চরিত্রবান, সৎসাহসী ও পরার্থে আত্মোৎসর্গকারী, যে কন্যা বলবতী, বীর্যবতী ও চরিত্রবতী, সৎসাহসিকা, পরার্থে আত্মোৎসর্গকারিণী— তারাই সুসন্তান। যে পুত্র-কন্যা জীবনের গৌরব দিয়ে

পূর্বপুরুষদের কালিমা ঢেকে দেয় বা গৌরব বৃদ্ধি করে এবং পরপুরুষদের মধ্যে মঙ্গলের সম্ভাবনা জাগ্রত করে তারাই সুসন্তান। যাদের কাছে জীবন কর্মময়, মরণ কর্মের জন্য ক্ষণিক বিশ্রাম— তারাই সুসন্তান। এইসব সন্তানই আদর্শ সমাজ ও আদর্শ সংসার সৃষ্টি করতে পারে। এইসব সূর্যতেজী সন্তানরা যেখানেই যাবে সেখানেই বয়ে যাবে আনন্দের লহরী।

শুধু সন্তান জন্ম দিলেই হবে না, তাদের সম্পূর্ণভাবে মানুষের মত মানুষ করতে হবে।"

মানবজীবনে বিবাহের উদ্দেশ্য

জীবনের সুখ-শান্তি-আনন্দ-ভালবাসার জন্য বিবাহ একান্ত প্রয়োজনীয়। মানব জীবনে বিবাহের উদ্দেশ্যকে মোটামুটি সাতটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে— (১) জীবনের সাথী আনয়ন (২) ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি (৩) ইন্দ্রিয় দমন (৪) সন্তান উৎপাদন ও পালন (৫) দুঃখকষ্টের লঘুতা সাধন (৬) ব্যাভিচার পাপ থেকে নিবৃত্তি (৭) শেষ জীবনের সুখশান্তি আনয়ন।

(১) **জীবনের সাথী আনয়ন**— ক্লান্ত অবসন্ন জীবনে বিবাহ সুখ ও শান্তি দান করে। কর্মের একঘেয়েমিপূর্ণ জীবনে বিবাহ শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। সময়ে অসময়ে অসহায় পুরুষ বা স্ত্রীর কানে কে দেবে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা? অন্ধকার জীবনে কে জ্বালবে আশার আলো? কর্মক্লান্ত ব্যক্তিকে কে করবে শান্ত? সে হচ্ছে বিবাহ। মানুষের মনের কথা মানুষ কাকে জানাবে? কার কাছ থেকে যুক্তি পরামর্শ নেবে? স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া আর কে হবে সেই যুক্তি পরামর্শদাতা? তাই বিবাহের মাধ্যমে জীবনের সাথী আনয়ন করা একান্ত দরকার।

(২) **ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি**— বিবাহের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি হলেও ইন্দ্রিয়সুখে কখনো পরিতৃপ্তি সম্ভব নয়। দশ হাজার বছর যৌবন উপভোগ করেও রাজা যযাতির সুখতৃষ্ণা দূর হয়নি। শেষে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—

ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।।

কামের দ্বারা কাম কখনো দূরীভূত হয়না। ঘি দেওয়া আগুনের মতই তা ক্রমশঃ বর্ধিত হয়। দেহসুখের চেষ্টা করতে করতে যার সর্বাঙ্গ শিথিল হয়েছে, ভোগের সামর্থ্য চিরতরে চলে গেছে— কই, তার মুখে কখনো শুনিনাতো— নাঃ, বেশ তৃপ্তি পেয়েছি। আর চাই না।

"অঙ্গং গলিতং পলিতং মুন্ডং
দন্তবিহীনং জাতং তুন্ডং।
করধৃত কম্পিত শোভিত দন্ডং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশা ভান্ডম্।।"

তথাপি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য বিবাহ প্রয়োজন। তা নাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

(৩) **ইন্দ্রিয় দমন**— বিবাহ কামাচারকে প্রেমে পরিণত করে। মানুষের অসংযত উন্মাদনাকে শান্ত করে মানুষকে যথার্থ চরিত্রবান করে তোলে এই বিবাহ।

(৪) **সন্তান উৎপাদন ও পালন**— সন্তান জনন করে বংশ রক্ষা করা বিবাহের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। তা না হলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব এতদিন শেষ হয়ে যেত।

(৫) **দুঃখকষ্টের লঘুতা সাধন**— মানবজীবনে দুঃখকষ্টের লঘুতা সাধনের প্রথম উপায় শ্রমবিভাগ। দ্বিতীয় উপায় কষ্টে উপেক্ষা। সাংসারিক কর্মের অর্ধাংশ যখন স্ত্রী নিজ স্কন্ধে বহন করে তখন স্বামীর বিশ্রামের অবসর ঘটে। গৃহস্থকে যদি সংসারের রান্না বাড়া থেকে অর্থ উপার্জন প্রভৃতি সমস্ত কাজ করতে হত তাহলে জীবন সংগ্রাম কঠোর হয়ে উঠত। প্রাণান্ত শ্রমে ক্লান্ত অথবা অসুস্থ হয়ে পতি যখন তার প্রেমপ্রতিমা-স্নেহনির্ঝরিণী-তরলিত চন্দ্রিকা-হাস্যময়ী সহধর্মিণীর কথা মনে করে তখন সে তার দুর্বল হৃদয়ে নতুন বল পায়— রোগজীর্ণ অবশ দেহ গৃহিণীর সাহচর্যে নবজীবন লাভ করে। প্রেম দুঃখকে জয় করার ক্ষমতা দেয়, অগ্নির দাহিকা শক্তিকে স্তব্ধ করে, তুষারের শীতলতাকে বাষ্পীভূত করে। পুরুষের দুঃখব্যথায় মমতাময়ী নারীই পারে সমবেদনা জানাতে। নারীর সহানুভূতি আর সাহচর্যেই পুরুষের জীবন হয় প্রস্ফুটিত ও সার্থক এবং প্রাণচঞ্চল।

(৬) **ব্যাভিচার পাপ থেকে নিবৃত্তি**— বিবাহ করে নিজ স্ত্রীতে অনুরক্ত থাকলে মানুষ ব্যাভিচার পাপ থেকে নিবৃত্ত হবে। পরস্ত্রীতে আসক্তি উৎপন্ন হলে নিজ স্ত্রীর কথা মনে পড়বে। নিজের স্ত্রী যদি এই ব্যাভিচারের কথা জানতে পারে তাহলে স্বামীর পক্ষে তা অমঙ্গলজনক ও অকল্যাণকর হবে। তাই সমাজে বিবাহের প্রয়োজন আছে। এছাড়া—

(৭) **শেষ জীবনের সুখশান্তির পথ পরিষ্কার রাখা**— বিবাহের দ্বারা সন্তান সন্ততি উৎপাদন করলে সেই ছেলেমেয়েরা আপনার শেষ জীবনে সেবাযত্নের দ্বারা আপনাকে সুখে রাখবে। আজকাল হয়ত এটার ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এখনো ধর্মপরায়ণ পুত্র-কন্যা আছে যারা বৃদ্ধ মা-বাবাকে স্নেহভক্তির বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। তাই মানুষের পক্ষে বিবাহ একান্ত আবশ্যক।

আদর্শ দম্পতির কি কি আবশ্যক

জীবনের জয়যাত্রার পথে আদর্শ দম্পতির অনেক কাজ, অনেক উদ্দেশ্য ও অনেক কর্তব্য রয়েছে। সেগুলো তাদের পালন করতেই হয়।

(১) স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি অনুরাগ, প্রেম ও ভালবাসা থাকা একান্ত উচিত।

(২) উভয়ের একই রকম রুচিসম্পন্ন হওয়া দরকার।

(৩) স্বামী-স্ত্রীকে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রাখতে অনুরোধ রাখছি।

(৪) উভয়ের বয়সের নৈকট্য ঠিক রাখা প্রয়োজন।

(৫) পরস্পরকে মানিয়ে চলাই আদর্শ দম্পতির কর্তব্য।

(৬) একজনের সম্মানে অপরের গর্ববোধ করা উচিৎ।

(৭) রাজনীতি ও সাধনধর্মের ঐক্য রক্ষা প্রয়োজন।

(৮) পরস্পরকে কড়া মেজাজী হওয়া চলবে না।

(৯) স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়কে অন্তর দিয়ে বিচার করবেন। খাওয়াদাওয়া, মানসিক ইচ্ছা, সখ, স্বাধীনতার প্রতি পরস্পর পরস্পরের সহানুভূতিশীল হবেন।

(১) **স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি গভীর অনুরাগ, প্রেম ও ভালবাসার** অভাব হলে সন্তানের মনের ও মস্তিষ্কের গঠনের মধ্যে বহু স্বতঃবিরোধিতা সৃষ্টি হয়। তাই যাতে উভয়ের মধ্যে সর্বদা ঐকান্তিক প্রীতি প্রেম বজায় থাকে সেজন্যে উভয়কে যত্নশীল হতে হবে। আবার দাম্পত্যজীবনে প্রীতি প্রেম না থাকলে রাত্রির আনন্দ থেকে উভয়ে বঞ্চিত হবেন।

(২) **একইরকম রুচিসম্পন্ন**— দম্পতির রুচির পার্থক্য কল্যাণকর নয়। আহারে-বিহারে-কথাবার্তায়-চালচলনে উভয়কেই আত্মসংযমের দ্বারা যত্নশীল হতে হবে। স্ত্রীর পোশাক পরিচ্ছদ স্বামীর রুচিতে যেন না বাঁধে, স্বামীর ব্যবহার-আহার-বিহার-কথাবার্তা স্ত্রীর যেন রুচিসম্মত হয়— এইসব দিকে দম্পতির লক্ষ্য দিতে হবে। বিপরীত হলে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হবে।

(৩) **পারস্পরিক শ্রদ্ধা ভক্তি**— স্বামী-স্ত্রী কেউ কাউকে কোনদিন হেয় করবেন না, কেউ কারো উৎকর্ষতাকে অবহেলা না করে বরং গৌরববোধ করবেন। পরস্পর নিজেকে শ্রদ্ধিত হওয়ার চেষ্টা অপেক্ষা অপরকে শ্রদ্ধা করবেন। তাতে আপনি সুখী হবেন। কারণ **অপরকে শ্রদ্ধা করলে সেই শ্রদ্ধা তৎক্ষণাৎ আপনার কাছেই ফিরে আসবে।** এটা ধ্বনি প্রতিধ্বনির মত। **কিন্তু স্বামী-স্ত্রী** প্রকৃতপক্ষে কেউ কারো কাছ থেকে শ্রদ্ধা চায় না— চায় অনুরাগ— চায় প্রেম।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দাবী শ্রদ্ধার না হলেও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির পথে শ্রদ্ধা এক মহীয়সী শক্তি— শ্রদ্ধা এক বিরাট সহায়িকা। বস্তুতঃ যাকে তুচ্ছ বা সাধারণ বলে জ্ঞান করা হচ্ছে তার ভেতরে যে অতুল সহনীয় শক্তি আছে— এই বোধের নাম শ্রদ্ধা। **ক্ষুদ্রের ভেতর যে বৃহৎ আছে, তুচ্ছের ভেতরেও যে মহৎ আছে— স্বল্পের ভেতরেও যে ভূমার অবস্থান রয়েছে— এই বোধের নাম শ্রদ্ধা।**

(৪) **উভয়ের বয়সের নৈকট্য—** স্বামী-স্ত্রীর বয়সের নৈকট্য থাকা উচিৎ। বৃদ্ধের পক্ষে তরুণী ভার্যা গ্রহণ অনুচিৎ। আবার অল্পবয়স্ক স্বামীর অধিকবয়স্কা পত্নী গ্রহণ ঠিক নয়। এতে যৌনানন্দ উপভোগের অভাব হয়। সাহসের অভাব হয়। তাই পুরুষের চেয়ে স্ত্রীর বয়স ৪/৫ বছর কম হওয়া প্রয়োজন, তা নাহলে বিবাহের রোমান্স নষ্ট হয়ে যায়। চিত্তচাঞ্চল্যকারিণী-আকর্ষণী শক্তি সব বিনষ্ট হয়। বিবাহ একটা বাস্তব সত্য হলে এর মধ্যে একটা স্বপ্নালু আমেজের ব্যাপার আছে। বয়সের পার্থক্য না থাকলে ঐ স্বপ্নালু আমেজের স্থিতিকাল স্পল্পতর হয়। তবে সবই মনের ব্যাপার।

(৫) **পারস্পরিক মানিয়ে চলা—** সংসারে যার যতই ভুল ক্রটি থাকুক স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ক্ষিপ্ত না হয়ে পরস্পর তা মানিয়ে চলা একান্ত উচিৎ। তা নাহলে দাম্পত্যজীবন বিষময় হয়ে উঠবে। একজন গরম হলে অপরজনকে তৎক্ষণাৎ নরম হতে হবে। কথায় কথায় রাগারাগি করা চলবে না। অযৌক্তিক কথাকে হাসির দ্বারা হাল্কা করে দিতে হবে। তবেই সুখ— তবেই শান্তি মিলবে।

(৬) **একজনের সম্মানে অপরজনের গর্ববোধ** করা একান্ত উচিৎ। এতে সেন্টিমেন্টাল হলে চলবে না। স্ত্রী যদি স্বামীর চেয়ে উৎকর্ষ পরায়ণ হন (জ্ঞানে-গুণে বেশি) তাতে স্বামীর গর্ববোধ করা উচিৎ। স্ত্রীর প্রশংসা করা দরকার। তাতে স্ত্রীও গর্বিত হয়ে ভাববেন যে তিনি উপযুক্ত ভাল মানুষ স্বামী পেয়েছেন। স্বামী উৎকর্ষ পরায়ণ হলে স্ত্রীও নিজেকে হীনমন্য করে রাখবেন না। কারণ স্বামী স্ত্রী অভেদ মূরতি এক এবং অভিন্ন। কেউ নিজেকে বড় বলে গর্ব করবেন না। দু'জনেই যদি চাকরী করেন তবে কেউ কাউকে হেয় ভাববেন না। নিজেকে নিজে বড় বলে গর্ব না করাই উচিৎ। পরস্পর নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবলে দাম্পত্যজীবন ধ্বংস হবে। আজকাল হামেশাই এভাবে সংসার ধ্বংস হচ্ছে, বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে।

(৭) **রাজনীতি ও সাধন ধর্মের ঐক্য** বজায় রাখা একই ছাদের নীচে একই শয্যায় অবস্থানকারী স্বামী স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য। স্বামী স্ত্রী দু'জন দুটি রাজনৈতিক সমর্থক কিংবা দু'জনে দু'টি ভিন্নধর্মের উপাসক হলে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখকর হবে না। তাদের ঐ দাম্পত্যকে টিকিয়ে রাখা দায় হয়ে পড়বে। এরকম

অনেক দাম্পত্য ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। তাই রাজনীতি আর সাধন ভজন ধর্মের ঐক্য অবশ্যই স্বামী স্ত্রীকে বজায় রাখতে অনুরোধ করছি।

(৮) **স্বামী যদি কড়া মেজাজী হয় স্ত্রীকে একটু নরম হতেই হবে।** দু'ব্যক্তি কঠোর হলে সংসার দু'দিনও টিকবে না। দাম্পত্য জীবনে সহজেই চিড় ধরে যাবে। তাই সহ্য শক্তির অধিকারী হয়ে দাম্পত্য জীবনকে সার্থক সুন্দর ও মধুময় করুন।

(৯) **উভয়ে উভয়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন।** উভয়ে উভয়ের মন জানতে সচেষ্ট হোন। উভয়ে উভয়কে স্বাধীনতা দিন। কাউকে কেউ অহেতুক সন্দেহ করবেন না। উভয়েই উভয়ের খাওয়া দাওয়ার প্রতি—সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি দিন। তাহলে আপনাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হবে। তাছাড়া রমণীকে একটু বেশি গুণবতী ও সহানুভূতিশীলা হতেই হয়। কারণ—

কোকিল সুন্দর হয় সুমধুর গানে,
দাম্পত্য সুন্দর হয় রমণীর গুণে।

তবে আজকাল বহুক্ষেত্রে শুধু রমণীর গুণ থাকলে দাম্পত্যজীবন সুন্দর হচ্ছে না। অনেক স্বামী তাদের স্ত্রীর প্রয়োজন অনুভব করছে না। তারা বাইরে আনন্দ করার যায়গা পেয়ে যাচ্ছে। নামে মাত্র সংসার করছে। এসব সংসার বা দাম্পত্য জীবন কোনমতেই সুখের হবে না।

সন্তান পালন

আগেকার দিনে একান্নবর্ত্তী সংসারে একটি শিশু জন্মালে তাকে বাড়ির সবাই মিলে কোলে পিঠে করে মানুষ করত, খাওয়াত, তার অসুখ-বিসুখ— সুখ-সুবিধা-অসুবিধা ভাগ করে নিত। এককথায় শিশুর লালন পালনের দায়িত্ব ছিল সবারই। এখন পরিবার ছোট হয়ে গেছে। তাই শিশুকে পালনের দায়িত্ব তার মা-বাবারই।

• শিশুকে কিভাবে মানুষ করবেন? •

ডাঃ ইউ. গুহ. এম. বি. বি. এস.

শিশু যখন তার মায়ের পেটে থাকে তখন মায়ের দেহ থেকে কিছু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শিশুর দেহে সঞ্চারিত হয়। সেটা শিশুর দেহে জমা থাকে। শিশু বড় হলে এই সঞ্চিত প্রতিরোধ ক্রমশঃই কমতে থাকে। সেজন্যে সম্পূর্ণ মাতৃদুগ্ধে পালিত শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিছুটা বেশি হয়। যাই হোক, জন্মের পর থেকে শিশুকে মানুষ করতে হলে প্রতি বাবা মাকে কতকগুলি বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

(১) আজকাল শিশুরা যাতে জন্মের পরমুহূর্তে কোন জটিল রোগে আক্রান্ত না হতে পারে সেজন্যে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সে বিষয়ে বাবা-মা সচেতন থাকবেন।

(২) পোলিও ও ভ্যাকসিন মাতৃদুগ্ধপালিত শিশুকেও দেওয়া হয়। পোলিও ভ্যাকসিন খাওয়ানোর আগে বা পরে মায়ের দুধ খাওয়ানো চলবে।

(৩) প্রতিষেধক টীকা নেওয়ার ধারাবাহিকতায় বাধা পড়লে বা কোন ডোজ্ মিস করলে শেষ ডোজের পরেরটা থেকে নিলেই চলবে।

(৪) প্রতিটি শিশুকে জন্মের সময় থেকে প্রায় তিনবছর পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষেধক টীকা দিতে হবে।

(৫) বি সি জি ভ্যাকসিন যক্ষারোগের প্রতিষেধক। শিশুকে এই টীকা যক্ষার প্রাথমিক আক্রমণ থেকে শতকরা ষাটভাগ রক্ষা করে। এই ভ্যাকসিনের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। পোলিও ভ্যাকসিনের সুবিধা হল এটিকে মুখে খাওয়ানো হয়। এতে কেন কোন শিশুর জ্বর ও পায়খানা হতে পারে কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু নেই। পোলিও জ্বর-জ্বালা বা অন্যান্য অসুখের মধ্যেও শিশুকে খাওয়ানো যায়।

(৬) পোলিও পরপর পাঁচবার খাওয়ানো হয়। বুস্টার ডোজ খাওয়ানো হয় পঞ্চম ডোজের দু'বছর পরে।

(৭) বি সি জি ভ্যাকসিনের পরেই পোলিও টীকার প্রথম ডোজ শুরু করা হয়। যদি কোন কারণে তা শুরু করা সম্ভব না হয় তাহলে ছ'সপ্তাহের মধ্যেই শুরু করতে হবে এবং পরে আরো চারটি ডোজ খাওয়াতে হবে। পোলিও ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজের ছ'থেকে আট সপ্তাহ বাদে দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হবে। তারপরের ডোজটি অর্থাৎ তৃতীয় ডোজটি তার ছ'থেকে আট সপ্তাহ বাদে। চতুর্থ ডোজটি পড়বে তৃতীয় ডোজের ছ'থেকে আট সপ্তাহ পরে এবং পঞ্চম ডোজটিও যথারীতি ছ'থেকে আট সপ্তাহ পরে। পঞ্চম ডোজের দু'বছর পরে বুস্টার ডোজও দু'বার দেওয়া দরকার। প্রথমবার দেড় থেকে দু'বছর বয়সে ও দ্বিতীয় বুস্টার ডোজ খাওয়াতে হবে সাড়ে চার বছর বয়সে। এখন আমাদের দেশে পালস্ পোলিও কর্মসূচী শুরু হয়েছে। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত বছরে দু'বার তা খাওয়াতে হবে। পোলিওর অন্য টীকার মতই পালস্ পোলিও টীকা কিন্তু সাধারণ জ্বর-জ্বালা ও অন্যান্য অসুখ-বিসুখে দেওয়া যেতে পারে। পালস্ পোলিও প্রতিষেধক এর যেটা সবচেয়ে বড় লাভ, তা হচ্ছে যত দিন যাবে এবং যত বেশি সংখ্যক শিশুকে এই টীকা দেওয়া যাবে, পরিবেশ ক্রমশ ইকো ফ্রেণ্ডলি জীবাণু বাড়িয়ে দেবে। পালস্ পোলিওর এই টীকা মলের সাথে বেরিয়ে পরিবেশে মিশে গিয়ে ইকো ফ্রেণ্ডলি

জীবাণুর সংখ্যা বাড়াবে। ফলে যত বেশি সংখ্যক শিশুকে এর আওতায় আনা যাবে পরিবেশ ক্রমশঃ পোলিও জীবাণুবিহীন হয়ে পড়বে।

(৮) ডিপথিরিয়া, হুপিং কফ ও টিটেনাসের প্রতিষেধক হিসাবে ট্রিপল অ্যান্টিজেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই টীকা ছ'থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে শুরু করা উচিৎ। কোন কোন ডাক্তারবাবু বলেন, তিনমাস বয়সের পর থেকেই এটা দেওয়া ভাল। এটা ইনজেকশন দিয়ে দেওয়া হয়। এরও পাঁচটি ডোজ। শেষ দু'টি বুস্টার ডোজ। প্রতি দু'মাস অন্তর মোট তিনটি ইনজেকসন দিতে হবে। চতুর্থটি দেওয়া হবে তৃতীয়টির একবছর পর এবং পঞ্চমটি দেওয়া হবে চতুর্থটির তিনবছর পর। এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। জ্বর-জ্বালা হতে পারে তবে তাতে ভয়ের কোন কারণ নেই। অবশ্য সবকিছুই ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিয়ে করবেন। এই গ্রন্থ আপনাকে শুধু মাত্র ইঙ্গিত দান করল। তবে শিশুর তিনবছর পেরিয়ে গেলে তাকে ত্রিপল অ্যান্টিজেন দেওয়ার দরকার নেই। মস্তিষ্ক ও ফির্টের রোগ থাকলে এই ইনজেকসন্ দেওয়া ঠিক নয়।

(৯) যে সব শিশুদের বয়স পাঁচ পেরিয়ে গেছে অথচ ট্রিপল অ্যান্টিজেন দেওয়া হয় না তাদের ডবল অ্যান্টিজেন দেওয়া হয়। ডবল অ্যান্টিজেনও প্রায় দু'মাস অন্তর পর পর দিলেই চলবে। ডবল অ্যান্টিজেন সাধারণতঃ পাঁচ বছর অন্তর একটি করে বুস্টার ডোজ ১৫ বছর পর্য্যন্ত দেওয়া হয়।

(১০) সাত থেকে নয় মাসের বাচ্চাকে সাধারণত এক বছরের মধ্যে মিজলস্ (হামজ্বর) ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। জন্মগত কোন জটিল রোগ থাকলে এ ভ্যাকসিন না দেওয়াই ভাল। এই ইনজেকসনে (টীকায়) বা হাম থেকে শিশু সারাজীবনের মত মুক্তি পাবে।

(১১) মাম্পস, রুবেলা বা জার্মান মিজলস্ ও হামজ্বরের টীকা নেওয়ার পরিবর্তে শিশুর যখন ১২ থেকে ১৫ মাস বয়স হবে সেই সময় একটি এম. এম. আর ভ্যাকসিন দিয়ে দিলে সারাজীবনে ঐ তিনটি রোগের হাত থেকে শিশু মুক্ত থাকবে। এছাড়া হেপাটাইটিস বি' (জন্ডিসের জন্য) এবং টাইফয়েড ভ্যাকসিন্ দিয়ে রাখলে শিশুদের ভাল হয়। তবে সব কিছুতে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

অতএব বি. সি. জি টীকা শিশুকে দেবেন জন্মের সময়। তা থেকে ছ'সপ্তাহের মধ্যে পোলিও ভ্যাকসিন খাওয়াবেন। জন্মের সময় প্রথম ডোজ, ছ'থেকে আট সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় ডোজ, দশ সপ্তাহ পরে তৃতীয় ডোজ, ১৪ সপ্তাহ পরে চতুর্থ ডোজ ও ১৮ সপ্তাহ পরে পঞ্চম ডোজ। তারপর ১৮ মাসে প্রথম বুস্টার ডোজ, ৪ ১/২ বছরে দ্বিতীয় বুস্টার ডোজ। পালস্ পোলিও খাওয়াবেন বছরে দু'বার পাঁচ

বছর পর্যন্ত। ট্রিপল অ্যান্টিজেন শিশুকে জন্মের ৬ সপ্তাহ পরে প্রথম ডোজ, ১০ সপ্তাহে দ্বিতীয় ও ১৪ সপ্তাহ পরে তৃতীয় ডোজ খাওয়ানো উচিৎ। এরপর ১৮ মাস গত হলে প্রথম বুস্টার ডোজ ও ৪ ১/২ বছর পরে দ্বিতীয় বুস্টার ডোজ খাওয়ানো প্রয়োজন। **ডবল অ্যান্টিজেন** শিশুকে পাঁচবছরে প্রথম ডোজ ও পরবর্তী দু'মাস পরে দ্বিতীয় ডোজ খাওয়াবেন।

বুস্টার ডোজ দেবেন পাঁচবছর ছাড়া, হামজ্বরে ৯ মাস পরে, এম.এম.আর দেবেন ১২ থেকে ১৫ মাস অন্তর। **হেপাটাইটিস বি** দেবেন খুব তাড়াতাড়ি। প্রথম ডোজের এক মাস পরে দ্বিতীয় ডোজ, দ্বিতীয় ডোজের ৬ মাস পরে তৃতীয় ডোজ। বুস্টার ডোজ দেবেন পাঁচ বছর পরে। আবার বলছি, সবসময় ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেবেন।

(১২) শিশুর যাতে রিকেট না হয় সেজন্যে তাকে কিছু সময় রোদে রাখা দরকার।

একটি শিশুকে মানুষ করার পেছনে চাই অসাধারণ ধৈর্য। চাই স্তন্যদুগ্ধের প্রাচুর্য। তা না হলে নানা ব্যাধি শিশুকে ধরবে। যে সব মায়েরা শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ দেবেন তাদের নিজেদের পুষ্টির জন্য কিছু অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করবেন। যদি কোন মায়ের গরু বা ছাগলের দুধ সহ্য হয় না তারা হেলথ ড্রীংকস্ বা পুষ্টিবর্ধক পানীয় গ্রহণ করে শরীরকে পরিপুষ্ট রাখবেন।

(১৩) মায়ের দুধ না থাকলে বিশেষজ্ঞদের মত নিয়ে শিশুকে কৌটোর বা গরুর দুধ খাওয়াতে হবে। তবে দুধকে খুব ভাল ফুটিয়ে নিতে হবে। দুধে পরিমাণ মত চিনি মেশানো উচিৎ যাতে ক্যালোরি জোগান ঠিক থাকে। চার মাস বয়সের বাচ্চাকে ফলের রস, আপেল সেদ্ধ জল, মুসুরের জুস কেউ কেউ খাইয়ে থাকেন। **ছ'মাসের পর ডাল-ভাত আলু চটকে একেবারে পেস্টের মত করে খাওয়ানো শুরু করা দরকার। ডিম সিদ্ধ করে প্রথমে তার কুসুমটা খাওযাবেন তারপর সেটা সহ্য হলে সাদা অংশটা দেবেন।** বাচ্চার আটমাস বয়স হলে সামান্য হালকা সব্জী চটকে একটু একটু করে খাওয়াবেন।

(১৪) অকারণে লজেন্স, বিস্কুট ও চকলেট বাচ্চাকে দেবেন না। চা-কফিতে অভ্যস্ত করাবেন না। বিস্কুট, কাঁঠালী কলা খাওয়াতে পারেন অল্প মাত্রায়। তা যেন তাদের গলায় আটকে না যায়—সেদিকে লক্ষ্য রাখা মায়ের কর্তব্য।

(১৫) সদ্য তৈরী করা ফলের রস খাওয়ালে শিশু বেশ পরিপুষ্ট হয়। এটি একবছরের শিশুকে খাওয়াবেন।

(১৬) শিশুর পায়খানা-প্রসাব ঠিক মত হচ্ছে কিনা— তা লক্ষ্য রাখা মায়ের জরুরী কর্তব্য।

(১৭) শিশু ক্রমশঃ বড় হলে তার চোখ, দাঁত ও ত্বকের যত্ন নেওয়া উচিৎ। আর সেজন্য ভিটামিন এ দরকার। ডিমের কুসুম, মাংসের মেটে, কড লিভার অয়েল, যে কোন হলুদ রঙের ফল— যেমন গাজর, টম্যাটো, পাকা পেঁপে, আম, কুমড়ো ইত্যাদি এবং কড়াইশুঁটি, সিম ও পালং শাকে ভিটামিন এ প্রচুর থাকে। এগুলো খাওয়া অভ্যাস করাবেন। এতে চোখের দৃষ্টিশক্তি, দাঁত ও ত্বক ভাল হয়।

(১৮) শিশুর চোখে কাজল দেবেন না। চোখের চারপাশে মাঝে মাঝে আঙুল দিয়ে আলেতো ভাবে ম্যাসেজ করবেন। কাজল পরালে ছোট নেত্রনালী বন্ধ হতে পারে। তাছাড়া চোখে কাজলের কোন ভূমিকা নেই, শুধু দেখতে ভাল লাগে— এইমাত্র।

(১৯) নবজাতকদের চোখকে পরিষ্কার রাখতে জলে তুলো ফেলে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে হাত পরিষ্কার পূর্বক ঐ তুলো দিয়ে রোজ দু'বেলা চোখ মুছবেন।

(২০) শিশুদের চোখে জন্মগত ত্রুটী আছে কিনা জানতে রঙিন রঙিন খেলনা দেখাবেন। খেলনাগুলো ঘোরাবেন, তাতে শিশুও ঘুরবে।

(২১) আঙুল চোষা অভ্যাস করাবেন না শিশুকে। তাতে সামনের দাঁত উঁচু হতে পারে।

(২২) দাঁতের বৃদ্ধি ও গঠনের জন্য শিশুকে লৌহও ভিটামিন সি জাতীয় খাদ্য (লেবু, পেয়ারা) প্রচুর পরিমাণে খাওয়াতে হবে। কিছু খেলেই মুখ ধুইয়ে দিতে হবে। দু'বার দাঁত ব্রাশ দিয়ে মাজতে হবে। আপেল, পেয়ারা ও আম জাতীয় ফাইবার যুক্ত খাবার দাঁতের পক্ষে উপকারী, ফ্লোরাইড যুক্ত মাজন খুব উপকারী।

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ এ. দাস বলেছেন—

(২৩) শিশুকে পাঁচবছর বয়স থেকে খেলাধূলা আর হাসি গানের মধ্যে দিয়ে পড়াশোনা অভ্যাস করাতে হবে। শুধু গৃহশিক্ষক রাখলেই চলবে না। মা-বাবাকে সম্পূর্ণ তৎপর হতে হবে। মা-বাবা উভয়েই চাকুরী করলে ছেলে মেয়েকে এমন একজন স্ত্রীলোকের কাছে রেখে যেতে হবে যার মধ্যে মাতৃসুলভ আচরণ পাওয়া যাবে। তার মধ্যে দু'নম্বরী ভাব থাকলে চলবে না। অফিসের ছুটি হলেই যেন মা-বাবা শিশুকে সান্নিধ্য দেন—এদিকে খেয়াল রেখে সর্বদা চলতে হবে। তা না হলে মা বাবার প্রতি শিশুদের আগ্রহ ও উৎসাহ কমে যাবে।

আজকের ভোগসর্বস্বতার যুগে ছোট পরিবারের প্রতি মানুষের ঝোঁক বাড়ছে। জীবনযাত্রার মান বেড়েছে, বেড়েছে মানুষের পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এসব মাথায় রেখে সব মা বাবাই ছেলেসর্বস্ব হয়ে উঠেছেন। সবাই চান ছেলেকে ডাক্তার-

ইঞ্জিনিয়ার করতে। তবে আশা না থাকলে মানুষ বাঁচবে কেমন করে? আর তার জন্যইতো পড়াশোনা। আবার লক্ষ্যহীন জীবন হালছাড়া নৌকার মতন— A ship with out rudder. তাই শিশুর ভবিষ্যতের লক্ষ্য বা আকাঙ্ক্ষা দরকার।

(২৪) শিশুকে সুস্থ সবল রাখার জন্য প্রথম থেকেই **সুষম খাদ্য খাওয়াতে হবে।** দেহ দুর্বল ও অসুস্থ হলে মনও দুর্বল হবে। পড়াশোনার দিকে ঝোঁক থাকবে না। এছাড়া বাল্য থেকে শিশুর কাছে **কোনরূপ হতাশ ভাব দেখাবেন না।**

(২৫) ভাল রেজাল্ট করাতে হলে— (১) মা বাবাকে ছেলের পেছনে সময় দিতে হবে। গৃহ-শিক্ষকের সঙ্গে মা-বাবাকে হতে হবে তৎপর। (২) ছোটবেলা থেকে অঙ্কের দিকে জোর দিতে হবে। তাছাড়া ইংরেজির ভিত ঠিক না করলে শিশু কোনমতেই ইংরেজি ভাষা আয়ত্তে আনতে পারবে না। (৩) ক্লাসের পড়ার কোন বিষয়কে অবহেলা করা চলবে না। যাকেই অবহেলা করবে **সেই বিষয়টিই শিশুর উপর প্রতিশোধ নেবে।** গল্পচ্ছলে গণিত ও ইংরেজি শেখাতে হবে শিশুকে। (৪) অঙ্ক ও ভৌতবিজ্ঞানে শিশু যদি বেশি জোর দেয় তাহলে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। (৫) বাবা মায়ের কর্তব্য হবে শিশুকে মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা। (৬) যে ছেলে যে বিষয়টি ভাল পছন্দ করে সেই বিষয় নিয়ে তাকে পড়তে বলা প্রতি বাবা-মায়ের কর্তব্য। (৭) পড়াশোনার সাথে খেলাধূলা চালিয়ে গেলে অধ্যয়ন তপস্যার মহাভারত অশুদ্ধ হবে না— এটাও বাবা-মাকে জানতে হবে। কারণ **All works and no play makes a jack and dull boy.** শুধু পড়লে হবে না। রাস্তা-ঘাটে বিছানায় শুয়ে সেগুলো রোমন্থন করা দরকার। তবে পড়া মনে থাকবে। (৮) পড়াশোনার প্রতি শিশুদের যাতে কম্পিটিশন মনোভাব থাকে সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া বাবা-মায়ের কর্তব্য। (৯) শিশুকে শাস্তি দিলে ভাল রেজাল্ট হয় না। আবার শিক্ষককে গুলিয়ে খাইয়ে দিলেও নয়। **ভাল রেজাল্ট শিশু ও তার মা বাবার একাগ্রতা, অধ্যবসায়, আকাঙ্ক্ষা ও বুদ্ধি-বিদ্যার ওপর নির্ভর করে।** তবে **প্রস্তরোহপি ঘৃস্যমান ক্ষীয়তে।** তেমনি পড়াশোনাকেও বারবার ঘসতে মাজতে হয়। যাকে বলে রিপিটেশন। শুধু পড়াশুনো কেন, **কোন কাজই রিপিটেশন ছাড়া সাকসেসফুল হয় না।**

(২৬) ছেলে কোন পথে এগোবে— তা মা বাবাকেও একটু চিন্তা করতে হবে। যারা অবশ্য বোঝেন না তাদের কথা বাদ দিলাম। কোন বৃত্তিতে লোকের চাহিদা বেশি সেদিকে বাবা-মা ও ছেলে সজাগ থাকবেন।

(২৭) মাধ্যমিক পাশের পর সন্তানের যোগ্যতা, আপনার সামর্থ্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সন্তানের মেধা সব মিলিয়ে সন্তানকে নিয়ে ঠিক করতে হবে বাবা-মাবে

তাদের ছেলে কোন পথে পা দেবে। Correct self appraisal and self confidence hold the key to any planning in life. **নিজের প্রতি আস্থা রেখে নিজের জীবিকা কী হবে তা শিশুকে সাজিয়ে নিতে হবে।** নিজের সামর্থ্য ও যোগ্যতা দিয়েই সন্তানকে পড়াশোনা ও কর্মপথে এগোতে হবে। If the best has eluded you, the second best should be tried. সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে জীবিকা নির্ধারণ করলে জীবনে আর হতাশ হতে হবে না।

(২৮) অনেক সময় বাবা-মা ছেলেকে বিজ্ঞান পড়তে বলেন, ছেলের কিন্তু কমার্সের দিকে ঝোঁক। এ নিয়ে মতদ্বৈত সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে **ছেলেকেই তার কেরিয়ার গড়তে নির্দেশ দিতে হবে।**

(২৯) স্নাতক স্তরে অনার্স নিয়ে পড়তে হলে উচ্চ মাধ্যমিকে ৫০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। আর সেজন্যে বাবা-মাকে সচেষ্ট থাকতে হবে। ছেলেকে কঠিন বিষয়গুলোর জন্য উপযুক্ত গৃহশিক্ষকের হাতে সমর্পণ করতে হবে। টাকাপয়সা খরচের ভয় করলে বা কার্পণ্য করলে সন্তান মানুষ হবে না। ধনশালী ব্যক্তিদের ছেলেরা ভাল রেজাল্টের জন্য প্রতি বিষয়ে এক একটি শিক্ষক নিয়ে পড়াশোনা করে।

(৩০) **সবশেষে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বাড়াতে হলে (১) ভালবাসা (২) শাসন (৩) স্বাধীনতা (৪) নিরাপত্তা (৫) সহায়তা (৬) স্বীকৃতি (৭) রক্ষণাবেক্ষণ ও (৮) বিশ্বাস অবশ্যই প্রয়োজন।**

(গ) শিশুর সঙ্গে তার মায়ের সম্পর্ক
(ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে)

শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের মধ্যে একদিন কেউ ডাক্তার হবে— কেউ হবে ইঞ্জিনিয়ার, কেউ হবে মন্ত্রী, কেউ হবে শিল্পী-অভিনেতা-কবি-সাহিত্যিক-জজ-ব্যারিস্টার-দেশনেতা আরো কত কী! তাই তাদেরকে ছোটবেলা থেকে যত্ন করে বড় করা প্রতি মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। শিশুদের মানুষ করার ব্যাপারে মা-বাবার এতটুকু অবহেলা করা উচিৎ নয়। প্রতি বাবা মাকে বুঝতে হবে তাদের শিশুর মধ্যে লুকিয়ে আছে ভাবীকালের সৌরভ গাঙ্গুলী, রঞ্জিত মল্লিক অথবা রচনা ব্যানার্জী। তাই শিশুজীবনের চড়াই-উতরাই পথে তার মা বাবাকে হতে হবে পথপ্রদর্শক। শিশুর জন্মানোর পর থেকে মা'ই তার একমাত্র সঙ্গী। মায়ের সঙ্গে বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে শুরু হয় তার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। মা তার ব্যক্তিত্ব গঠনে সম্পূর্ণরূপে সাহায্য করে।

তাই মাকে হতে হবে **প্রথমত অতীব ধৈর্যশীলা**। সর্বংসহা ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু ও সুদৃঢ় সহ্যশক্তির অধিকারিণী। **দ্বিতীয়ত দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জ্ঞানসম্পন্না**। মা যদি দায়িত্বশীলা না হন তাহলে শিশুর জীবনও এলোমেলো খাতে বইতে থাকবে। **তৃতীয়ত মাকে হতে হবে দয়া মায়া ও মমতার আধার**। মা যদি মায়া মমতা গুণসম্পন্না না হন তাহলে সন্তানও কর্কশ মেজাজী হবে। **চতুর্থত মায়ের কোন কাজেই আবেগপ্রবণ হওয়া চলবে না**। আবেগপ্রবণতা আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গে মাকে হতে হবে চরিত্রবতী। দুশ্চরিত্রা মায়েরা কোনদিন সন্তানের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারেন না। সন্তানের প্রতি তাদের স্নেহ মমতা ও চিন্তাভাবনা কম থাকে। **পঞ্চমত মা হবেন সংবেদনশীলা**— অনুভূতিপ্রবণ চিত্ত। সন্তানের মনের কথা তাকে অনুভব করতে হবে। **ষষ্ঠত মাকে হতে হবে Friend, Philosopher and Guide.** মায়ের কাজ হবে শিশুর বন্ধুর মত, পরিচালকের মত আবার শিশুর মনের কথা অনুভব করে তাকে ঠিকভাবে ঠিকপথে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা সম্পন্না। শিশুর কাছে মা হচ্ছেন এমন একটি ব্যক্তি যিনি শিশুর সুখে-দুঃখে-ব্যথা-বেদনায় সর্বদা জড়িয়ে থাকবেন, শিশুর ভাবনা সর্বদা ভাববেন, সময়মত শিশুর মুখে তুলে দেবেন খাবার, সহ্য করবেন শিশুর দুষ্টুমি— এককথায় শিশুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থেকে তার সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেবেন।

(ঘ) শিশুর সাথে তার বাবার সম্পর্ক

সন্তানকে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলাই বাবার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার

ছেলেদের আদর্শ তার বাবার মতো হওয়া। তাবলে মাতাল-আদর্শহীন বাবার মত নয়। বাবা যদি শৃঙ্খলাপরায়ণ হন তাহলে শিশুও তদ্রূপ হতে বাধ্য। প্রতিটি বাবার উচিৎ **প্রথমত আপন ছেলেকে তুচ্ছ বা তাচ্ছিল্য না করা,** তার অস্তিত্ব ও সত্ত্বাকে মূল্য দেওয়া। **দ্বিতীয়ত শিশুর সামনে মহান ব্যক্তিদের আদর্শ তুলে ধরা প্রতি বাবার কর্তব্য। তৃতীয়ত শিশু সন্তানের প্রতি স্নেহশীল হওয়া একান্ত দরকার।** শিশুর স্বাধীনতায় সম্পূর্ণরূপে হস্তক্ষেপ করবেন না। এমনকি শিশুর কাছ থেকে কোনরূপ অবাস্তব বা অযৌক্তিক কোন কিছু পাওয়ার আশা করাও উচিৎ নয়। **চতুর্থত পরীক্ষায় কম নম্বর পেলে তার সেই ব্যর্থতা নিয়ে শাসন করবেন না,** পাঁচজনের কাছে সমালোচনা করাও ঠিক নয়। **পঞ্চমত বাড়ীর সুখশান্তির উপর শিশুর মানসিকতা নির্ভর করে।** তাই বাড়ীতে সুখ-শান্তি বজায় রাখা বাবার একান্ত কর্তব্য। শিশুর সামনে রাফ ভাষা প্রয়োগ কিংবা শিশু নিতান্ত ছোট বলে তাকে

অগ্রাহ্য করবেন না। **ষষ্ঠত কোন কারণে শিশুকে ভয় দেখানো বাবার উচিৎ হবে না।** শিশুর শিক্ষা বা মূল্যায়ন যেন যথাযথ হয় সেদিকে লক্ষ্য দিতে হবে। **সপ্তমত বাবাকে ভাবতে হবে শিশুর মধ্যে তার নিজের সত্ত্বা ঘুমিয়ে আছে,** শিশুর মধ্যে সে বেঁচে থাকবে। শিশুর মধ্য দিয়েই তার জীবন সার্থক হবে। শিশুর কাজের মধ্য দিয়েই তার নাম-সুনাম-খ্যাতি। সে বেঁচে থাকবে আপন সন্তানের মধ্যে— তার প্রতিচ্ছবি সন্তানের মধ্যেই হবে প্রতিফলিত— এটা প্রতি বাবার জানা প্রয়োজন। এই সব ভেবে আদর্শ বাবার মত বাবা হতে হবে প্রতি শিশুর জন্মদাতাকে।

• শিশু বিরূপ মনোভাবাপন্ন কেন হয়? •

আজকের দিনের জীবনযাত্রা আগেকার মত নয়। মেয়েরা এখন পুরুষের সাথে সমান তালে পা ফেলে চলছে। বাইরে চাকরী করছে, শিশুকে খাওয়ানো-পরানোর সময় নেই তার। শিশুর তত্ত্বাবধান করার সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত। ফলে দীর্ঘসময় মা কাজে চলে গেলে শিশু একাকীত্ব বোধ করে। মা তাকে যার তত্ত্বাবধানে রেখে যায় তার শিক্ষাদীক্ষা আর মায়ের শিক্ষার মধ্যে যদি তফাৎ থাকে তাহলে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে। আর সাধারণত তাই দেখা যায়। মায়ের অনুপস্থিতিতে শিশু যদি মাতৃস্থানীয়া কারো মধ্য দিয়ে হৃদয়ের পরিতৃপ্তি না পায় তবে তার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। মায়ের প্রতি তখন তার মানসিক বন্ধন বা তীব্র আবেগ কমতে থাকে। জগতে ভালবাসাই আসল জিনিস। শিশুরা যদি বাল্যকালে তাদের মা বাবার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে পরবর্তীকালে তারা তাদের মা বাবাকে কিভাবে ভালবাসবে? মোটেই ভালবাসতে পারবে না। তাই প্রতি বাবা মাকে আমার অনুরোধ— **শিশুর প্রতি প্রয়োজনে কঠোর হোন কিন্তু তাদের জীবনের প্রতি আকর্ষণ বাড়ান, শিশুকে সঙ্গ দিন। শিশুকে বাদ দিয়ে দিনের পর দিন ক্লাবে-মাঠে-ময়দানে আনন্দ করতে যাবেন না। শিশুকে বঞ্চিত করে কোন কিছু পৃথকভাবে খাবেন না। তাবলে মদ্যপান করলেও শিশুকে দেবেন না। অহেতুক শিশুমনে চাপ সৃষ্টি করা কোন বাবা মায়ের উচিৎ নয়। শিশুকে সর্বদা মহাপুরুষদের জীবনীপাঠের অভ্যাস করাতে হবে। শিশুকে কোন উত্তেজক ছবি বা টিভি প্রোগ্রাম না দেখাতে অনুরোধ করছি। শিশুর সামনে বা আড়ালে এমন কিছু কাজ করবেন না, যা শিশুমনকে নাড়া দেয়। শিশু যদি দেখে তার বাবা মা মানুষের সাথে প্রতিনিয়ত দুর্ব্যবহার করে চলেছে তাহলে শিশুও ঐরকম ব্যবহার করতে শিখবে। শিশুর সামনে কোন বাবা মায়ের ঝগড়াঝাটি করা উচিৎ নয়। তাতে শিশুমনে আঘাত লাগবে।**

মানুষ সবার কাছ থেকে ভালবাসা পেতে চায়। তাই শিশু যদি বাবা মায়ের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে সে ক্রমশঃ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে। তাই **খেয়াল রাখতে হবে শিশু যেন বাবা মায়ের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত না হয়।**

শিশু কেন বেপরোয়া হয়ে যাচ্ছে তার কারণ অনুসন্ধান করা প্রতি বাবা মায়ের কাজ। **শিশুকে সঙ্গ দিয়ে, তাকে কাছে কাছে রেখে তার মনের দুশ্চিন্তা দূর করতে হবে।**

(চ) শিশুর প্রতি শিক্ষকের কর্তব্য

শিক্ষকের প্রাথমিক কর্তব্য হবে শিশুকে স্বনির্ভর হওয়ার শিক্ষা দেওয়া। অতিরিক্ত শাসন করলে শিশু শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলবে, শিক্ষকের প্রতি অনীহা ও অবজ্ঞার ভাব দেখাবে।

তাছাড়া (১) শিশুর উপর পড়াশোনার বিষয়ে অতিরিক্ত ভার চাপিয়ে দেওয়া উচিত হবে না।

(২) শিশুর কাছ থেকে অতিরিক্ত কিছুও আশা করা ঠিক নয়।

(৩) অতিরিক্ত ভালবাসা দেখিয়ে শিশুর মানসিক সুস্থতা নষ্ট করা শিক্ষক বা কোন পিতামাতার উচিৎ নয়।

(৪) শিক্ষকের চরিত্রের গুণগুলি যেন শিশুর চরিত্রের মধ্যে বিকশিত হয় সেদিকে নজর দেওয়া প্রতি গুরুজনের কর্তব্য।

(৫) সাধারণ জীবনযাপন অথচ চিন্তাধারা উন্নত হবে, যাকে বলে Plain living high thinking— এই মতে বিশ্বাসী করাতে হবে শিশুকে। আর সে দায়িত্ব শিক্ষক ও মাতাপিতার।

(৬) শিশুকে ঘরে বাইরে সংযমী হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। অতিলোভ বা চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকাব উপদেশ দিতে হবে।

(৭) অভাব সকলেরই আছে। তাই অভাব বৃদ্ধি না করে অভাব সীমিত করাই সুখ ও শান্তি— এটা শিশুর মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হবে।

(৮) আড়াই বছরের শিশুকে কোনদিন ক্লাসে ভর্তি নেওয়া শিক্ষকের ঠিক হবে না। ঐ বয়সে তার মাথায় মানসিক চাপ দিলে তাতে সে রোগগ্রস্ত হতে পারে। যে বয়সে শিশু চাঁদমামা কিংবা ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প শুনবে— সেই বয়সে ৫ কেজি ওজনের বইসমেত ভারী ব্যাগ, হাতে টিফিন বক্স, গলায় ওয়াটার বোটল নিয়ে একটি ভারবাহী জন্তুর মতো মায়ের হাত ধরে চলছে আজকের শিশু। এটা কিন্তু ঠিক নয়। শিক্ষক মহাশয় এতে প্রতিবাদ করবেন।

আপনারা ভাবুনতো কোথায় গেল আজ শিশুর শৈশবের আনন্দমুখর দিনগুলো? সে তো বাল্যজীবন উপভোগ করতেই পেল না। তাই পাঁচ বছরের কমে শিশুকে স্কুলে ভর্তি করা ঠিক নয়।

(৯) আজকাল শিশুরা দশম শ্রেণীর পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হলে শিক্ষকদের জানিয়ে দেওয়া উচিৎ কী বিষয় নিয়ে তারা পড়বে? ঐ বয়সের ছাত্রদের কতটুকু জ্ঞান আছে যে তারা ক্যারিয়ার নির্বাচন করবে?

(১০) আইনস্টাইন বলেছেন— 'It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge'— কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আজকের শিক্ষকের এই নিপুণতা ও দক্ষতা আছে কী?

(১১) অঙ্কে ভাল নয় বলে শিশুর দ্বারা কিছু হবে না বা এই শিশুর কোন বুদ্ধি নেই— একথা বলে শিশুকে হেয় করা কোন শিক্ষকের উচিৎ নয়।

(১২) শিশুকে জোর করে কোন কিছু করানো যাবে না। প্রত্যেকের পথ আলাদা— গতি আলাদা— ছন্দ, তাল পৃথক। সে তার নিজের মতো চলবে। শিক্ষক তাকে গাইড করবেন।

(ছ) আজকের শিশুর বাবা-মা কি চান?

সব সন্তান পড়াশোনায় যে ভাল হবে এমন কথা নেই। তাবলে সেইসব সন্তানকে পিতামাতার অবজ্ঞা করা চলবে না। কেউ ভাল ক্রিকেট প্লেয়ার, কেউবা ফুটবলার, কেউবা সুন্দর গায়ক, কেউবা অংকন শিল্পী হতে পারে। সুতরাং সন্তানকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার করার বেদনা মা-বাবাকে যেন আহত না করে।

আজকাল প্রতি বাবা মা চান— তাদের শিশুই হোক সকলের সেরা— বিজ্ঞানে হোক আইনস্টাইন, গণিতে কেশব নাগ, কাব্যে রবীন্দ্রনাথ, গানে হোক লতা, উষা কিংবা কিশোরকুমার, ছবি আঁকাতে লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চি, নৃত্যে উদয়শংকর, সাঁতারে মিহির সেন বা আরতি সাহা, খেলাতে সৌরভ গাঙ্গুলী, শচীন, অথবা দ্রাবিড়— একটি সত্তার হাজার রকম চাহিদা। এখন বিচার করুনতো ঐসব বাপ মায়েরা কি ঐসবের মধ্যে কোন একটি গুণের অধিকারী?

শিশুর সামনে বা আড়ালে বাবা মা এমন কোন কাজ করবেন না যা শিশুর মনকে নাড়া দেয়। পাঁচ-ছ বছর বয়সে শিশু যা দেখে তা সারাজীবন মনে রাখতে পারে। শিশু যদি দেখে তার বাবা কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করছে তাহলে সেও সেইরকম ব্যবহার করতে শিখবে। বাবা মায়ের কোন কারণে মতের অমিল হতে

পারে। কিন্তু ছেলের সামনে তা নিয়ে আলোচনা-ঝগড়াঝাঁটি কিংবা তর্কাতর্কি করা উচিৎ নয়। তাতে শিশুর মনে আঘাত লাগতে পারে। বড়দের কথা শুনতে নেই—বলে শিশুকে সরিয়ে দিয়ে বড়রা যদি গল্পে মশগুল থাকেন তাহলে শিশু অবশ্যই কৌতুহল প্রবণ— সে বড়দের কথা আড়ি পেতে শুনতে চাইবে।

মানুষ ভালবাসা দেওয়ার চেয়ে ভালবাসা পেতে বড় ভালবাসে। তাই শৈশবে ভালবাসা যদি সে না পায় তবে তার চারিত্রিক বিকাশ সম্পূর্ণ হবে না। তখন সে ক্রমশঃ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে। তাই শিশুকে এমন একটি পরিবেশের মধ্যে রাখতে হবে যেখানে ভালবাসার মধ্য দিয়ে সে বড় হয়ে উঠবে। তবে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে শিশু যেন তার বাবা মায়ের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত না হয়।

শিশুর কাছে বাবা তার নায়ক। তিনি সর্বদা সচেতন থাকবেন শিশুর কাছে তার ইমেজ যেন নষ্ট না হয়।

শিশুর মানসিকতা গঠন ও চেতনা বিকাশে দেশভ্রমণকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। কারণ ভ্রমণ তার জ্ঞানবুদ্ধিকে দ্রুত বৃদ্ধি করতে পারে। অচেনাকে চিনে, অদেখাকে দেখে যেন শিশুর মানসিক ও শারীরিক উন্নতি ঘটে।

• শিশুর শখ বা হবি •

প্রতি শিশুর একটা না একটা হবি বা শখ থাকে। হবির দ্বারা শিশুমনের চিন্তা ও মনের আবেগ পরিস্ফুট হয়। ছবি আঁকা, বই পড়া, গান শোনা, বাগান তৈরী, সেলাই করা বা বোনা, মডেল তৈরী করা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের হবি বা শখ শিশুমনকে আকর্ষণ করে। এতে বাবা মায়ের বাধা দেওয়া অনুচিত। তাতে শিশুমন বিকশিত হতে পারবে না, ভাবীকালে সমৃদ্ধ হতে অসুবিধা বোধ করবে। যাই হোক, একটি ছোট চারাগাছের মত শিশুকে লালনপালন করতে হবে। যথাসময়ে চারাগাছ জল-আলো-বাতাস আর সার পেয়ে যেমন একদিন মহীরূহতে পরিণত হয় তেমনি শিশুকেও মহীরূহের মত আদর্শ ও সার্থক মানুষ করতে হলে উপযুক্তভাবে তার প্রথম জীবন থেকে তাকে যত্ন করতে হবে।

• শিশুকে কি ধরণের খেলনা কিনে দেবেন? •

শিশুর কাছে খেলনা সবচেয়ে আকর্ষণীয়, তবে শিশুকে কোনদিন টিনের তৈরী খেলনা কিনে দেওয়া উচিৎ নয়। তাতে হাত পা কেটে ফেলতে পারে।

শিশুর খেলনার মধ্যে থাকবে নানাদেশের মানুষ, নানাধরণের গাড়ী, নানাধরণের পশুপাখী, জীবজন্তু ইত্যাদি। নানাদেশের পুতুল থেকে শিশু বিভিন্ন দেশের নামের সঙ্গে পরিচিত হবে এবং ধীরে ধীরে সেইসব দেশের মানুষের চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবে।

• শিশুর আগ্রহ কিসে লক্ষ্য করুন •

কোন কোন শিশুর সৃজনশীলতা বেশি। আবার কারো কারো কম থাকতে পারে। বাবা মা সেক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখবেন কিসে শিশুর আগ্রহ বেশি। সৃজনশীলতা মানুষকে আত্মতৃপ্তি দান করে এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তির ও সমাজের উন্নতি সাধন করে। শৈশবে শিশু তার পরিবেশ থেকে উদ্দীপিত হবে। পরে বাবা মা ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা সহযোগিতা করবেন। "Even the greatest creation start from small seeds"— শৈশবে যে প্রতিভা সুপ্ত হয়ে থাকে, ভবিষ্যতে তাই মহীরূহের আকার ধারণ করে।

কর্মরতা মায়েরা বাচ্চার অসুখের সময় ছুটি নিয়ে বাচ্চার পাশে থাকবেন। মা যদি বাড়িতে থাকেন তাহলে বাচ্চার মন ভাল থাকবে। বাড়িতে মা বাবার অসুখ করলে বাচ্চার হাত দিয়ে ওষুধ দেওয়ার অভ্যাস করালে বাচ্চার মধ্যে সেবার মনোভাব গড়ে উঠে। বাবা-মায়েরা বৃদ্ধ হলে ঐ শিশুরাই তখন তাদের সেবা করতে পরাঙ্মুখ হবে না।

• শিশুর জীবনে নাচ, গান, কবিতা, নাটক ও টিভির প্রভাব •

জীবনে সঙ্গীতের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মিউজিক শিশুর জীবনে একটা খেলার মতো। শিশু যদি গাইতে নাও পারে গান শোনার আনন্দ তাকে বিভোর করে রাখে। মিউজিক শিশুর অবসর বিনোদনের অঙ্গ; তাই শিশুর জীবনকে সর্বদা উৎসাহপূর্ণ ও আনন্দময় করে রাখার জন্য বাবা মা **শিশুর গান টেপ করে রাখবেন— শিশু তাতে খুব খুশি হবে।**

সাত আট বছর বয়স থেকে শিশু বাদ্যযন্ত্র বাজানোর শিক্ষা লাভ করতে পারে। গান শিখতে পারে পাঁচ বছর বয়স থেকে। তাই ঐসময় থেকে তাকে গান শেখানো বা বাজানোর ব্যবস্থা রাখলে শিশু কিন্তু ইচ্ছামত রোমান্সের জগতে বিচরণ করতে পারে। তাছাড়া প্রতি বাবা মা ভাল ভাল গানের ক্যাসেট বাড়ীতে

রাখবেন— যেগুলি শুনলে শিশুর মন আনন্দে ভরে উঠবে। শুধু গান নয়, নাচ শেখানোর ব্যাবস্থা রাখা সম্ভ্রান্তশীল পরিবারের একান্ত কর্তব্য। নাচ-গান শিশুমনে বিরাট পুষ্টি জোগায়।

গল্প শুনতে ভালবাসে শিশুরা। তাদেরকে রহস্য রোমাঞ্চকর গল্প শোনানো প্রতি বাবা মায়ের কর্তব্য। তাতে শিশুমন কল্পলোকে বিচরণ করবে। তাদের মানসলোক বিকশিত হবে। বাবা মা সময়ে সময়ে শিশুদের কবিতা পড়ে শোনাবেন, তাদেরকে আবৃত্তি করাবেন। তাতে শিশুর উচ্চারণের জড়তা কেটে যাবে। এছাড়া কবিতা লেখা অভ্যাস করানো বাবা মায়ের উচিত। এতে শিশুর মনে প্রেরণা আসবে। মনের উদ্বেগ-অশান্তি আর নিরানন্দ দূর হবে।

টিভি প্রোগ্রামের কোনটা শিশুর দেখা উচিত আর কোনটা অনুচিত সেটা ঠিক করবেন তার মা বাবা। যেকোন টিভি প্রোগ্রামে শিশুরা যাতে অংশগ্রহণ না করে সেদিকেও মা বাবার খেয়াল রাখা দরকার। কারণ অনেক বাজে প্রোগ্রাম আছে, যা শিশুদের মনকে কলুষিত করতে পারে।

টিভিতে ডিস্‌কোভারি চ্যানেলের ছবি দেখা শিশুদের একান্ত কর্তব্য। সেদিকে বাবা মায়ের সজাগ থাকা দরকার। এছাড়া বাচ্চাদের জন্য কমিকস্‌ থ্রিলার তো রয়েছেই। বাচ্চাদেরকে উপযুক্ত নাটক, নাচ-গান দেখাতে হবে। টিভির মাধ্যমে শিশু খুব সহজেই বিশ্ব চরাচরের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে। সে বাড়িতে বসে সারা বিশ্বকে দেখতে বা বুঝতে পারবে— যেটা বই পড়ে সহজে শিখতে বা বুঝতে পারছে না। সমুদ্রের তলদেশ থেকে সূচনা করে বন-গিরি-গুহা-প্রান্তর-নদনদী-মরুভূমি-বিভিন্ন জীবজন্তু ও বৈচিত্র্যময় পরিবেশ তাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানকে বিস্তৃত করে দেবে। তবে সতর্ক থাকতে হবে—

(১) **শিশু যেন টিভি এডিক্টেড না হয়।**

(২) **সেক্স ও বীরত্ব বা মারপিঠের ছবি যেন না দেখে।** তাহলে তারা সেগুলোকে অনুকরণ করে বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। শক্তিমান ছবি দেখে অনেক শিশু তা অনুকরণ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে শোনা গেছে।

(৩) **সেক্সচুয়্যাল ছবি শিশুকে অকালপক্ক করে তুলবে।** পড়াশোনা বাদ দিয়ে সে সর্বদা অন্যদিকে মন দেবে আর তাতে তার শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর।

(৪) খুনোখুনি আর মারামারির ছবিতে শিশুমনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো যেমন নষ্ট হবে তেমনি সেক্সমূলক ছবিতে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা একশ পার্সেন্ট।

এসব বিষয়ে প্রতি বাবা মায়ের সজাগ থাকা দরকার।

• শিশুর জীবনে আবেগ •

শিশুকে আবেগপ্রবণ হতে হবে কিন্তু আবেগজনিত উত্তেজনা তার কাজের গতি-প্রকৃতিকে বাধা দিতে পারে। এলিজাবেথ বি. হার্লক তাঁর **'Child development'** গ্রন্থে বলেছেন— "Bodily preparation for action produces increased strength, energy and endurance but it plays havoc with skilled movements, causing the child to be clumsy and awakward and leading to such speech disorders as slurting and sluttering."

আবেগের ফলে শিশুর মধ্যে কাজের গতি, দক্ষতা, শক্তি ও সহনশীলতা (endurance) খুব বেড়ে যায় কিন্তু নৈপুণ্যে কিছু কিছু ঘাটতি দেখা যায়— যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে কথায় জড়তা বা তোতলামি আসে।

তাই আবেগকেও সংযত করতে হয়। আবেগের আরো কুফল আছে। (১) আবেগের ফলে শুধু শিশু কেন বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষেরা যেমন বড় ও দুঃসাহসিক কাজ করে তেমনি আবেগের বশে খারাপ কাজ ও কথাবার্তা বলে ফেলে। (২) আবেগের বশে হঠাৎ করেই কাউকে মারতে দেখেছি— অযথা কাঁদতে দেখেছি। আবেগের বশীভূত হয়ে স্বাভাবিক জ্ঞান বা বিবেক হারাতে অনেককে শুনেছি। (৩) আবেগের বশে কাউকে সর্বস্ব দান করে নিঃস্ব হতে শুনেছি। শুধু শিশু কেন, কোন ব্যক্তি গোপনীয় কথা আবেগের বশীভূত হয়ে অপরের কাছে বলে সংসারে কলহ-অশান্তির সৃষ্টি করে। (৪) আবেগে অন্তরঙ্গতা বাড়লেও অনেক ক্ষেত্রে রসিকতা করতে করতে সেটা খারাপ অবস্থার দিকে পৌঁছে ভিন্নরূপ ধারণ করে। তাতে বন্ধুত্ব বিচ্ছেদও হয়ে যায়। তাই আবেগেরও সংযম থাকা দরকার।

• শিশু কিভাবে নীরোগ থাকবে •

শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্— শরীর সুস্থ না থাকলে শুধু ধর্মকাজ কেন, কোন ভালমন্দ কর্মই সুসম্পন্ন হবে না। তাই দৈনন্দিন কর্মের সারণীতে যোগব্যায়ামকে যদি নিত্য কর্মপদ্ধতির মধ্যে আনা যায় তাহলে শিশুরা নীরোগ থাকতে পারে। যোগাসনের দ্বারা সমস্ত শরীরে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া সুষ্ঠরূপে সম্পন্ন হয় ও হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে দেহ সুস্থ থাকে। যোগাসনে শুধু দেহ সুস্থ থাকে না— কর্মক্ষমতা ও একাগ্রতা বাড়ে। শিশু বিনয়ী হয়, মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ হয়। আর আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্মেষ হলেই জীবের দুঃখকষ্ট দূর হয়। যাই হোক, শিশুদের কিশোরকাল থেকেই নানাবিধ ব্যায়াম শেখান। ধনুরাসন একান্ত

দরকার। এতে কোনদিন কোষ্ঠবদ্ধতা, অ্যাসিড, হাঁপানি, কোলাইটিস হবে না। চর্বি জমবে না। পবনমুক্তাসনে পেটে গ্যাস হয় না। এছাড়া বিভিন্ন যোগাসন শিখলে বিনা পয়সায় নীরোগ থাকা যাবে। ভবিষ্যতে শরীর ভারী ও মোটা কিংবা ভারসাম্যহীন হবে না। যোগব্যায়ামের বই কিনে শিশুকে পড়ান ও ব্যায়াম অভ্যাস করান।

• শিশুকে পরিপূর্ণ মানুষ করবেন কিভাবে? •

শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ এবং দেশের কর্ণধার— সমাজ, সংসারের আশা ভরসা। শিশুর মানুষ হওয়ার ব্যাপারে বাবা মায়ের যেমন দায়িত্ব কর্তব্য আছে তেমনি বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুকেও কতগুলি বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

(১) শিশুকে স্বতঃগ্রহণীয় (কোন জিনিসকে গ্রহণ করতে বা জানতে বিশেষভাবে আগ্রহী) বা Self acceptance হতে হবে। (২) নিজের আবেগ নিয়ে আনন্দে বাঁচতে হবে। (৩) নিজের সামর্থের উপর আস্থা রাখতে হবে। জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। (৪) কোন বিষয়ে দায়িত্ব নিয়ে নিজস্ব ক্ষমতায় চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে। (৫) ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসাবে নিজের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এটাও জানতে হবে— Self acceptance does not mean smug self satisfaction but rather the willingness to face the facts and conditions of life, whether favourable or unfavourable as candidly and as fully as possible.

Self acceptance বাড়াতে হলে শিশুকে তার সামর্থ্য অনুসারে নির্দিষ্ট পথে চলতে হবে। কী তার সামর্থ্য-অসামর্থ্য সেটি খুঁজে বের করতে হবে তার বাবা-মাকে। শিশুকে আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা ও কৃতিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। অবশ্য তাই নয় যে উচ্চাশা থাকবে না।

যাই হোক, শিশুকে পরিপূর্ণ মানুষ হতে হলে নিম্নের তিনটি উপাদানকে সাথী করতে হবে।

(i) Affection (স্নেহ-ভালবাসা)

(ii) Acceptance (গ্রহণীয়)

(iii) Achievement (উন্নতি)

প্রথম জীবনে শিশুর acceptance তার মা বাবার কাছে অর্থাৎ বাবা মায়ের কথা শিশুকে আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতে হবে। তারপর বন্ধুদের কথা শুনতে হবে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে affection তার রূপ ও ভোল পালটায়। রঙও বদলায়।

শিশুর আত্মসন্তুষ্টি, স্নেহ-ভালবাসা আর উন্নতির আগ্রহই তাকে মনুষ্যত্বের চরম পর্যায়ে উন্নীত করে। নিজের প্রতি আস্থাই আত্মসন্তুষ্টি। এই আস্থাই তার ব্যক্তিত্বের সহায়ক। এই তিনটির মধ্যে একটির অভাব হলে শিশু নিজেকে কারো সাথে adjustment করতে পারবে না। শিশু সুখী হতেও পারবে না।

(১) এছাড়া শিশুকে সুখী করার জন্যে তাকে বাস্তববাদী হওয়ার ট্রেনিং দিতে হবে। এসব বাবা মা ও গৃহশিক্ষকের কর্তব্য।

(২) সন্তান যাতে সমাজগ্রাহ্য হয় সেজন্য তার বাবা মাকে বেশ কিছু ভাল ম্যানার বা আচার আচরণ তার স্বভাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দিতে হবে। তবে সে ঐ ভাল ব্যবহারের জন্য প্রশংসা পাবে।

(৩) শৈশবই শিশুর ফাউন্ডেশন। বাবা মাকে শিশুর ঐ ফাউন্ডেশন বা ভিত গড়ে দিতে হবে। এছাড়া ছাত্রজীবনই শিশুর Seed time of life. একটি চারাগাছকে যেমনভাবে সার-জল দিয়ে আগাছাহীন করে, বেড়া দিয়ে সতেজ করে বাড়িয়ে তুলতে হয়, শিশুকেও তেমনিভাবে বাড়িয়ে তুলতে হবে। তবে সে পরবর্তীকালে সুখী মানুষ হবে। এছাড়া পড়াশোনা-খেলাধুলা-ব্যায়াম ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দে বিচরণ তো রয়েছেই। একজন মনোবিজ্ঞানী বলেছেন— If the child lays foundations that guarantee happiness during the remaining years of his life.

শিশুর ব্যক্তিত্ব

ব্যক্তিত্ব হচ্ছে মানুষের এমন একটি ক্ষমতা যার দ্বারা অন্য ব্যক্তি প্রভাবিত হয়। প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্ত্বা অভিনব। ব্যক্তিসত্ত্বাই হচ্ছে Style of life. ব্রোনসন্ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলেছেন— "Style of life is a complex if attitudes traits and attributes which give a characteristic flavour to the person's interactions." ব্যক্তিত্ব চার প্রকার— (১) কর্মঠ, (২) দৃঢ়, (৩) নিরীহ ও ধীর এবং (৪) হতাশাগ্রস্ত।

এই চার প্রকার ব্যক্তিত্ব নিয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করে। এগুলি প্রকাশ পায় শিশুর খাদ্যগ্রহণের প্রতিক্রিয়া, হাত-পা নাড়া এবং কান্নাকাটির মধ্য দিয়ে। হার্লক বলেছেন— "From these a pattern is built up from which the individual never completely escapes."

Breckenridge & Vincent এর ধারণা হল— "Each personality preserves a central stability, a central core or focus or 'Centre of gravity'

which does not change. Some personalities are for more flexible than others and change radically under radical changes in environment, others have a granite like quality which withstands the impact of the most radical changes of environment." তবে মনোবিজ্ঞানী **ডেভিস এবং হ্যাঙ্গিহার্স্ট** এই মতের সঙ্গে একমত নন। তারা মনে করেন, সুযোগ পেলে মানুষের ধারণা ও ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন স্বাভাবিক। যদিও আমাদের বেশির ভাগ মা-বাবার ধারণা ব্যক্তিত্ব হল বংশগত এবং তা মোটামুটি স্থিতিশীল। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন আসে। যদি দেখা যায় শিশুর ব্যক্তিত্বে স্বার্থপরতা প্রকট হচ্ছে তাহলে গাইডেন্সের মধ্য দিয়ে তাকে সমাজগ্রাহ্য করা যেতে পারে এবং সে অনেকাংশেই স্বার্থপরতা ভুলে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে শেখে। আর এটা Trial and error পদ্ধতিতেই করা সম্ভব। তখন সে স্বার্থের পরিবর্তে মহানুভবতা বা Socal acceptance কে বেশি গুরুত্ব দিতে শিখবে। আর এই মহানুভবতা তার মধ্যে আসতে পারে by learning not by maturation. আসল কথা হচ্ছে, সময়োপযোগী ধারণার পরিবর্তন করতে হবে, তবে তা সবক্ষেত্রে সম্ভব নাও হতে পারে। ব্যক্তির দৈহিক পরিবর্তনে, পরিবেশের পরিবর্তনে, সামাজিক চাপ, উন্নত পেশা বা জীবিকা, ক্লান্তি, জটিল অসুখ, অপুষ্টি, সফলতা ও ব্যর্থতায়, অর্থনৈতিক সমস্যায়, ধর্মীয় আনুগত্যে, পরিবারের ব্যক্তিগত সমস্যায়, এমনকি শিশুর নামের মধ্য দিয়েও ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়। নাম সুন্দর হলেও তার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্ব বাড়ে। পঞ্চাননকে পঞ্চা বলে ডাকলে তার মধ্যে যেরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, তাকে পঞ্চানন বলে ডাকলে কখনই তার মধ্যে একই প্রতিক্রিয়া হবে না। নাম যদি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হয় তাতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বাড়ে। The child's name can be either a psychological asset or a psychological liability. এছাড়াও— If his name elicits pleasant association on the minds of others, they will treat him well, and this will have a good effect on his self concept. If it elicits unfavourable first impressions, the treatment the child receives from others will be less pleasant, and, as a result he will develop an unfavourable self concept.

কোন শিশুকে কোন বিষয়ে হতাশ করলে তার ব্যক্তিত্বে অনেক প্রভাব পড়তে পারে— যেমন (১) শিশুর মনের উচ্চাশা কমতে পারে। (২) শিশু হীনমন্যতায় ভুগবে, ব্যক্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। (৩) শিশু বিমর্ষ ও অসুখী হবে। (৪) কাজে নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে। (৫) তার মধ্যে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। (৬) উষ্ণ বা বদমেজাজী হয়ে পড়বে।

• শিশুকে ব্যক্তিত্ববান করবেন কিভাবে? •

যে কোন মানুষের ব্যক্তিত্ব তৈরী হয় ছোটবেলা থেকে। তাই পিতা মাতার উচিত তাদের শিশুটিকে ব্যক্তিত্ববান হওয়ার জন্য সার্বিক চেষ্টা করা। যথা—

(১) শিশুকে একটি সুন্দর নামের মধ্য দিয়ে ডাকতে হবে।

(২) শিশুর কাছে পোশাক একটা স্ট্যাটাস ও সিম্বল— যা, শিশুর কেন— সমস্ত মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের হাতিয়ার। পোশাক তার বন্ধুমহলে মর্যাদা বাড়িয়ে দেবে। তাই ব্যক্তিত্ব বিকাশে ভাল পোশাক চাই। পোশাক যে মানুষের কি পরিমাণ ব্যক্তিত্ব বাড়ায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমন— পুলিশের ইউনিফর্ম, নার্স ও ডাক্তারদের পোশাক, রাজার পোশাক, দস্যুর পোশাক, স্কুলের ইউনিফর্ম, মেয়েদের লাল অথবা সবুজ পেড়ে স্কুল শাড়ীর কথা ভেবে দেখুন তো— এগুলো কি ব্যক্তিত্ব বাড়াতে সাহায্য করে না? শুধু ব্যক্তিত্ব নয়, এগুলি ছেলে মেয়েদের মধ্যে স্মার্টনেস আনে। তাছাড়া ফ্যাশন ও ডিজাইন, মচমচে জুতো মানুষকে শক্তিমান ও মেজাজী করে তোলে।

(৩) এছাড়া শিশু যদি স্কুলের ভাল ছাত্র হয়, তাহলে সমস্ত শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের কাছে সে প্রভাব বিস্তার করবেই।

(৪) খেলায় পারদর্শী ছাত্রের ব্যক্তিত্ব আর সাধারণ ছাত্রের ব্যক্তিত্ব কখনোই এক হতে পারে না।

(৫) যে ছেলেকে সবাই বেশী পছন্দ করে তার ব্যক্তিত্ব অন্যের চেয়ে অবশ্যই ভাল হবে।

(৬) নেতৃত্বমূলক ভূমিকার মধ্য দিয়েও শিশু ব্যক্তিত্ববান হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে সামাজিক কৃতিত্বের কথা বলাটাই বাহুল্য।

(৭) গান ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যেমন শিশু ব্যক্তিত্ববান হয়, তেমনি আবার শৃঙ্খলাপরায়ণতা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিশুকে ব্যক্তিত্ববান করতে প্রচন্ডভাবে সাহায্য করে।

(৮) পারিবারিক শান্তি শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে দারুণভাবে সহায়ক। যে বাড়ীতে ভালবাসার অভাব সে বাড়ীর শিশু আর যে পরিবারে স্বর্গ বিরাজ করে সেই পরিবারের শিশুর মানসিক বিকাশ অনেক বেশি সংহত। শিশু যদি কলহ ও অশান্তিপূর্ণ পরিবারে জন্ম নিয়ে সেই পরিবেশেই বড় হতে থাকে, তাহলে তার জীবন কিন্তু ক্রমে খিট্‌খিটে ও দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। কিন্তু যদি criticism এর মধ্যে বাস করে বড় হয় তাহলে he learns to condemn মানে সবাইকে নিন্দা করতেই শিখবে, ভয়ের পরিবেশে বড় হলে সে ভীতু হবেই।

If he lives with tolerance (সহনশক্তি), he learns to be patient. If he lives with jealousy he learns to fell guilty. If he lives with encouragement he learns to be confident. If he lives with honesty he learns to value the truth and if he lives with security he learns to have faith in himself and others.

(১১) মা-বাবার মর্যাদার উপর শিশুর ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে। জাতি অনুসারে সমাজের প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। একজন ইহুদী সন্তানের মধ্যে যে aggressiveness (আক্রমণাত্মক), destructiveness (ধ্বংসাত্মক), derogatory attitudes (অপরের ক্ষতিকারক মনোভাব) দেখা যায় একজন বাঙালীর মধ্যে তা দেখা যায় না।

(১২) একজন নিম্নবর্ণের মানুষের ব্যক্তিত্ব একজন উচ্চবর্ণের মানুষের ব্যক্তিত্ব এক হতে পারে না। ব্রাহ্মণ আর চন্ডালের ব্যক্তিত্ব পৃথক হবেই।

(১৩) মানুষের Position তার ব্যক্তিত্বের ওপর ছাপ ফেলবেই। কোন সমাজে যমজ সন্তানেরা যদি দেখে যে তাদের যমজ পরিচয়ের attention value বেশি, তাহলে তারা সেই পরিচয় পেয়ে বড় হতে চাইবে। মুসলমানদের attention value (সমাদর) যেখানে বেশি সেখানে তারাই প্রভাব বিস্তার করবে, তারাই ব্যক্তিত্ববান হবে।

এছাড়া ব্যক্তিত্বের ২০টি বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

(১) ব্যক্তিত্ববানরা বয়স অনুসারে কাজের দায়িত্ব নিতে পটু হবে।
(২) জীবন যে একটি যুদ্ধক্ষেত্র— তা মেনে নিতে ইচ্ছুক।
(৩) হতাশা সইতে পারদর্শী।
(৪) সমাজ সংসারে সবাইকে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারবে।
(৫) অভীষ্টে পৌঁছতে সক্ষম।
(৬) সহমর্মিতার অধিকারী হবে।
(৭) 'হ্যাঁ' বা 'না' বলার দৃঢ়তা থাকবে।
(৮) ত্রুটি থেকে শিক্ষা নেবে।
(৯) নির্বাচনী ক্ষমতার অধিকারী হবে।
(১০) নিজের করণীয় বিষয়ে বোধশক্তির অধিকারী হবে।
(১১) সমস্যা সমাধানে তৎপরতা দেখাবে।
(১২) সুখী সংসার গড়তে উদ্যোগী হবে।
(১৩) অভিজ্ঞতার ভার নিতে প্রস্তুত।
(১৪) বাস্তব কাজে বেশি আনন্দ পাবে।

(১৫) নিজেই কোন বড় কাজে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।
(১৬) অপ্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সফলতাকে তুলে ধরবে না।
(১৭) প্রতিকূল পরিবেশ মানিয়ে নিতে পারে।
(১৮) সরাসরি ক্ষোভ প্রকাশ করার অধিকারী হবে।
(১৯) পরচর্চা থেকে বিরত থাকে।
(২০) ভালকে ভাল বলতে পারে।

ক) • একজন মানুষ তার জীবনকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবেন? •

মানুষ এমনই এক জীব যারা শুধুমাত্র স্বার্থের জন্যে কি জঘন্য কর্মই না করতে পারে। নিজেরাই নিজেদের মনে লোডশেডিং করে আত্মীয়দের হৃদয়কে লুঠ করছে। আবার জীবনকে কাছাকাছি পাওয়ার জন্য ছুটছে জীবনের অন্বেষণে। এরই মধ্যে আমাদেরকে এগিয়ে চলতে হবে। কিন্তু কিভাবে এগবো শুনুন।

(১) ভেবেচিন্তে বাড়ীর পরিবেশ দেখে মেয়েকে বিবাহ করতে হবে। তাতে সেই স্ত্রী কর্তৃত্ব ফলাতে চেষ্টা করবে না বা স্বেচ্ছাচার থেকে বিরত থাকবে। স্ত্রী বাড়ীর লোকের আদেশ যথাযথ পালন করবে। তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। অনেক ছেলে বা মেয়ে আছে তাদের স্বভাবটা কয়লার মতো। কয়লাকে শতবার ধুলেও যেমন তার কালোরঙের পরিবর্তন হয় না তেমনি অনেক বোঝালেও সেইসব ছেলেমেয়ের স্বভাবের পরিবর্তন হয় না। তাদের রক্তের কণায় কণায় স্বভাব মিশে আছে।

(২) সংসারে বাস করে নিজেকে সবসময় ব্যস্ত ভাব দেখানো চলবে না। তাতে পাশের মানুষ অসন্তোষ প্রকাশ করবেন।

(৩) প্রতিদিন কিছুটা সময় স্ত্রী-পুত্রদের সাথে আনন্দে কাটাতে হবে। স্ত্রীর কথাকে গুরুত্ব দিতে হবে। স্ত্রীকে হেয় করা চলবে না। অবুঝ স্ত্রীকে বুঝতে এবং বোঝাতে চেষ্টা করতে হবে। পিতা হয়ে পুত্রের ভাষা, মা হয়ে ছেলের জিজ্ঞাসার উত্তর জানার চেষ্টা করা চাই। স্বামী হয়ে স্ত্রীকে আর স্ত্রী হয়ে স্বামীকে চেনা দরকার।

(৪) সংসারে কোন ব্যাপারেই মাথা গরম করা চলবে না। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা অথবা স্বামী-শাশুড়ী ও শ্বশুরকে সব ব্যাপারে সমর্থন, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা দেখাতে হবে। তাতে সবাই খুশিতে থাকবেন।

(৫) বাবা মাকে ছেলেমেয়েদের কাজের প্রশংসা করতে হবে সর্বদা। প্রয়োজনে দৃঢ় হতে হবে কিন্তু কঠোর হওয়া চলবে না। তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া চাই।

(৬) শিশুদের আবদার-বায়না ও ইচ্ছাপূরণ যথাসাধ্য করা দরকার। তাবলে আকাশের চাঁদ ধরে দিতে বললে তা সম্ভব নয়। অসম্ভব-অযৌক্তিক বায়না থেকে বিরত থাকবেন।

(৭) রাশ হালকা হলেও ছেলেমেয়ের প্রতি রশি হাল্কা করবেন না।

(৮) পরিজনদের সাথে গভীরভাবে মিশতে হবে, পারিবারিক ঈর্ষা বিবাদে যুক্ত হওয়া উচিৎ নয়। কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা চলবে না।

(৯) কেউ যদি আপনাকে কারো বিপক্ষে কথা বলে আপনার মনকে বিষাতে চায়— তা বিবেচনা করে দেখবেন। মোটেই বিষিয়ে যাবেন না। স্ত্রীর উপর অত্যাচার করলে ভবিষ্যতে সেটা বুমেরাং হয়ে ফিরে আসতে পারে— এটা সর্বদা ভাববেন। কারণ অপমান কেউ কোনদিন ভুলে না।

(১০) বন্ধুদের নিয়ে কিছুটা সময় কাটাবেন। জীবনে একজন অন্ততঃ অন্তরঙ্গ বন্ধু রাখবেন। তথাপি তা থেকেও সাবধান থাকা দরকার। কেননা ইন্দিরা গান্ধীকে তার দেহরক্ষীই হত্যা করেছিল। যীশুখ্রীষ্টকেও তার প্রিয় শিষ্য ধরিয়ে দিয়েছিল।

(১১) কেউ যদি বারবার ভাল ব্যবহার দেখাতে চায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাবেন— তাকে বন্ধু করতে পারেন। তবে সর্বদা সতর্ক থাকবেন, তিনি যেন 'বিষকুম্ভ পয়োমুখম্' না হন।

শাস্ত্রে আছে— দুর্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ বিশ্বাসকারণম্।
মধুতিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম্।।

দুষ্ট লোক প্রিয় কথা বললেও তাকে কখনো বিশ্বাস করবেন না। কারণ তাদের মুখে মধু আর অন্তরে বিষ আছে। মিষ্টি কথা বলে আপনার বাড়ীতে এসে তারা আপনাকে সর্বস্বান্ত করে দেবে। সব লুটে নিয়ে পালাবে।

(১২) অফিসের ব্যাপারকে বাড়ীতে আনবেন না। সেখানে যদি অশান্তি হয় তা সেখানেই রেখে আসবেন।

(১৩) পেশাগত যোগ্যতা বাড়াতে পড়াশোনা করতে পারেন। বশের মন জুগিয়ে চলতে হবে। আপনি বশ হলে কর্মচারীদের সাথে সুমিষ্ট ব্যবহার করবেন। একটু সহ্যশক্তির অধিকারী হবেন। আপন মর্যাদায় স্ফীত হয়ে সর্বদা কঠোরতা প্রকাশ করবেন না। মাঝে মাঝে দৃঢ় হতে পারেন কিন্তু নিষ্ঠুর বা কঠোর হবেন না।

(১৪) সংসারে স্ত্রীর হাতেও কিছু স্বাধীনতা ও টাকাপয়সা দেবেন। তিনি যেন সবসময় আপনার মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকেন না। তাতে তার মনে অশান্তি আসবে। আপনার প্রতি সহানুভূতি কমে যাবে।

(১৫) স্ত্রীর রান্নার প্রশংসা করবেন। সাধারণ কথায় মুখ খারাপ করবেন না।

(১৬) বাইরে জনসেবামূলক কাজ করবেন। তাতে মানুষের কাছে আপনার ভাবমূর্তি বাড়বে। আপনাকে সবাই ভালবাসবে।

(১৭) প্রথম জীবন থেকে নিজের আয়ের শতকরা ২০ ভাগ টাকা ব্যাঙ্ক অথবা পোস্ট অফিসে জমা রাখবেন। তাতে বৃদ্ধবয়সে সুখে থাকবেন।

(১৮) দুর্ঘটনাজনিত বীমা করে রাখুন। স্ত্রীর নামেও বীমা করবেন। সময়ে কাজে লাগবে।

(১৯) অভিজাত এলাকায় বা কর্মস্থলে ভাল পরিবেশ পেলে সেখানে বাস করতে পারেন। জন্মভূমির মাটি কামড়ে যে পড়ে থাকতে হবে তার কোন কথা নেই।

(২০) ফিক্সড্ ডিপোজিট সামর্থ্য অনুসারে ২/১টা করে রাখুন।

(২১) মোটা হতে চেষ্টা করবেন না। প্রথম থেকেই তেল ও চর্বিজাতীয় খাদ্য খাবেন না।

(২২) পুষ্টিকর খাদ্য নিজেও খাবেন এবং সন্তানদেরও খাওয়াবেন। খাওয়ার বিষয়ে স্ত্রী-পুত্র-মা-বাবা কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবেন না। ভাববেন, সবার মধ্যেই অনুভূতি ক্ষমতা আছে। বিশেষ করে স্ত্রীর খাবার দিকে অনেক স্বামীই লক্ষ্য দেন না— এটা খুবই ভুল, এ ভুল কোনদিন কারো করা ঠিক নয়।

(২৩) অযথা কাউকে কোন ব্যাপারে ভুল বুঝে অন্যায় কথা বলবেন না, পরে অনুতাপ করতে হবে।

(২৪) কারো কাছে অন্যায়ভাবে অর্থ নেবেন না, প্রতারণা থেকে বিরত থাকুন।

(২৫) **সদা সত্যং বদ। প্রিয়ং বদ, প্রিয়বাক্যপ্রদানেন সর্বে তুষ্যন্তি জন্তবঃ।**
তস্মাৎ তদেব বক্তব্যং বচনে ক্য দরিদ্রতা।।

প্রিয় কথা বললে সবাই যদি সন্তুষ্ট হয় তাহলে প্রিয় কথা বলতে দোষ কি?

(২৬) কখনো আশা হারাবেন না। শান্তি মনে রয়েছে বনে নয়। অযথা গন্ডগোল করে বাড়ী ছেড়ে পালানোর বা আত্মহত্যার মতলব না করাই উচিৎ। ভাবতে হবে— সারা সংসারের দায়িত্ব আপনার উপর।

(২৭) সংসারের ভাইদের মধ্যে কমবেশি আয় নিয়ে ঈর্ষা না করাই ভাল। আপনার পাঁচটা আঙুল সমান নয়।

(২৮) বাড়ীতে মাঝে মাঝে আনন্দ উৎসব করে দু'পাঁচজন লোককে খাওয়ানো দরকার। অবশ্য সামর্থ্য অনুসারে। তাতে মনের শান্তি ও তৃপ্তি বাড়বে।

(২৯) ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা উচিত। জীবনে দুঃখ পেলেও তৎক্ষণাৎ সে দুঃখ কেটে যাবে। সামর্থ্য থাকলে দানধ্যান করা উচিত। শান্তি মিলবে।

(৩০) কোন কাজ করা উচিৎ— তা ভেবেচিন্তে আয় বুঝে করবেন। কারণ—

যেজন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি,
আশু গৃহে তার দেখিবে না আর
নিশীথে প্রদীপ ভাতি।

আবেগ ও উচ্ছ্বাসের বশে অযথা অর্থ ব্যয় না করাই ভাল। তাহলে পরে ভুগতে হবে না।

(৩১) জীবনের শেষ সময় কাটানোর জন্য একটি শখকে পুষে রাখুন, যে আপনাকে সারাজীবন ব্যস্ত রাখবে। যেমন— গানবাজনা, কোন কিছু সারানো, লেখালেখি, রাজনীতি ইত্যাদি।

(৩২) মঠ-মন্দিরে-গীর্জাতে-ধর্মক্ষেত্রে সস্ত্রীক যাবেন— প্রার্থনা করবেন, শান্তি কামনা করবেন। জীবনটাকে হেসে খেলে কাটিয়ে দিন।

খ) • শান্তিতে থাকতে হলে ভাল বন্ধু করুন •

বন্ধুহীনের জীবন বৃথা। **'অমিত্রস্য কুতো সুখম্।'** এমন একজন বন্ধু করুন যে সারাজীবন আপনার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবেন। জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তি হল একটা গভীর সম্পর্ক তৈরী করে যাওয়া। বন্ধুত্ব জীবনে জীবন যোগ করার এক সাধনা। বন্ধুত্ব করুন আর ভালবাসুন শুধু অন্যকে ধন্য করার জন্য নয়— নিজেকে গণ্য করার জন্য। যে বন্ধু অপর বন্ধুর সুখে ও দুঃখে সমব্যথী ও সাথী হতে পারে সেই প্রকৃত বন্ধু। **দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়ার মত বন্ধু অনেক আছে কিন্তু সুখে সুখী হওয়ার মত বন্ধু নেই।** প্রকৃত বন্ধুই অপরকে সুখী করতে পারে। জীবনকে বিকশিত করতে ভাল বন্ধু একান্ত দরকার। যাকে কাছে পেলে মনের শান্তি আসে আর কোনরকম উদ্বেগ কমে যায় সেই প্রকৃত বন্ধু। তবে বিচার বিবেচনা করে বন্ধু করা দরকার। আজকাল ঐরূপ আদর্শ বন্ধু মেলা ভার। সবাই স্বার্থপর। নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার তালে ব্যস্ত। কাকে আপনি ভাল বলবেন? যাকেই বিশ্বাস করবেন সেই আপনার সর্বনাশ করবে। আমি বিশ্বাস করে দু'জন মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। তাদের সুবিধা-অসুবিধায় সাহায্য করেছিলাম। কিন্তু সেই সাহায্য নিয়ে সরে পড়েছে। তারা আর বন্ধুত্ব রাখতে চায়নি। তাই সমান অবস্থা ও যোগ্যতাসম্পন্ন বন্ধু করুন— যে বন্ধুত্ব সারাজীবন টিকে থাকবে। উৎসবে, বিপদে, দুঃখে-শোকে-আনন্দে, দুর্ভিক্ষে, বিচারালয়ে, শ্মশানে যে পাশে থাকে সেই প্রকৃত বন্ধু।

"উৎসবে-ব্যসনে চৈব দুঃর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যত্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।।

বিদ্যাসাগর নিজে কখনো বলেন নি যে আমি মাকে ভক্তি দেখাতে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ দামোদর পার হয়ে এসেছিলাম। তাঁর উপযুক্ত বন্ধুই একথা লিখেছিলেন। **তাই জীবনের ব্যাপ্তি, বিকাশ ও আনন্দ-অনুভূতির জন্য পাশে একজন মনের মত বন্ধু দরকার— যার মধ্যে থাকবে নিষ্কাম ভালবাসা, অসামান্য সরলতা ও সহানুভূতি।**

গ) • মানুষের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ থাকা দরকার যার দ্বারা চিরকাল শান্তি অনুভব করা যায় •

আমরা চেষ্টা করেও কতকগুলি গুণের অধিকারী হতে পারিনি। তাই দুঃখে কষ্টে ভুগতে হয়। এগুলি আয়ত্ত করা কিন্তু আমাদের নিজেদের হাতে। অপরের কাছ থেকে পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না কিংবা ধার করতে হয় না। এগুলি হচ্ছে— (১) সাহসিকতা (২) ধৈর্য (৩) সহযোগিতা (৪) শালীনতা ও শৃঙ্খলাবোধ (৫) বিনয়-নম্রতা (৬) দৃঢ়তা ও প্রতিজ্ঞা (৭) আগ্রহ ও উন্নতির ইচ্ছা।

(১) **সাহসিকতা**— মানব চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণ হল সাহসিকতা। বিবেকানন্দ বলেছেন— সাহসিকতাই পুণ্য আর ভীরুতাই পাপ। সব কাজে সাহস করে এগিয়ে যেতে হবে, মনকে শক্ত করে বলতে হবে— আমি নিশ্চয়ই পারব। পারবো না বলে সর্বদা মন ভার করে বসে থাকলে চলবে না। সাহসিকতা না থাকলে প্রতি কাজেই মানুষ ব্যর্থ হবে।

(২) **ধৈর্য**— ধৈর্য ব্যক্তিগত সাফল্য আনে। বারবার ব্যর্থ হয়েও ধৈর্য ধরলে সফলতা আসবেই। তবে মানুষ যদি সেই সাফল্যের পিছনে চক্রান্ত করে তাহলে কিছু বলার থাকে না। ধৈর্যশীল ব্যক্তি কোথাও কোনদিন পরাজিত হয়েছে বলে শোনা যায় না। যুধিষ্ঠির পঞ্চভ্রাতা ধৈর্য ধরেছিলেন বলেই কুরুক্ষেত্রের মহাসংগ্রামে জয়ী হতে পেরেছিলেন। অধৈর্য হলে তারা অনেকদিন আগেই বা বনবাসের পূর্বেই কুরক্ষেত্র বাঁধিয়ে পরস্পর ধ্বংস হতেন। বোপদেবও অসাধারণ ধৈর্য ও অধ্যবসায় দ্বারা ক্ষয়ীভূত পাথরকে দেখে বিরাট পন্ডিত হয়েছিলেন।

(৩) **সহযোগিতা**— পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা বিরাট কার্য সাধিত হয়। কোন মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া একা অগ্রসর হতে পারেনি। সহযোগিতার দ্বারাই জগৎ চলছে। কোন উৎসব করতে হলে পরস্পর সহযোগিতা

চাইতে হয়। আর তাদের আগমনে মনে আনন্দ আসে। পরিবারে একা একা বাঁচা যায় না। একা একা কোন একটি প্রতিষ্ঠানও চলতে পারে না। একা একা সাফল্য আনা সম্ভব নয়।

(৪) **শালীনতা ও শৃঙ্খলাবোধ**— ডেকোরাম, ডিসেন্সি ও ডিসিপ্লিনের অধিকারী না হলে আপনার জীবন চলবে এলোমেলোভাবে। সেটা সকলেরই দৃষ্টিকটু লাগবে। আপনি কুসমালোচনার পাত্র হয়ে উঠবেন। তাতে আনন্দে থাকতে পারবেন না।

(৫) **বিনয়-নম্রতা**— বিনয়-নম্রতা মানুষকে মহান করে তোলে। মানুষ মানুষের দয়ার অধিকারী হয়। বিনয়ী ব্যক্তিকে সবাই সমীহ করে। নম্র ও বিনয়ী ছেলেরা সংসারের সকলের ভালবাসা পায়। সমাজে সবাই তাদের নাম স্মরণ করে। নমনীয় গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা সারাজীবন আনন্দে থাকেন।

(৬) **দৃঢ় প্রতিজ্ঞ**— কোন কিছু কাজ করবার দৃঢ়তা থাকলে সে কাজ অবশ্যই হবে। আসলে সব কাজের মধ্যে চাই মনের জোর। ভাঙা মন নিয়ে কোন কাজ হয় না। কোন কাজ করার দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে গেলে অর্থের অভাব হয় না। যে কোন স্থান থেকে সে অর্থ এসে যায়। তেমনি পড়াশোনা থেকে শুরু করে উৎসব-অনুষ্ঠান কঠিন কাজকর্মও সম্ভব হয় যদি মনের মধ্যে দৃঢ়তা থাকে।

(৭) **আগ্রহ ও উন্নতির ইচ্ছা**— সামর্থ অনুসারে কোন কাজে আগ্রহ প্রকাশ করা প্রতি মানুষের উচিত: অতি সামান্য ব্যাপারে যার আগ্রহ আছে সেই ব্যক্তি জীবনকে উপভোগ করতে পারে। আগ্রহ শুধু নিজের কাজের প্রতি নয়, আব্রহ্মস্তম্ভ অবধি সমস্ত প্রাণীর প্রতি। পাখির গানে—নদীর তানে—রবির কিরণে—পলাশের রঙে—বন্যার তরঙ্গে—ভায়ের মায়ের স্নেহে, শিশুদের খেলাধূলায়—সাংস্কৃতির মঞ্চে আগ্রহ সৃষ্টি করুন। জীবন সুখশান্তিময় হয়ে উঠবে। জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে। আত্মার উন্নতি ঘটবে। মনের বিকাশ হবে—জীবন বিরাট ব্যাপ্তিতে ভরে উঠবে। পৃথিবীকে তখন আপনার মনে হবে 'বসুধৈব কুটুম্বকম'।

দুঃখে দুঃখী হওয়ার মত অনেক বন্ধু আছে। কিন্তু সুখে সুখী হওয়ার মত বন্ধু পাওয়া যাবে না। সেই প্রকৃত বন্ধু যে আপনার সুখে সুখী হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানব জীবন ও তার সামাজিক উদ্দেশ্য

Arise, Awake and stop not till the goal is reached— ওঠো, জাগো, যতক্ষণ না পর্যন্ত অভীষ্ট লাভ করছ ততক্ষণ থামবে না। হে বিশ্বমানব! বিবাদ নয়— সহায়তা, বিনাশ নয়— পরস্পরের ভাবগ্রহণ, মতবিরোধ নয়— সমন্বয় ও শান্তিই হোক আমাদের সবার জীবনের মূলমন্ত্র। (বিবেকানন্দ)

(১) **হৃদয়ের অন্তর্নিহিত যে দেবত্ব—তাকে ফুটিয়ে তোলার সাধনাই মানব জীবনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। জীবনের কাজ হল ঘরে-বাইরে যথার্থ বিবেকবান সহানুভূতিসম্পন্ন নরনারীর সৃষ্টি করা।** তথাকথিত ধর্মের কাজও তাই। ধর্মের নামে মানুষ যদি কোন পাশবিক কাজকর্ম করে থাকে সেজন্যে ধর্ম দায়ী নয়— মানুষই দায়ী। তাছাড়া কোন ধর্মকেই অবজ্ঞা করা উচিৎ নয়। সব ধর্মের একই সুর— একই উদ্দেশ্য। বিবেকানন্দ বলেছিলেন— আমরা মানবজাতিকে এমন স্থানে নিয়ে যেতে চাই যেখানে বেদ-বেদান্ত নেই— কোরাণ-গীতা নেই আর বাইবেলও নেই অথচ বেদ-বাইবেল আর কোরাণের সমন্বয় দ্বারা সব কাজ করতে হবে। এককথায় **মানুষকে ভালবাসতে হবে। ভালবাসাই জীবন ধর্ম— ভালবাসাই জীবনের মূল সুর।** ধনী-নির্ধন জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে আপন ভাবাই ধর্ম আর এটাই জীবনের উদ্দেশ্য। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ব্রাহ্মণ, শূদ্র সমাজের জাতিভেদ মানতেন না। তার কাছে মানুষ— মানুষই। সেই মানুষের মঙ্গল করাই জীবনের ব্রত হওয়া উচিৎ। মুক্তি-টুক্তি কিংবা স্বর্গলাভ নয়।

স্বর্গ সম্পর্কে ধারণা আমাদের এ মুহূর্তেই জীবন থেকে মুছে দেওয়া দরকার। কারণ স্বর্গ-নরক বলে পৃথিবী থেকে দূরে কোন কিছু নেই, এই দুটো কাল্পনিক উপসর্গমাত্র। তাছাড়া স্বর্গ এমন কিছু লোভনীয় দুনিয়া নয় যে তার পেছনে পেছনে পৃথিবীর নরনারী ছুটে ছুটে হয়রান করে তুলবে নিজেদের। আজকের দিনের আমাদের পাড়ার রামু-শ্যামু, আব্দুল-ইসমাইলরাও স্বর্গের জন্য লালায়িত নয়। আমিও স্বর্গ কামনা করিনা। **মানুষই আমার স্বর্গ। মানুষকে ভালবাসাই স্বর্গীয় আনন্দলাভ।** রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, দেশবন্ধু এই একই কথা বলে গেছেন— মানুষকে ভালবাস— মানুষের সেবা কর— মানুষের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও— মানুষের মুখে হাসি ফোটাও— মানুষের দুঃখ দূর কর— মানুষকে মাথা তুলে বাঁচতে দাও। আর এগুলোই হোক জীবনের উদ্দেশ্য।

(২) **এমন কথা বলুন যে কথা দুর্বল মানুষকে চাঙ্গা করে তুলবে। দুনিয়ার**

নরনারীকে বাঁচিয়ে রাখতে— বড় হতে— আদর্শবান হতে আপনার কথা মন্ত্রের মত কাজ করুক। সব কথাই যেন জীবনধর্মী হয় অর্থাৎ বাঁচতে সাহায্য করে। নেতিবাচক বা নৈরাশ্যমূলক কথা বলবেন না। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অতি সাধারণ মানুষ থেকে ধনী-মহাধনী আবার জীবন সমস্যায় জর্জরিত কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলা **নৈরাশ্য কবলিত মানুষকে আলোর পথ দেখাবে,** হতোদ্যম মানুষকে নবীন আশা আর উদ্দীপনায় ভরিয়ে তুলবে। পিছিয়ে পড়া মানুষকে আমাদের শোনাতে হবে বোধনের বাজনা আর তার কানে দিতে হবে উদ্দীপ্ত হওয়ার মন্ত্র— নিজেকে ফিরে পাওয়ার তন্ত্র আর তাদের শক্ত মুঠোয় ধরিয়ে দিতে হবে জীবনযুদ্ধের হৃদয় কর্ষণের যন্ত্র। **তবে কোন ব্যক্তিকে কখনো আক্কেল দেবেন না।**

যারা ভগবদ্ভক্ত তাদেরও ভাবতে হবে যে মানুষকে বাদ দিয়ে বা মানুষকে অবজ্ঞা করে কিংবা দূরে রেখে ভগবানকে ভালবাসা যায় না। মর্ত্যের মানুষের মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব বিরাজমান। জীবনকে স্বীকৃতি দিয়ে মহাজীবনের পথে আমাদের যাত্রা করতে হবে শুরু।

(৩) ঈর্ষা নয়, হিংসা নয়, পরশ্রীকাতরতা নয়— ভালবাসাই সব। ভালবাসাই external truth. ভালবাসার দ্বারা সংসারে-সমাজে স্বর্গরাজ্য তৈরী করা যায়। সেই ভালবাসাই প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমাদের। মানুষ স্বাধীনতার ভিখারী। **সমাজনিরপেক্ষ স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা মানে আনন্দ।** (৪) কারো অপমান সহ্য করতে কেউ চায় না। **তাই সামান্য নিকৃষ্ট প্রাণীটিকেও অপমান করা উচিৎ নয়** বরং তাদেরকে আনন্দে স্বাধীনভাবে থাকতে দিন। মানবাত্মার শাশ্বত সঙ্গীত স্বাধীনতা। Freedom is the song of soul.

সব মানুষের যুক্তি ও মতামতকে আমাদের গ্রহণ ও বিবেচনা করা উচিত। সে যত ক্ষুদ্র-অসহায়-দুর্বল বিদ্যাবুদ্ধিহীন মানুষ হোক— ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিয়ে তার বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে এই পৃথিবীতে। তার নিজস্ব ধ্যানধারণা নিয়ে নিজস্ব ঐতিহ্য নিয়ে জাতীয়তার সহজ সড়কপথ ধরে তার বড় হয়ে ওঠার অধিকার আছে। আপনি যদি শক্তিমান হন তাহলে তার সেই বেঁচে থাকার অধিকার দেবেন, তবে কোন কারণেই রাশ হাল্কা করবেন না। আবার যদি (৫) **কোনকারণে রাশ হাল্কা হয়ে যায় তাহলে রশি হাল্কা করবেন না।**

তবে এ সবার মূলে **আমাদেরকে হতে হবে আত্মবিশ্বাসী।** হীনমন্যতায় মৃতকল্প জাতির শিহরের পাশে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করতে হবে আত্মজাগরণের মন্ত্র। সমাজ-সংসারের প্রতিটি মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হবে। যাদের মধ্যে বিবেক চেতনা নেই— **যাদের মধ্যে অনুভূতি নেই তাদেরকে জাগাতে হবে।** তবে মাথায় তুলবেন

না তাদের। অনুভূতিহীন জীবন পশুর সমান। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে যদি অনুভূতিবোধ না থাকে তাহলে তাদের মানুষ নামের সার্থকতা কোথায়? বিবেক যদি মানুষের মধ্যে না আসে তাহলে সে জীবনের মূল্য কোথায়? আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য বা ধর্ম হোক বিবেক-চেতনা আর অনুভূতি। **জগতের যে যেখানে যেরকম সমাজ ব্যবস্থায় আছেন সেখান থেকেই এই উদ্দেশ্য পালন করতে হবে।**

বিবেক চেতনা আর অনুভূতি গুণ থাকলে যে চাষ করে সে ভাল চাষী হয়ে উঠবে— যে কেরানী সে আরো দক্ষ ও মনোযোগী হবে, যে শিক্ষক সে হয়ে উঠবে আরো কর্তব্যপরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ। সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে, আনন্দে অভীপ্সায় ঐসব মানুষদের দ্বারাই গড়ে উঠতে পারে আদর্শ সংসার বা আদর্শ সমাজ।

আমাদের উপনিষদগুলিও জীবনকে জাগাতে নির্দেশ দিয়ে গেছে। এগুলি সমস্ত জাতিকে—সকল সম্প্রদায়কে— সকল সংসারকে বিবেক-চেতনা নিয়ে কাজ করতে বলেছে। তবেই শান্তি বা আনন্দ আসবে। দৈহিক ও আধ্যাত্মিক আনন্দ-মুক্তি আর বিবেকানুভূতিই উপনিষদের মূলমন্ত্র।

সকলেই সমান— সকলেই এক ব্রহ্ম— একথা শুধু মুখে বললেই হবে না। এটাকে কাজে পরিণত করতে হবে। তাই মানুষকে পবিত্র থাকতে বলছি। বিবেকবান হতে বলছি। **বিবেকবান না হলে সংসার শয়তানের কারখানায় পরিণত হবে।** শুধু তাই নয় বিবেক আর পবিত্রতার মধ্য দিয়েই মানুষ আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন হয়ে উঠবে।

(৬) **নিজে বেশি কথা না বলে অপরের কথা শোনার আগ্রহী হোন।** তাতে সেই ব্যক্তি আপনাকে ভালবাসবে।

(৭) **আপনার ওপরওয়ালা কোন কারণে যদি ভুল বা অন্যায় কথা বলে ফেলেন তাহলে আপনি সরাসরি প্রতিবাদ করবেন না।** তাকে এমনভাবে মিষ্টিসুরে ঘুরিয়ে কথা বলুন যাতে তিনি আপনার উপর ক্ষিপ্ত না হন। কারণ তিনি আপনার বশ। আপনার ভালমন্দ অনেকটাই তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আপনার জীবনের বিকাশ— জব্ স্যাটিসফেক্সন তার উপর নির্ভর করে।

(৮) **গোষ্ঠীসংগ্রামে ভিন্ন মতাবলম্বী হলেও শ্রেণিসংগ্রামে একমত থাকবেন।** নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হলে তা সহজে মিটিয়ে নেওয়া যাবে। সেই দ্বন্দ্ব তখন আর সারাদেশে বিকাশপ্রাপ্ত হবে না। তাতে ক্ষতিও কম হবে কিন্তু মানুষ যদি নিজেদের শ্রেণি কিংবা জাতির সাথে একমত না হয়ে কোন্দল সৃষ্টি করে তাতে তারা নিজেদের ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারবে না। ধ্বংস তাদের অনিবার্য। **মনের**

মিল না হতে পারে কিন্তু কারো সাথে মতের যেন গরমিল না হয়। আমরা হিন্দু অথবা মুসলিম— এই বোধ না রেখে আমাদের উন্নতির জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। কোন দলের ভেতরে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে, বাইরে তা প্রকাশ করা চলবে না। তাহলে অন্য পার্টির কাছে হেয় হবেন। নিজের পার্টি বা জাতিকে একতাবদ্ধ করে টিকিয়ে রাখতে পারবেন না।

(৯) **কোন ব্যক্তিকে উপযাচক হয়ে জ্ঞান দেবেন না।** কারণ যাচলে সোনাও রাঙে পরিণত হয়। উপযাচক হয়ে কাউকে কোনকিছু দান করলে তার কোন গুরুত্ব থাকে না।

(১০) **আপনি কাউকে যদি কোনকিছু দান করতে চান তা গোপনে দেবেন না।** জনসমক্ষে সবাইকে অবগত করে দেবেন। তাতে সবাই আপনাকে চিনবে। সমাজে আপনার ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

(১১) **শুধু হাত নয়, পা মাথা চোখ সবাই আপনার দানের কথা যেন জানতে পারে।** অর্থাৎ আপনার পাশাপাশি সামান্য মানুষটিও যেন আপনার সহৃদয়তার কথা জানতে কিংবা অনুভব করতে পারে। তাতে আপনি প্রতিবেশী কিংবা দেশবাসীর কাছে মর্যাদা পাবেন। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের কথা— গোপনে দান করবেন— এ আদর্শ এযুগে কার্যকরী নয়। আজকের দিনের অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞ। আগেকার দিনে নিয়ম ছিল— ডান হাতে যা করবেন বাম হাত তা যেন জানতে না পারে। এযুগে এ নিয়ম চলবে না। What you are doing with your left hand, the right hand can not be cognised. (বাইবেল)। Without propaganda you can not sustain your social image. প্রচার ছাড়া সমাজে আপনার ভাবমূর্তি প্রকাশ পাবে না। সর্বদা মনে রাখতে হবে সামাজিক বাস্তবতা বা স্বীকৃতি গণতান্ত্রিক। Social reality is also democratic.

(১২) সামাজিক ব্যাপারে আবেগপ্রবণ না হওয়াই ভাল। তাতে আপনার ব্যক্তিত্ব বা ভারত্ব নষ্ট হতে পারে।

(১৩) সামাজিক সমস্যার সঙ্গে নিজেকে জড়াবেন না। তাতে মন ফ্রি থাকবে। সর্বদাই জানবেন, সমাজের জন্য আপনি নন। আপনাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সমাজ। তাছাড়া সমাজকে আপনি কোনমতেই সোজা করতে পারবেন না। এটা কুকুরের লেজের মতো বাঁকা।

☛ **Modern society is to a great extent. It is controlled by political force. Therefore you can not be a social figure if you are against the dominating political force to the society concern. If you differ from the political idology of the dominating political party of the society**

you should not be actively and publicity against the idology or party.
আধুনিক সমাজ রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা অনেকটা পরিমাণে প্রভাবিত। কাজেই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তির বিরোধিতা করে আপনি কখনো সামাজিক সত্ত্বা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন না। যদি আদর্শগত তফাৎ থাকে তাহলে সক্রিয়ভাবে এবং প্রকাশ্যে বিরোধিতা করবেন না।

The old maxim was that first we are social then we are political. But now the maxim has reversed. First we are political then we are social. এযুগে কোন ব্যক্তি কিছুটা (partially) রাজনৈতিক না হয়ে সামাজিক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব হতে পারে না।

To survive so permanently in a society as a social person a man must have multipersonality. সামাজিক মানুষ হিসাবে একজন ব্যক্তির বহুমুখী ব্যক্তিত্ব থাকা দরকার।

> Always abandon superiority complex and inferiority complex. These complexities actually are the mother of social conflicts.
>
> You can not be social isolatedly. (একা একা) To be social is to be associative মনের মধ্যে association ঠিক করুন।

আমাদের সব আছে— অভাব শুধু অন্তরের

Life is not a bed of roses. It is struggle for existance. জীবনটা সুখের আরামশয্যা নয়— সংগ্রামে ভর্তি। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছে ঈর্ষা-হিংসা-শঠতা আর দরিদ্রতার কন্টক। সেই কন্টক মাড়িয়ে-গুঁড়িয়ে আমাদের পথ চলতে হয়। তাতে পা হয় ক্ষতবিক্ষত। আমাদের সমাজ-সংসারে দারিদ্র্য আছে, আছে নীতিহীনতা আর আছে শাসন-শোষণ আর পীড়ন। যুগ যুগ ধরে নানাভাবে শোষিত ও অবহেলিত হচ্ছে মানুষ— অবহেলিত হচ্ছে জীবনের সত্ত্বা। তবু আমরা সবাই জীবনকে কাছে পাওয়ার লোভে ছুটে চলেছি জীবনের অন্বেষণে। অপমানিত হয়েও নিজেকে আমরা ঠিকমত গড়ে তুলতে পারিনি। আজ জীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণার অভাব বলে জীবনকে শ্রদ্ধা করতে শিখিনি। আমরা স্বার্থহীনতা শিখতে পারিনি। **শুধু শিখেছি কিভাবে অপরকে ঠকাব, অপরকে কিভাবে হেয় করে নিজের সম্মান প্রতিষ্ঠা করব, অপরের কিভাবে ক্ষতি করব, নিজে কিভাবে বড় হব, আপন ছেলে আর স্ত্রীকে নিয়ে কিভাবে সুখে বসবাস করব।** আজ আমরা শিখেছি ভাইকে পর করতে— নিজের স্ত্রী ছাড়া আর সবাইকে পর ভাবতে।

শিখেছি আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে— ছোট-বড়, লঘু-গুরু, গণ্যমান্যদের না মেনে চলতে— শিখেছি মিডিয়া পলিসি আর শিখেছি বাবা-মাকে-বেকার দাদা-ভাই বা গৃহ পরিজনকে চাকর-চাকরাণী বানাতে। আমরা পরের বেদনায় ও দুঃখে নকল কান্না কেঁদে মনে মনে তৃপ্তি পাচ্ছি— শিখেছি ছলে-বলে-কৌশলে পরকে কাঁদাতে— পরকে পীড়ন করতে, আমরা পরের সুখে সুখী না হয়ে শিখেছি তাকে ঈর্ষা করতে। আজ ঘরে ঘরে দেখছি, শ্বশুর ও স্বামী নিজের জামা কাপড় পরিষ্কার করছে, শাশুড়ী রান্না করছে, বৌমা টিভি দেখছে। আজকালকার নব্য যুবক যুবতীরা সর্বদা নিজের নিয়ে ব্যস্ত। নিজেকে ছাড়া আর কোন কিছু বোঝে না।

এর কারণ আমাদের জীবন সম্পর্কে ধারণার অভাব, একটা আদর্শের অভাব, একটা লক্ষ্যের অভাব— আর অভাব **জীবনকে ঠিকমত গড়ে তোলার**, তাকে পথ দেখিয়ে **নিয়ে চলার লোকের অভাব। অভাব নেতৃত্বের, অভাব পথপ্রদর্শক যুগ ভগীরথের— অভাব অন্তরের।** এই অভাবগুলির জন্য আমাদের মধ্যে সহানুভূতি জাগেনি। এই অভাববোধের অভাবে মানুষ আজ হতে পারেনি মহিমময়, মানুষ হতে পারেনি আদর্শবান। এছাড়া আরো পঞ্চবিধ অভাব রয়েছে যেগুলি মানুষকে মহান করার পথে বাধাস্বরূপ।

(১) **চেতনার অভাব**— আজকাল মানুষেরা জীবনীমূলক বই পড়ছে না। সর্বদা টিভি, খেলাধূলা আর আড্ডা নিয়ে ব্যস্ত। তাই তারা চেতনা লাভ করতে পারছে না।

(২) **বিনয় নম্রতার অভাব**— সরকারী সাম্যবাদ বা আমরা সবাই সমান, ছোট বড় কেউ নই— এই নীতি মানুষকে নামিয়েছে অহমিকার বিষাক্ত পঙ্কে। আজকাল পাড়ায় মোড়ল বলে কেউ নেই। কেউ কাউকে তাই মানছে না। গুরুজনদের সুযুক্তি কেউ নিতে চায় না। বড়দের সামনে বাজে ভাষা প্রয়োগ করতেও ছোটরা আজ কুণ্ঠিত নয়। নিম্নশ্রেণির মানুষরা সাম্যবাদের কেতন উড়িয়ে উচ্চস্তরের মানুষের মাথায় চড়ে বসেছে। আজ হাতের পাঁচটা আঙুল সমান— বেঁটে-লম্বা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, পন্ডিত-মূর্খ— সব একাকার— তাই মানুষের দেহে-মনে, সমাজে-সংসারে দেখা দিয়েছে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, স্বার্থপরায়ণতা আর অহমিকার ভাব। ধূলিসাৎ হয়েছে বিনয়-নম্রতা। সংসারে-পাড়ায়-গ্রামেগঞ্জে প্রতিটি মানুষের আচার আচরণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে— যেন তারা সবাই রাজা। ট্রেনের কামরায় হকারদের রাজত্ব, প্লাটফর্মগুলি যেন ভিক্ষুকদের পৈতৃক সম্পত্তি— পথঘাট রিক্সাওয়ালা-ট্রলিওয়ালা আর গাড়ীওয়ালার নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠেছে। কাউকে কিছু বলার উপায় নেই। আর সংসার-সমাজেও

তেমনি। কাউকে চিনবার উপায় নেইকো মোটেই— কে মহারাণী— কে মন্থরা দাসী।

(৩) **একাগ্রতার অভাব—** কোন কাজে নেই একাগ্রতা। সংসারে সবাই একমুখী নয়। সমাজেও তদ্রূপ। সবই যেন কেমন নয়-ছয়। সবই দায় সারা। প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে বলুন আর সংসারে বলুন— সর্বত্র একই অবস্থা।

(৪) **স্বার্থহীনতার অভাব—** আজকের মানুষ এমনই আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয়ে উঠছে যে তারা নিজের দু'জন কিংবা তিনজন ছাড়া আর কাউকে বোঝে না। শুধু বলে ভবিষ্যৎ আছে। ভবিষ্যতের দিকে চেয়েই তারা স্বার্থপর হয়ে উঠছে। ফলে কেউ আর কারও কাছে আদর্শবান হতে পারছে না। সংসার-সমাজ-আত্মীয় স্বজন-পরিবার পরিজন পরস্পর কেউ কাউকে আন্তরিকভাবে ভালবাসছে না।

(৫) **সাহস ও দায়িত্বশীলতার অভাব—** মানুষ আজকাল বাবা-মা-ভাইবোন ও সমাজের মানুষের ভালমন্দ-সুখদুঃখের দায়িত্ব নিতে চাইছে না। সবাই যদি বলে পরের ঝামেলা নিয়ে কি লাভ, অযথা কেন পরের যন্ত্রণা ভোগ করতে যাবো— তাহলে মানুষ আদর্শপরায়ণ হবে কিভাবে? এতে সাহসও হারিয়ে ফেলছে। তবে এর মূলে কাজ করছে একটা জিনিস— সেটা ঠকবাজি আর প্রতারণা। পথে কোন বিপদগ্রস্ত মেয়েকে আপনি যদি বাঁচাতে যান— উলটে আপনাকেই বিপদে পড়তে হবে। মানুষ এমনই মানবতাহীন হয়ে গেছে।

> এক পকেটমার মেয়ে সাধারণ বেশে কেঁদে কেটে ভিক্ষে চাইছে নির্জন পথে একটি লোকের কাছে। লোকটি করুণাবশত তাকে টাকা দিতে উদ্যত হয়। এমন সময় সেই মেয়েটি চীৎকার করে বলে 'বাঁচাও— এই লোকটি আমাকে টাকার লোভ দেখিয়ে নিয়ে যেতে চায়।' অমনি আড়াল থেকে ছুটে আসে সেই মেয়েটির গুন্ডাবাহিনী। লোকটিকে উত্তমমধ্যম মার দিয়ে সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পরে পুলিশে দিল। পুলিশও তার পরিজনের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে তবে তাকে ছাড়ল। এজন্যেই মানুষ আজকাল কোন কাজে কাউকে সাহায্য করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে না।

(৬) **ন্যায়পথের পথপ্রদর্শকের অভাব—** একজন আদর্শবাদী সুপথের দিশারী দরকার— মানুষকে ন্যায়পথে চালিত করার জন্য। এরকম মানুষ পাওয়া যাচ্ছে না। স্বার্থ এমনিভাবে ঘাড়ে চেপে বসে রয়েছে।

এইসব অভাব থাকার জন্য সমাজ হয়ে উঠছে হৃদয়হীন। আজকের মা-বাবারা চান ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখবে-চাকরি করবে, বিলেত যাবে-আমেরিকা যাবে-

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবে। তারা কোয়ার্টারে বাস করে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। একটির বেশি দুটি সন্তান নয়। কারও কোন ঝামেলায় কেউ থাকবে না। যে যার সংসার বুঝে নিক— যে যার দায়িত্ব জেনে নিক। দরকার হলে বাবা-মা বৃদ্ধ সেবাশ্রমে যেতেও রাজী। হায়রে কলিকাল! প্রাচ্যের অলিতে গলিতে আজ পাশ্চাত্যের প্রভাব বাসা বেঁধেছে।

স্কুলের শিক্ষার মধ্যে নীতিশিক্ষা নেই। তাই কীভাবে আদর্শপরায়ণ হবে মানুষ? যদি বাড়ি থেকেও এই শিক্ষা না পায়— সমাজ থেকেও যদি কোন শিক্ষা না আসে তাহলে কী এভাবে তালেগোলে সমাজ চলতে থাকবে? জোড়াতালি দিয়ে এভাবে কদিন চলবে? মনুষ্যত্ব, স্বার্থহীনতা, মানুষকে মানুষ বলে শ্রদ্ধা করা— মানুষের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করা— সহানুভূতি দেখানো— এগুলো কোনদিন শিখবে না।

রাজনৈতিক দলগুলিও তাই বলছে— আমাদেরকে ভোট দাও— সোনার ভারত গড়ে দেবো। আমাদের হাতে ক্ষমতা দাও— তোমাদের কোন অভাব রাখব না।

কিন্তু ক্ষমতা পেয়ে সবাই ভুলে যায় প্রতিশ্রুতি। এর কারণ শিক্ষা, বোধ, জ্ঞান, সহানুভূতি তথা মনুষ্যত্বের অভাব। তাই আজ আমাদেরকে মনুষ্যত্বের সাধনা করতে হবে। মনুষ্যত্ব দিয়ে পৃথিবী জয় করা যায়। মনুষ্যত্বের ওপরে আর কিছুই নেই— কোন তত্ত্ব নেই— নেই কোন দর্শন।

এই মনুষ্যত্বই মানুষকে মহিমময় করতে পারে— অর্থসম্পদ পারে না। তাই আসুন, **আমরা সবাই মনুষ্যত্বের সাধনা করি।**

☛ চরিত্রগঠন জীবনের এক অন্যতম উদ্দেশ্য। **মানুষ পূজা পায় তার চরিত্রের জন্য**— বিদ্যা-বুদ্ধি বা শক্তি কিংবা অর্থের জন্য নয়।

আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত গাড়ী-বাড়ি আর ধন অর্জন নয়। মানুষ খ্যাতিলাভ করে তার শিক্ষাদীক্ষার জন্য নয়— কেবলমাত্র চরিত্রের জন্য। বিবেকানন্দ, ক্ষুদিরাম, শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধদেব, সুভাষ বসু, রামকৃষ্ণ ও ঈশ্বরচন্দ্র— ওরা কীসের জন্য খ্যাত হয়ে আছেন? কেবল চরিত্রের জন্য— ওদের হৃদয়ের দয়া-মায়া মমতা আর স্নেহের জন্য। ওদের একটা হৃদয় ছিল— একটা অন্তর ছিল, ওদের একটা উপলব্ধি ছিল— একটা অনুভূতির ক্ষমতা ছিল। নিজেরা অর্থবান হব বা বিরাট শিল্পপতি হব বা মন্ত্রী হব— এরকম চিন্তা ছিল না। কিসে জগতের মানুষ সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে— কিসে জগতের মঙ্গল হবে— এটাই ছিল ওদের জীবনের উদ্দেশ্য। আজকের অধিকাংশ মা-বাবারা চান তাদের ছেলে শিক্ষিত হয়ে

চাকরি করুক-গোছা গোছা টাকা এনে তাদেরকে দিক কিংবা স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন করুক— পাকাবাড়ী কেরুক। কিন্তু কোন মা-বাবার ইচ্ছে করেনি যে তাদের ছেলে দেশের কাজ করে তাদের গৌরব বৃদ্ধি করুক বা নিজেদের বংশের কিংবা গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করুক। সন্তান মানুষের মত মানুষ হয়ে অগণিত মানুষের মঙ্গল করুক— এ ক'জন মা-বাবা চান? হয়ত আপনারা বলবেন— দেশের কাজ করে কি সংসার চলবে? ঠিক কথা। কিন্তু চাকরি বাকরি কিংবা ব্যবসা বাণিজ্যের মাঝে মাঝে দেশের দিকে সামর্থ অনুসারে লক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে। এরকম লোকও তো আছেন— যারা আপন সংসার ধর্মকে ব্যাহত না করে দু'দিকই চালিয়ে যাচ্ছেন। আগে অন্নচিন্তা তারপর অন্যকিছু— একথা রামকৃষ্ণও বলে গেছেন। তাই কাজের অবসরে মানুষের কথা আমাদের ভাবা দরকার।

মানুষের সুখে-দুঃখে ও শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করা আমাদের কর্তব্য। অপরের কল্যাণ করতে গেলে নিজের একটু কষ্ট হয় বটে কিন্তু মনে শান্তি থাকে। পরকে সহযোগিতা করলে মন তৃপ্তিতে ভরে যায়। তাছাড়া সমাজের মানুষ আপনার গুণগানে মুখরিত হয়ে উঠবে। তাই পরার্থে প্রাজ্ঞমুৎসৃজেৎ— এটাই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়। দেখা গেছে কাকেও সাহায্য করতে গেলে লোকে ভাবে ওর দু'নম্বরী কিছু মালকড়ি ছিল তাই সাহায্য করছে। কাউকে সহানুভূতি দেখালে লোকে অনর্থক সন্দেহ করে।

তবুও মানুষকে ভালবাসতে হবে। স্নেহ মমতার অধিকারী হতে হবে। শুধু শক্তি-বিদ্যা আর অর্থ থাকলেই হবে না। শক্তিই যদি পূজা পাওয়ার যোগ্য হত তাহলে হাতীকে সবাই পূজা করত আর প্রাক্তন হেভিওয়েট বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বক্সার মাইক টাইসনকে ভক্তিভরে লোকে প্রণাম জানাত। **ম্যাক্সমুলার সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাসাগরের চেয়েও পন্ডিত ছিলেন তথাপি লোক বিদ্যাসাগরকেই পূজা করে।** টাটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা জামশেদজী টাটার অর্থের অভাব ছিল না। তবু কেউ তার জন্মদিন পালন করেনি। এযুগের বড় ধনী বিল গেট্‌সকে কেউ শ্রদ্ধা না জানিয়ে বরং নেলসন ম্যান্ডেলাকে স্মরণ করে। কর্নেগীর প্রচুর অর্থ ছিল (ডিনামাইটের ব্যবসাদার) তথাপি তাকে কেউ শ্রদ্ধা জানায়নি। চাঁদ কাজীর প্রচুর অর্থসম্পদ ছিল কিন্তু তার পাশাপাশি প্রেমাবতার গৌরাঙ্গকেই সবাই ভালবাসত। অতএব বুদ্ধি-বিদ্যা-ধন-অর্থ আর শক্তির জন্য কেউ পূজা পায় না, পূজা পায় তার বিবেক-চেতনা আর মানবিকতার জন্য। বুদ্ধিই যদি সব হত তাহলে কম্পিউটারকেই সবাই পূজা করত— তার গলায় মালা দিত রূপসী কন্যারা।

এছাড়া মানুষের উচিত নিজের জীবনটাকে গড়ে তোলা। জীবন গড়া মানে চরিত্র গড়া, আধ্যাত্মিকতা লাভ করা। এগুলি হচ্ছে জীবনের সম্পদ। এই সম্পদ—অন্য মানুষের জীবনের বিকাশের জন্য ব্যয় করতে হয়।

মানুষের জীবনের বিকাশ তিনভাবে সাধন করা যেতে পারে। দুঃস্থ ভিক্ষুককে, অভাবী লোককে অন্ন দিয়ে তার বাঁচা বাড়ার পথ করে দেওয়া যায়। এই অন্নদান কিন্তু নিতান্ত ছোট। এর চেয়ে বড় হচ্ছে বিদ্যাদান। বিদ্যাদানের দ্বারা তাকে এমন একটা কিছু শিখিয়ে দেওয়া যেতে পারে যাতে সে নিজের ব্যবসাটা নিজে করে নিতে পারে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, এর পরেও একটা দান আছে সেটা জ্ঞানদান। যদি মানুষকে জ্ঞান দেওয়া যায়— সত্যিকারের জ্ঞান— যাতে তার ঠিক দৃষ্টিটা খুলে যায়, স্বচ্ছ দৃষ্টি লাভ হয়— যাতে সে বিবেকবান হয়। তাহলে সে সত্যকারের মানুষ হবে। অন্নদান করতে করতে মানুষ একদিন নিঃস্ব হতে পারে কিন্তু বিদ্যা বা জ্ঞানদান করতে গিয়ে সে নিঃস্ব হবে না। বিদ্যা ও জ্ঞান **'ব্যায়াতি বৃদ্ধিম্ আয়াতি ক্ষয়ম্ আয়াতি সঞ্চয়াৎ'**— দান করলেই বাড়ে আর সঞ্চয় করলেই ক্ষয়গ্রস্ত হয়।

☛ আমরা মহতের ভাব অভ্যাস করতে পারি না— কারণ আমাদের চরিত্রগত ছোট ছোট ভুল ত্রুটি রয়েছে

আমাদের মধ্যে মহান ভাবের অভাব। সেজন্যে আমাদেরকে ধীর স্থির হয়ে অভ্যাসের মধ্য দিয়ে মহৎ ব্যক্তিদের ভাবগুলোকে চরিত্রগত করতে হবে, তবে প্রথমেই মহতের প্রতি ভালবাসা আনতে হবে। ভালবাসা ও ভাললাগা দিয়ে সেই ভাবের দিকে মন দিলে ঠিক সেগুলো আয়ত্বে এসে যাবে। মহতের ভাব আয়ত্ব করার আরো কয়েকটি উপাদান আছে। সেগুলি হচ্ছে সরলতা, একাগ্রতা আর মানবিকতা। সেই সঙ্গে বোধজ্ঞান। ধর্মের প্রতি ভয় থাকলেই বোধজ্ঞান এসে পড়বে। শোনার আগ্রহ থাকলেই একাগ্রতা আসবে আর মনকে সরল করলেই বোধজ্ঞান জন্মাবে। এগুলো আগে ঠিক করুন। তারপর ধীর স্থির হওয়ার অভ্যাস করুন। আচারে-ব্যবহারে-অনুষ্ঠানে সেগুলিকে ফুটিয়ে তুলুন। তবে স্বার্থপর হলে আমাদের সেই ভাবের অভাব দূর হবে না। অপূর্ণই রয়ে যাবে। যে স্বার্থপর তার মধ্যে মহতের ভাব আসবে না। এজন্যেই বিবেকানন্দ, গান্ধিজী আর হরিশচন্দ্রকে আজকাল পাওয়া যাচ্ছে না। তবে যে একেবারে নেই তা নয়— খুবই বিরল। আজকের এই শঠতা, ধাপ্পাবাজী ও খলতার জনারণ্য থেকে তারা একটু আড়ালে আত্মগোপন করে আছেন। এবার সাধারণ একটা উদাহরণ দিই শুনুন।

অভিষেকবাবু চাকরী বাকরী করেন। সংসারে ছেলেপুলে নেই। তাই পাশের একটি মা হারা ছেলেকে লেখাপড়া শেখালেন। তাকে ভালবেসে প্রচুর অর্থ সাহায্য করলেন। কিন্তু ছেলেটি অভিষেকবাবুর চরিত্রগত ভাবকে কোন প্রকারে আয়ত্ব করতে পারছে না। ছেলেটি হয়ত ভাবছে যে অভিষেকবাবুর ভাব চরিত্রগত করলে তার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা দেখানো ও চেতনা বোধের ভাব আসবে। তাতে সে নিজেকে ফ্রি রাখতে পারবে না। সর্বদা একটা কৃতজ্ঞতা দেখানোর চিন্তা তাকে কুরে কুরে খাবে। তাই সে ইচ্ছে করেই অভিষেকবাবুর চরিত্রগত ভাবকে আয়ত্ব করতে চাইছে না।

যাই হোক যদি কেউ মহতের ভাব অভ্যাস করতে চান তাহলে দয়া করে পড়ুন— (১) ভাল-মন্দ, ধর্ম-অধর্ম, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। (২) কৃতজ্ঞতা বলে যে একটা শব্দ আছে তার অর্থ বুঝতে হবে। (৩) মহৎ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকা দরকার। (৪) ভালবাসার কথা শুনতে হবে। (৫) মহাজন যেন গত স ইব পন্থা— এই নীতি অনুসরণ করতে হবে। (৬) আপন উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়কে মহৎ করতে হবে।

আইনের চেয়ে মনুষ্যত্ব-বিবেক-চেতনা অনেক বড়। যারা মানুষের যথার্থ কল্যাণের চেয়ে তত্ত্ব বা আইনকে বড় করে দেখে তারা মোটেই প্রগতিশীল নয়। আদর্শ বা আইন বড় নয়, সাধারণ মানুষের কিসে বেশি ভাল হবে— সেটা বড়। সর্বতোপ্রকারে মানুষের ভাল করাই শ্রেষ্ঠ কাজ। তা দেখাতে গেলে চাই খোলা মন, স্বচ্ছ দৃষ্টি, উদার ভাব, স্বার্থবুদ্ধিহীনতা ও মানুষের প্রতি সহানুভূতি। একপেশে গন্ডীটানা মন নিয়ে এই বিচার করা যায় না।

☛ একজন লোক কেমন করে খাঁটি মানুষ হতে পারে?

মানুষ হওয়ার জন্য চাই মনুষ্যত্ব। দু'তিনবার এম. এ, বি. এ পাশ করে বড় বড় লেকচার দিলেই মানুষ হওয়া যায় না। মুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা আর দামী দামী স্যুট-কোট-টাই দিয়ে শরীর মলাট করলে মানুষ হওয়া যায় না। অর্থের পাহাড় জমালেই সে মানুষ নয়। আজকাল কিন্তু সমাজে দেখতে পাচ্ছি— যিনি গালভরা বুলি কিংবা বড় বড় লম্বা চওড়া কথা বলেন— তিনিই মানুষ, যিনি জনগণের কাছে গাম্ভীর্য বজায় রেখে সংসারকে ফাঁকি দিয়ে ফ্লাট ভাড়া করে বউকে নিয়ে দূরে থাকেন তিনিই মানুষ, যিনি অপরকে প্রতারিত করে বড় হতে পেরেছেন তিনিই মানুষ, যিনি ভাইয়ের রক্তে রঙিন প্রাসাদ বানাতে পেরেছেন, যিনি টাকা ধার নিয়ে ফেরৎ দেওয়ার সময় উলটে মহাজনকে চোখ রাঙাচ্ছেন, যিনি ভন্ডামি ধড়িবাজি করতে পারছেন, যিনি সরকারের টাকা যত মারতে পেরেছেন তিনিই মানুষ।

সবশেষে যিনি অপরকে পশুর মত হেয় করেন এবং নিজেকে বড় বলে অহংকার করেন— তিনিই মানুষ।

কিন্তু এরা সত্যিকারের মানুষ নন। এরা মনুষ্যত্বহীন পশুত্বের কঙ্কাল মাত্র। যার মনুষ্যত্ব আছে— যার মধ্যে চেতনা আছে— যার মধ্যে বিবেক রয়েছে— বিচার-বিবেচনা শক্তি রয়েছে— তিনিই মানুষ। যার অন্তরে আছে মনুষ্যত্ব আর বিবেক চেতনার রূপ অনন্তসম্পদ তিনিই মানুষ। **যিনি সকলকে আপনার মত ভাবতে পারেন— যার মধ্যে পরশ্রীকাতরতা নেই— তিনিই মানুষ।** তাবলে গরু-গাধা-কুকুর-ছাগলকে আপনজন ভেবে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে করুণা দেখাতে বলছি না। তাতে বিপদ আছে। আসলে মনুষ্যত্ব যার মধ্যে থাকবে— তিনিই মানুষ। মনুষ্যত্ব পৃথিবী জয় করতে পারে। হয়ত মনুষ্যত্বপরায়ণ লোকেরা সর্বদা দুঃখ ব্যথা ভোগ করে থাকেন কিন্তু পরিণামে মানুষের সহানুভূতি ও আশীর্বাদ পেয়ে থাকেন। মানুষের ভেতরের সত্ত্বাকে প্রকাশ করতে পারে মনুষ্যত্ব। এছাড়া অন্য দর্শন আর নেই। মনুষ্যত্বের কাছে কোন তত্ত্ব আর কোন আইন কাজ করে না। মনুষ্যত্ব সবার ওপরে।

যারা সত্যিকারের মানুষ তাদের মানবতা বোধ আছে, তাদের জীবন আছে; জীবনের মান বা মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা বা হুঁশ আছে। যাদের অনুভূতি আছে— বিচার করার ক্ষমতা আছে, যাদের চিন্তায়-কথায় আর কাজে সম্পূর্ণ মিল আছে, যারা শুধু নিজেদের সুখ ও স্বার্থের ভাবনাই ভাবেন না, যারা সকলকে ভালবাসেন এবং সকলের মঙ্গলের জন্য চিন্তা ও কাজ করেন তারাই যথার্থ মানুষ। তারা সাময়িক দুঃখে পড়লে ঈশ্বর তাদের সহায়তা করেন। কেউ তাদের ঠকালে ঈশ্বর মানুষের রূপে এগিয়ে আসেন তাকে সহায়তা করতে। এটা আমি নিজের জীবনে দেখেছি। আপনারা এটা অবশ্যই বিশ্বাস করবেন।

☞ আমরা মানুষ হতে বাধা পাচ্ছি কেন?

আমরা লোভী, আত্মসুখসর্বস্ব, দুর্নীতিগ্রস্ত, দেহসর্বস্ব ও পরশ্রীকাতর। অপরের ভালমন্দ দেখতে পারিনা। নিজেকে সবচেয়ে বড় বলে মনে করি। আমরা নিজের অন্তর দিয়ে পরের কথা যদি একটু উপলব্ধি করি— কিংবা সবাই যে একস্থান থেকে এসেছি আবার এক জায়গায় যাবো— এটা যদি ভাবতে পারি তাহলে হয়ত মানুষ হতে পারব। অহংকারের কী মূল্য আছে বলুনতো। তাবলে আমি কাউকে একেবারে বিনয়ের অবতার হতে বলছি না— তাহলে কেউ আপনাকে মানবে না। শুধু বলছি যে বিচার-বিবেচনা আর অনুভূতি দিয়ে কাজ করতে। বর্তমানের, অতীতের দিনগুলির দিকে চোখ দিন— তারপর আজকের কথা ভাবুন। কাউকে

ঠকাতে যাবেন না— কারো সাথে বেইমানী করবেন না। নিজের ধর্ম বজায় রাখুন। একজনের কাছ থেকে উপকার পেয়ে তাকে ভুলে না গিয়ে তার কথা স্মরণ করুন, তাকে আনন্দ দিন— তাহলে জীবনে বড় মানুষ হতে পারা যাবে বলে আমি মনে করি। কিন্তু আমরা অধিকাংশ মানুষ এসব করতে পারছি না বলেই নরাধম। আসলে আমাদের মধ্যে বোধজ্ঞানের অভাব।

☞ আমাদের মধ্যে বোধজ্ঞানের অভাব কেন?

আজ আমরা এমনই ব্যস্ততার যুগে এসে পড়েছি যে বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ আর বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়তে অবকাশ পাচ্ছি না। যেটুকু অবকাশ পাচ্ছি তাতে টিভি ও সিডি ক্যাসেট আমাদের জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বিজ্ঞানের কয়েকটা জিনিস আমাদের বোধজ্ঞানকে হত্যা করছে নিত্য-নিয়ত। আপনারাই বলুন রূপসী অর্দ্ধউলঙ্গ অষ্টাদশীর নৃত্যগীত ছেড়ে কে পাশে বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনবে? ইচ্ছে করবে কী? মোটেই না। একপাশে অ্যাডাল্ট বই ভিডিওতে দেখানো হচ্ছে আর একপাশে ভাগবত পাঠ হচ্ছে। কোনদিকে লোক বেশি ছুটবে? নিশ্চয়ই ভাগবত পাঠের দিকে নয়। আসলে ভিডিও আর ইংলিশ ছবি আমাদের মাথায় ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া আধুনিক কতকগুলি গানও আমাদের চিন্তাধারাকে বিনষ্ট করছে। কোন ভাল বই পড়ার সময়— মাইকের গান ভেসে এল 'তোমার দেখা নাইরে তোমার দেখা নাই'। মন কি বইয়ের পাতায় সন্নিবিষ্ট হবে? চোখটাই থাকবে। মন চলে যাবে একেবারে কিনু গোয়ালার গলিতে পদুখুড়োর ষোড়শী কুমারীর মুখের সামনে। ঐসব ছবি-গান আমাদের চিন্তাশক্তিকে সর্বদা বিনষ্ট করছে— বিবেককে অন্যমনস্ক করছে।

এরপর আমরা এমনই আত্মসুখসর্বস্ব হয়ে উঠছি যে আমি আর সে ছাড়া পৃথিবীর কাউকে বুঝতে চেষ্টা করি না। দু'জনে খাবো— দু'জনে ফ্রিভাবে থাকব— কারো কোন ফরমাজ শুনবো না। এই আত্মসুখই বোধজ্ঞান নষ্ট করে দিচ্ছে। অপরিমিত লোভলালসা মিডিয়া পলিসি বোধজ্ঞান সৃষ্টির অন্তরায়। তাছাড়া মানুষের অভাব অভিযোগ নিত্যসঙ্গী হওয়ার জন্য বোধজ্ঞান আর আসছে না। দোষ দেবো কাকে! সবই যেন প্রকৃতিদত্ত।

☞ কোন গুণ থাকলে মানুষ অমানুষ হতে পারে না?

মনে হয় আত্মবিশ্বাস বেশি থাকলে মানুষ অমানুষ হতে পারে না। কারণ আত্মবিশ্বাসী কোনদিন জ্ঞান ও বোধ নষ্ট করতে পারে না। জ্ঞান ও বোধ না থাকলে আত্মবিশ্বাস আসতেই পারে না।

বিবেকানন্দ বলেছেন— ছোট নৌকা বেশি ঢেউ বা বাতাস সহ্য করতে পারে

না। তবে যদি শক্ত মাঝি কিংবা হাল শক্ত থাকে তাহলে সেই মাঝি ঢেউ কাটিয়ে যেতে পারে। সেইরকম নিজের মধ্যে যদি দৃঢ়বিশ্বাস থাকে তাহলে কুসংসর্গ, ব্লুফিল্মের হাতছানি, কল্কি অবতারদের ভেল্কিবাজি, মদ-নেশা-গাঁজা-চরস, ভিডিওর উলঙ্গ নৃত্যের প্রলোভন, ড্যান্স হাঙ্গামা কারো বোধজ্ঞান নষ্ট করতে পারবে না। আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় হলে খারাপ সংসর্গ ভালোতে পরিণত হয়। আত্মবিশ্বাসীরা পরিবারবর্গকে সুনজরে দেখেন। তারা ধর্মে ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী হন। মহানুভবতায় তাদের হৃদয় ভরে যায়। তারা কোনদিন অমানুষ হতে পারে না।

☞ **আমরা কেমন ধরণের মানুষ তা শুনুন। তবে অধিকাংশ মানুষের কথা বলছি।**

আমাদের এখানে গগন ধাড়া নামে এক ব্যক্তি খাসি কাটত প্রতি শনি রবি ও মঙ্গলবার সন্ধ্যার পূর্বে। একবেলায় ৭/৮ খানা খাসির ধড় নামাত। সে প্রায় দিন একই লাইনে খাসি বেঁধে রেখে একের পর এক কাটত আর বিক্রি করত। প্রথম খাসিটাকে কাটার সময় দ্বিতীয় খাসি ভাবত— যাক বাবা, আমাকে আগে কাটেনি যে সেই ভাল। তিন নম্বর খাসি চার নম্বর খাসিরা সব তখন আরামে রোমন্থন করছে। আবার যখন সেই লাইনের দু'তিন নম্বর খাসি বাদ দিয়ে চার নম্বরটি কাটত তখন দু'তিন নম্বর খাসি ভাবত— আমরা আজকের মতো বেঁচে গেলাম। আমরা খুবই ভাগ্যবান। তারা ভেবে দেখেনি যে আজ কাটা না হলেও তাদেরকে কাল অবশ্যই কাটা হবে।

আমরাও ঠিক সেই ধরণের মানুষ। পাশের বাড়িতে ডাকাত পড়লে নিজদিগকে ভাগ্যবান মনে করি। অপরের সর্বনাশ দেখলে আনন্দিত হই। পাশের মানুষের দুঃখ-ব্যথা আর মরণ দেখলে আহ্লাদিত হই। এমনই অবুঝ ও আত্মকেন্দ্রিক আমরা; এমনই বিকৃত চরিত্রের মানুষ আমরা।

আর একটি উদাহরণ দিই। বাসে ভর্তি লোক বসে আছি যে যার গাম্ভীর্য নিয়ে। হঠাৎ করে একটামাত্র গুন্ডা এসে একটি লোককে ছোরা দেখিয়ে তার পকেট থেকে ৫ হাজার টাকা জোরপূর্বক নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমরা কিন্তু সবাই মিলে রুখে দাঁড়ালে সেই গুন্ডা ধরা পড়ত কিংবা ছিনতাই করতে পারত না। তা করলাম না। ভাবছিলাম— পরের ঝামেলায় যাবো না। আপনি বাঁচলে বাপের নাম, কিন্তু আমারও যে একদিন এরকম ছিনতাই হবে না তা কে বলল? তখনও কেউ আমাকে সাহায্য করবে না। আমরা এমনই ভীরু, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক মানুষ।

☞ **সবকিছু ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিয়ে আন্তরিকতার সহিত কাজ করুন।** তাহলে সাময়িক বিপদে পড়লেও সত্বর বিপদ কেটে যাবে। কীভাবে যে পরিত্রাণ পাবেন— তা ভেবে উঠতে পারবেন না।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন— ভগবানকে ডাকলে তিনি সশরীরে এসে আমাদের জন্য কোনকিছু করে দেবেন না। কিন্তু তাঁকে স্মরণ করলে আমাদের মধ্যেকার চেতনা শক্তি জেগে উঠে। তারই ফলে বলীয়ান হয়ে আমরা সমস্ত কঠিন কাজ করে ফেলি। তেমনি বার্ধক্য দশায় সুস্থ ও নিজেকে ঈশ্বরমুখী রাখতে আজ থেকে জীবনকে ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিন। প্রতি কাজে কর্মে তাঁকে স্মরণ করুন। সব সম্ভব হবে। আমাদের ভাগ্য আমাদের হাতের রেখায় নয়, আমাদের হাতের মুঠোয়। আমরা আমাদের কর্মশক্তি দিয়ে নিজেদের ভাগ্য তৈরী করব। তাতে যদি দৈবীশক্তি সহযোগিতা করে সেটাতো মহাভাগ্য— সেটা অতিরিক্ত লাভ। জীবনের সবকিছু দৈবের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে দুঃখ পেতে হবে। পুরুষকার অবলম্বন করুন। আপনি সৎ-ধার্মিক হয়ে সবসময় শুয়ে-বসে থাকলে কেউ আপনাকে আহার্য এনে দেবে না। বিরাট ডিগ্রিলাভ করলেও কেউ আপনাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে চাকরিতে বসিয়ে দেবে না। বিরাট উপকারী ব্যক্তি হলেও কেউ আপনার কাছে এসে সহানুভূতি বা কৃতজ্ঞতা জানাবে না। যে কোন বয়সই হোক না কেন, আপনাকে কমবেশি কাজে এগিয়ে যেতে হবে। আপনি ভক্তিপরায়ণ সৎ বলে করুণাবশতঃ ভগবান নেমে আসবেন না। সব কিছুর জন্য যতদূর সম্ভব চাঞ্চল্য প্রকাশ করতে হবে।

দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে দৈবশক্তি অনন্ত বলে তাকে প্রবলতর বলা হয়। তবে পুরুষকারকে ইচ্ছার দ্বারা বাড়ানো যায়। রামকৃষ্ণদেব বলতেন— তাঁর ইচ্ছা না হলে গাছের পাতাটিও নড়ে না। স্বামীজী বলতেন কোন কাজে এগিয়ে যাওয়াই মানুষের উদ্দেশ্য। দৈবকে ধরে বসে থাকার জন্য মানুষের জন্ম নয়। রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন— কৃপাবাতাস বইছে, পাল তুলে দে। কৃপাবাতাস হল দৈব বা ভগবৎ কৃপা— আর পাল তুলে দেওয়াটা পুরুষকার। গরুকে দড়ি দিয়ে খোঁটায় বাঁধা আছে। দড়ি যত বড় সে তার বাইরে যেতে পারে না। এটা দৈব বাধা। কিন্তু দড়িটা যতদূর ঘোরে তার মধ্যে যেখানে ইচ্ছে গিয়ে গরু ঘাস খেতে পারে। এটা তার পুরুষকার। সে যদি দৈব-দড়িতে বাঁধা বলে বসে থাকে, সারাদিন উপবাস যাবে। আবার তেজ থাকলে গরু দড়ি ছিঁড়েও ফেলতে পারে— স্বাধীনভাবে চরবার জন্যে। তেজী সাধক তাই বসে থাকে না। শাস্ত্রে আছে—

উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যানি ন মনরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।।

শুধুমাত্র মনের ইচ্ছা থাকলে কার্যসিদ্ধ হয় না— চাই উদ্যম। সিংহ ঘুমিয়ে থাকলে মৃগ এসে কিন্তু মুখে ঢোকে না।

স্বামীজী বলেছেন— মানুষই তার ভাগ্যের নির্মাতা। '**নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী।**' সিংহ যেমন পিঞ্জর ভেঙে বেরিয়ে আসে, পুরুষকারের দ্বারা তেমনি জগৎরূপ জাল থেকে বেরুতে হবে। স্বামীজী বলেছিলেন— আমার বয়স

যত হচ্ছে, আমি তত বুঝতে পারছি, সবকিছু নির্ভর করে পৌরুষের উপর। এটাই আমার নতুন বার্তা।

কেউ কেউ বলেন— 'আমি ভগবানে আত্মসমর্পণ করেছি। তিনি যা করেন আমি তা সহ্য করে যাবো। আমার আর কিছু করার নেই।'

কিন্তু আত্মসমর্পণ এত সহজ নয়। খুবই কঠিন ব্যাপার। প্রাণপণ চেষ্টা ছাড়া তা হয় না।

☞ **মানুষকে এমন জ্ঞান দিন যে জ্ঞান পেলে গ্রহীতা আত্মবিশ্বাসী হতে পারে।** শুধু তাই নয় জ্ঞানের দ্বারা মানুষের হৃদয়ে শক্তি জাগতে পারে। মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের সমস্যা নিজেই মেটাতে পারে। বেকারদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভের জন্য জ্ঞান দিন, বোকাকে চালাক হওয়ার জ্ঞান দিন, সরল বিদ্বানকে বুদ্ধিমান হতে বলুন বা দোকানদার-ব্যবসাদারকে— এমন কি সাধারণ মানুষকে এমন ভাবে জ্ঞান দেওয়া দরকার— এমনভাবে বোঝানো দরকার— যারা আপন দেহশক্তি, বুদ্ধিশক্তি ও বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে জীবনধারণের উপযোগী অন্নবস্ত্রের চাহিদা নিজেই সংগ্রহ করতে পারে। এছাড়া আমাদের প্রত্যেকের এমন একটা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করা দরকার যেটা আমাদের অন্তরের শক্তিকে জাগানোর কৌশল আয়ত্ব করতে শেখায়। এই সব জ্ঞান দেওয়ার উপযুক্ত ভিত্তি হল আন্তরিকতা। আন্তরিকতা বজায় রাখা জীবনের এক অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু আপনজনের মধ্যেও আজ আমাদের আন্তরিকতার বড় অভাব— দুর্দিন। তাই আমি সবাইকে কথায় ও কাজে আন্তরিক হতে সহস্রবার অনুরোধ করছি।

☞ **দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।** এতে চিত্তের কাঠিন্যতা গলে যায়। মানুষ সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠে। প্রতিবেশিরা ঐ সিদ্ধ পুরুষকে ঈর্ষা করে না— বরং সহানুভূতি দেখায়। তাই সুখ কামনা না করে নিজের অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ।

☞ **দেশ-কাল-পাত্রর পরিস্থিতি দেখে নিজেকে বদলাতে হয়,** কাজ করতে হয়, এমনকি বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে কথা বলতে হয়। সবসময় সবাইকে সব কথা বলা চলে না। তাতে বিদ্বেষ বাড়ে— গন্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কখনো বা মন উষ্ণ হয়ে উঠে। যখন কোন ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে থাকেন তখন তার সেই পরিস্থিতিতে এমন কথা বলতে হবে যাতে তার রাগ জল হয়ে যায়। কারো কাছে কিছু পাওনা থাকলে কিংবা কারো কাছ থেকে কিছু আদায় করতে হলে তার পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে আবেদন রাখুন।

☞ **ফুল-চন্দন আর ধূপ-দীপের মত জীবন করলে শান্তি মিলবে।** জীবনের উদ্দেশ্য তাই হওয়া দরকার। আপনার সামর্থ্য থাকলে হরিনাম যজ্ঞ ও মহোৎসব

করুন। নিজে কষ্ট স্বীকার করে অপরের ভাল করুন তাতে সুখ আছে। আবার নিজের গন্ধে নিজেও আকুল হওয়া যাবে। এগুলো জীবনের আদর্শ।

☞ **মানুষকে ভালবাসতে বলেছে বেদ।** তাতে আছে তৎ ত্বম্ অসি। মানে— তুমি সেই ব্রহ্ম। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের মধ্যে ব্রহ্ম বিরাজমান। তাই ব্রহ্ম লাভ করতে হলে মানুষকে ভালবাসুন। ব্রহ্ম সন্তুষ্ট হবেন।

☞ **বেশি আবেগপ্রবণ হবেন না। যদি আবেগপ্রবণ হন তাহলে অন্তরের আবেগ ভগবানকে নিবেদন করুন।** মানুষের মধ্যে ভগবান আছেন তথাপি মানুষকে না দেখিয়ে অন্তরে অন্তরে অন্তর্য্যামীর চরণ ধুইয়ে দিন। পুকুরের জলে নয়-চোখের জলে। তাতে হৃদয় হালকা হবে। মানুষকে দুঃখ জানিয়ে সর্বকিছু পাওয়ার পর মনে হবে যেন কিছুই পেলাম না। অনেকেই একথা আমাকে বলেছেন। আমিও এটা অনুভব করেছি। তাইতো স্বামীকে ভালবাসা সত্ত্বেও স্ত্রী সংগোপনে ইষ্টদেবতার পূজা করেন। মনের তৃপ্তির জন্য অন্তর দিয়ে অন্তরে অন্তরে অন্তর্য্যামীকে ভালবাসতে হবে। মানুষকে ভালবেসে আনন্দ পাওয়া যাবে ঠিকই কথা— তবে তা সাময়িক। কিন্তু ভগবানকে ভালবাসা বা একাত্ম করে নেওয়া চিরন্তন। তাই সৃষ্টির সাথে স্রষ্টাকেও প্রাণ দিয়ে ভালবাসুন। শান্তি পাবেন বলে আশা করি। আর মানুষের কাছে যদি আবেগ প্রবণ হয়ে উঠেন তাহলে আপনি হেয় হবেন।

☞ **জীবনকে সার্থক করতে হলে সর্বদা একই জেদ নিয়ে থাকলে চলবে না।** কারণ বহুবিচিত্র ভাবধারা ও চিন্তার স্রোত বয়ে চলছে এ সংসারে। আপনার একমুখী চিন্তা বা ভাবধারা তাই কোন কাজে লাগবে না। সময় ও পরিস্থিতি দেখে চিন্তা ও ভাবের সুর বদলাতে হবে। জগতের সাথে— সমাজের সাথে তাল মিলাতে হবে। ন্যায়-নীতি নিয়ে— আদর্শ নিয়ে সবসময় বসে থাকলে শান্তি পাবেন না।

☞ **নিজের সুখের সঙ্গে অন্যের সুখের দিকে লক্ষ্য রাখাই জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য।** অপরের ভাল নাই করতে পারুন কোনদিন খারাপ চিন্তা করবেন না। তুলসী দাস বলেছেন— কামি হি নারী পিয়ারী
জিমি লোভী হি প্রিয় জিমি দাম।

স্বামীর কাছে যেমন স্ত্রী প্রিয়, লোভীর কাছে যেমন অর্থ প্রিয়, তেমনি সকলকে প্রিয় করার ইচ্ছা আমাদের থাকা দরকার। তাতে শান্তি মিলবে।

☞ সৎসঙ্গকে গুরুত্ব দিন। জীবনে শান্তি পাবেন। **ভয়ঙ্কর অপরাধীও সৎসঙ্গে গিয়ে শান্তি ও মুক্তি পেয়েছে।** সৎসঙ্গ এমনই স্থান, মন সেখানে শান্তি পাবেই। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হবে না। মনের দৃঢ়তা আসবে। ভগবানে বিশ্বাস আসবে।

☞ আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে **অকারণে কারো কাছ থেকে সুখ নেবো না**— টাকা নেবো না— আরাম নেবো না— মান **সম্মান** নেবো না। **নিলেই ঋণী** হতে হবে। তার বদলে সেবা করবো। সেবা দ্বারা **পুরানো** ঋণ শোধ হবে আর পাওয়ার ইচ্ছা না করলে নতুন ঋণও হবে না। তখনই আমরা মুক্ত হয়ে যাবো, তাই **কারো কাছ থেকে অকারণে আরাম প্রত্যাশা করবেন না।**

তৃতীয় অধ্যায়

মনসংযম ও আত্মদর্শন—জীবনের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য

☞ মনকে সংযত করবেন কিভাবে?

মনকে সংযত না করতে পারলে জীবনে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। স্বামী বুধানন্দ বলেছেন—

(১) মনসংযমের জন্য প্রথমে অভ্যাস ও বৈরাগ্যকে জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে। ঈশ্বরে যদি বিশ্বাস নাও থাকে তাহলে অন্ততঃ নিজের আত্মাকে বিশ্বাস করে নিজের ইচ্ছাশক্তিও চেষ্টা দ্বারা সত্ব-রজ ও তমগুণকে অতিক্রম করতে হবে।

(২) ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করতে গেলে সুখভোগের বাসনাকে জয় করে জানতে হবে মনসংযমের সঙ্গে কোন কোন বিষয় জড়িত রয়েছে।

(৩) মনকে বিবিধ কলুষতা থেকে পবিত্র রাখতে হবে। পবিত্র মনকে সংযত করা খুবই সহজ। সুতরাং মনকে পবিত্র করার উপায়গুলি জানতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য হবে সত্বগুণের প্রাধান্য ঘটিয়ে পরে পবিত্রতার মাধ্যমে তাকে অতিক্রম করা।

(৪) মনসংযমের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে সৎসঙ্গ। সদালোচনার মাধ্যমে মনের মধ্যে ঈশ্বরপ্রীতি জাগবে। আর তাতেই মন হবে একমুখী।

(৫) মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—- মনকে সংযত করার জন্য যোগ অভ্যাস দরকার। ধ্যানের অভ্যাস থাকলে মন সংযত হবে।

(৬) ভয়ঙ্কর মানসিক দুশ্চিন্তার সময় অনবরত ভগবানের পবিত্র নাম জপ করা ও তার চরণে আশ্রয় চাওয়াই মনকে সংযত করার অন্যতম উপায়।

(৭) অবচেতন মনকে সংযত করতে হলে সৎচিন্তার প্রবাহ সৃষ্টি করতে হবে মনের মধ্যে। ভক্তিপরায়ণ ধর্মভীরুগণ সহজে মনকে সংযত করতে পারেন।

(৮) সবশেষে ভগবানকে ভালবাসুন— মন সংযত হবে।

☞ মনকে বশীভূত করার ইচ্ছাকে কিভাবে শক্তিশালী করা যায়?

(১) যেসব বিষয় আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল করে সেগুলিকে দূর করে তার বদলে অনুকূল কারণগুলির সাহায্যে আমাদের মনের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করতে হবে।

(২) মনকে সংযত করতে গিয়ে পরাজিত হলেও ভেঙে পড়া চলবে না। পরাজয়কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে নিতে হবে। আমাদেরকে আরো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সহনশীল ও ধীশক্তিসম্পন্ন হতে হবে।

☛ জীবন থেকে ক্রোধ রিপুটাকে ঈশ্বরের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে যান।

কাম ক্রোধকে যখন সংসার আর বিষয়ের দিকে পাঠানো যায় তাহলে তারা শত্রুর মত ব্যবহার করে। কিন্তু যখন তাদেরকে ঈশ্বরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে তখন তারা প্রিয় বন্ধুর মত হয়ে উঠবে। সাংসারিক কামনা বাসনাকে ঈশ্বর লাভের কামনা বাসনায় পরিবর্তন করতে হবে। সেই কাম হবে ঈশ্বরের প্রতি, সেই ক্রোধ হবে ঈশ্বর দেখা দিচ্ছেন না বলে। এইভাবে সমস্ত কামনা বাসনাগুলোর মোড় ঘুরিয়ে দিলে শান্তি অবশ্যই আসবে।

বীরের মত এগিয়ে চলুন। একদিনে বা একবছরে সফলতার আশা করবেন না। সর্বদা শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধরে থাকুন। দৃঢ় হোন, ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা বিসর্জন দিন। মনে রাখবেন— ব্যক্তিগত 'চরিত্র' এবং 'জীবন'ই শক্তির উৎস, অন্যকিছু নয়।

☛ মন সংযমের ফলে কী হয়?

(১) মানুষ আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন হবে।

(২) সংযত মন একাগ্রতা আনয়ন করে।

(৩) ব্যক্তিত্ব বাড়াতে চেষ্টা করে সংযত মন।

(৪) মন যদি সংযত থাকে তাহলে প্রতিকূলতার মধ্যে সফলতা আসে।

(৫) মানসিক শক্তির জন্ম দেয় মন সংযম।

(৬) সংযম— সুখী ও উদাসীন হৃদয়ের সৃষ্টি করে।

(৭) মনকে যে জয় করতে পারে সে বিশ্বজয়ী।

(৮) মন সংযমের দ্বারা মানুষ শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়।

(৯) সংযত মন কঠিন সমস্যাতে ভেঙে পড়ে না।

☛ মনের সঙ্গে খাদ্যের সম্পর্ক ঃ

(ক) খাদ্যের সঙ্গে মনের সম্পর্ক গভীর। খাদ্য ছাড়া মন দুর্বল হয়ে পড়ে। তাকে তখন সংযত করা যায় না।

(খ) মনের পেছনেই থাকে আত্মা, শরীর এবং মন—দুইই জড়, আত্মাই চৈতন্যস্বরূপ। মন কখনো আত্মা নয়— আত্মা থেকে ভিন্ন।

(গ) মন হচ্ছে সূক্ষ্মশরীর। তাই স্থূলশরীর ও মন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শরীর অসুস্থ হলে মন অসুস্থ হয়ে পড়ে।

(ঘ) মন খারাপ থাকলে শরীরও প্রভাবিত হয়। তাই মন অন্নময়।

(ঙ) প্রাণ জলময়। জলপান করে প্রাণ বেঁচে থাকতে পারে। অন্নহীন হয়ে থাকলে শরীরের সঙ্গে মনও ভেঙে পড়বে। মুখ দিয়ে কথা বেরুবে না।

(চ) অন্ন ও জল সেবনের মধ্যেই শরীরে তেজ আসে। তাতে বাক্য স্ফূরিত

হয়। তাই মন অন্নময়— প্রাণ জলময় আর বাক্ তেজময়। কথাগুলি ঋষি উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে বলেছিলেন।

শ্বেতকেতু বলেছিলেন—হে পিত! আমাকে এ বিষয়টি ভাল করে বুঝিয়ে দিন।

উদ্দালক তখন বলেছিলেন—হে পুত্র, তুমি পনের দিন আহার না করে জলপান করে থাকো। কারণ প্রাণ জলময়। যে জলপান করে তার প্রাণ বিয়োগ হয় না।

শ্বেতকেতু পনের দিন শুধু জলপান করে রইলেন। ষোড়শ দিনে পিতা তাকে বেদগুলি উচ্চারণ করতে বললেন। কিন্তু শ্বেতকেতুর মনে সেগুলি উদিত হচ্ছিল না। তখন উদ্দালক বললেন— বৎস, তুমি আহার কর। সুপ্রজ্জ্বলিত বিশাল অগ্নির একটি অঙ্গার অবশিষ্ট থাকলে যেমন হয়— তার দ্বারা আর বেশি কিছু দগ্ধ হয় না, তোমারও তেমনি ষোড়শ কলার মধ্যে একটি কলা মাত্র অবশিষ্ট আছে। তাই বেদসমূহ উচ্চারণ করতে পারছ না।

আহার করার পর পিতা তাকে বললেন— হে সৌম্য, সুপ্রজ্জ্বলিত সেই বিশাল অগ্নির উক্ত অবশিষ্ট জোনাকির মত ক্ষুদ্র অঙ্গারটিকে যদি তৃণসংযোগে বাড়ানো হয় তবে তার দ্বারা যেমন বহু বস্তু দগ্ধ হয় তেমনি তোমার ষোড়শ কলার একটি মাত্র বাকী ছিল। সেই কলাটি এখন অগ্নিসংযোগে হয়েছে প্রজ্জ্বলিত। তার দ্বারা এখন বেদসমূহ অনুভব করছ। অতএব মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়।

☛ মনই শান্তি আনতে পারে।

মন সর্ব্বব্যাপী। প্রত্যেক মন বিশ্বমনের এক একটি অংশ। প্রত্যেক মন অন্য সমস্ত মনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। তাই যে কোন একটি মন, তা যেখানেই থাকুক না কেন, সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে অক্ষম। মন প্রকাশমান। তার দীপ্তিতে সমুদয় জগৎ বিবিধরূপে প্রকাশিত হয়। সূক্ষ্ম বস্তু দিয়ে তৈরী, স্বচ্ছ এবং আত্মার সব থেকে নিকটতম বন্ধু মন বোধস্বরূপ আত্মার অন্তঃকরণ বা ভেতরের একটি যন্ত্র। এই মনের নিজস্ব চেতনা নেই। বোধস্বরূপ আত্মার জ্যোতির সাহায্যে মন সমস্ত কিছুকে উদ্ভাসিত করে। মনের দ্বারাই লোক দর্শন করে, মনের দ্বারাই শ্রবণ করে। কাম, সংকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, প্রজ্ঞা, ভয় ইত্যাদি সমস্তই মনের কাজ। মন আছে বলেই মানুষ সবকিছু বুঝতে পারে। নিজেকে নিজে দেখার ক্ষমতা মনেরই আছে। মনকে আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি গুণ মনকে পরিচালিত করে। অশান্তি-শান্তি মনই সৃষ্টি করতে পারে। মনকে রাঙানো যায়, বদলানো যায়। মন যদি একটি মাত্র মৌলিক

গুণের তত্ত্ব দিয়ে তৈরী হত তবে তাকে বদলানো অসম্ভব হত। মন উঁচু-নীচু উভয় স্তরে যেতে পারে। মানুষ মনকে ভাঙতে গড়তে পারে। মন অবচেতন, চেতন ও অতিচেতন— এই তিনটি স্তরে ওঠানামা করে। এসব দেখার জিনিস নয়— অনুভূতির বিষয়। মনের জ্ঞান বোধ প্রয়োগ ও দক্ষতা আছে। সে ভালমন্দ বিচার করতে সক্ষম।

পাঁচটি অবস্থার মধ্য দিয়ে মন নিজেকে প্রকাশ করে— ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, নিরুদ্ধ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন— যে অবস্থায় মন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, যখন তার মধ্যে কর্মবাসনা প্রবল থাকে তখন তাকে ক্ষিপ্ত মন বলে। এতে সুখ-দুঃখ দ্বিবিধভাবে প্রকাশিত হয়। মূঢ় মন তমোগুণাত্মক। সে শুধু অপরের ক্ষতি করবে। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় মন কেন্দ্রের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। একাগ্র অবস্থায় মন নিজেই কেন্দ্রীভূত হতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায় মানুষ সমাধিগ্রস্ত হয়। একাগ্রতা অভ্যাস ও বিকাশের দ্বারা মন পঞ্চম বা চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছায়। এরই নাম নিরুদ্ধ অবস্থা। এখানেই অতিচেতন অবস্থা লাভ হয়। একাগ্রতাই শান্তি আনয়ন করে।

☞ **মনকে স্থির রাখতে বুদ্ধদেব বলেছেন—**

(১) দেহে বার্ধক্য আসবেই। তাই মনকে চিন্তা করতে বারণ করা হচ্ছে।

(২) যাকে আমি ভালবাসি তার সাথে একদিন বিচ্ছিন্নতা আসবেই। তাই মনের সাবধানতা দরকার।

(৩) দেহের ব্যাধি কোন প্রকারেই এড়ানো যাবে না।

(৪) একদিন মৃত্যু হবেই। তবে ভেবে লাভ কি?

(৫) বর্তমানের আমি আমারই পূর্বকর্মের প্রতিফল এবং আমিই আমার ভালমন্দের উত্তরাধিকারী। এটা মনকে ভাবতে হবে। বুদ্ধদেবের এই উপদেশ স্মরণ করুন। মন পবিত্র হবে। জীবন বিশৃঙ্খল হবে না। মন ঈশ্বরমুখী হবে। শান্তি পাবেন।

মনকে গঠনমূলক চিন্তার বাঁধনে বাঁধতে হবে। যাদের জীবনে কোন আদর্শ নেই, কোন নৈতিক মূল্যবোধ নেই, কোন ছন্দ নেই— দৈনন্দিন জীবনে তাদের পক্ষে মন সংযম অসম্ভব। মনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হলে জীবনে ছন্দ আনতে হবে। তারপর মনের চঞ্চলতাকে স্তব্ধ করতে হবে। বিবেকানন্দ বলেছেন— মনকে সংযত করা কী কঠিন! একে উন্মত্ত বানরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এক বানরকে একটি লোক মদ খাইয়ে দিয়েছিল। তাতে সে খুব চঞ্চল হয়ে উঠল। তারপর তাকে একটি বিছে কামড়ে দিয়েছিল। বানরটি যন্ত্রণায় ছটপট করতে

করতে এদিক ওদিক হতে লাগল। এমন সময় যেন তার দুঃখের মাত্রা পূর্ণ করার জন্যে এক ভূত তার ভেতরে চেপে বসল। বানরটির অবস্থা এখন অবর্ণনীয়। মানুষের অবস্থা ঐ বানরের মত। চঞ্চল মন বাসনারূপ মদিরা পানে আরো চঞ্চল হয়ে উঠে। তারপর মাৎশ্চর্য বিষদংশন দ্বারা বার বার দংশিত হয়। শেষ অহংকার রূপ ভূত তাকে চেপে ধরে। তাই মানুষ সহজে সংযত হতে পারে না।

☞ **আসলে মন সংযমের জন্য চাই— অসাধারণ ধৈর্য, কঠিন পরিশ্রম, বোধশক্তি আর আন্তরিক প্রচেষ্টা।**

মন যত পবিত্র হবে তাকে সংযত করা তত সহজ হবে। মনের অপবিত্রতা হচ্ছে— অসাধারণ বাসনা, পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, ক্রোধ, ঈর্ষা, লোভ, ভয়, কাম, মোহ এবং অহং ইত্যাদি। এগুলি মনকে বিক্ষুব্ধ করে— মনের প্রশান্তি নষ্ট করে।

যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন— "দেবতার বেদীর সম্মুখে নৈবেদ্য নিবেদন কালে যদি তোমার মনে পড়ে যে তোমার ভাইয়ের তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলবার আছে তবে নৈবেদ্য রেখে ভাইয়ের কাছে চলে যাও। প্রথমে ভাইয়ের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন কর তারপর নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।" **যীশুখ্রীষ্টের এই উপদেশটি অত্যন্ত মূল্যবান।** মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক সেই মানসিক অবস্থার উপর দাঁড়িয়ে থাকে আধ্যাত্মিক জীবন। মনকে যদি দমন করতে চান তবে কখনই মনের মধ্যে বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসার ভাব জমিয়ে রাখা ঠিক নয়। মনকে উচ্চ আদর্শ লাভের জন্য ব্যবহার করতে হবে। অনাসক্তি, ক্ষমা ও বিনয়ের মাধ্যমে সমস্ত মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অতি সহজ ও আন্তরিক রাখতে হবে।

☞ **কল্পনা শক্তির অধিকারী হোন। মন সংযত হবে।**

সমস্ত কল্পনার মধ্যে ঈশ্বর কল্পনা শ্রেষ্ঠ। ভগবানের মূর্তির কথা সর্বদা মনে মনে চিন্তা করুন। তাঁর ক্রীয়াকলাপের কথা স্মরণ করুন। মানসিক শান্তি মিলবে। **স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেছেন—** "দোলায়মান মনকে ক্রমাগত টেনে ইষ্টপদে লাগাতে হবে। মনের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন যাতে অসৎভাব মনে প্রবেশ করতে না পারে। যখনই অসৎ চিন্তা মনে আসবে তখনই তার মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে।"

মাথা যখন নীচু অবস্থায় নেমে আসবে তখন দুর্বল না হয়ে বরং সর্বশক্তি দিয়ে বলতে হবে আমি দেবতার পুত্র দেবতা। অন্য কিছু নই। আমার অন্তরে ব্রহ্ম আছেন। আমি সেই ব্রহ্ম। আমি শোকে দুঃখে ভেঙে পড়ব কেন? কোন ভয়-পাপ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিত্যযুক্ত ভগবান। (বিবেকানন্দ)

☞ **বিদ্রোহী চঞ্চল মনকে সংযত করার প্রধান উপায় হচ্ছে নিজেকে ঐ মন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া।**

মন আমাদের শান্তির পথ পরিস্কার করে। মন শান্তিকে ডেকে আনে—আবার মনই আমাদের কু-পথে নিয়ে যেতে পারে। মনের ওপরে কিছু নেই। এই মন আমাদেরকে ভগবানের চরণে নিয়ে যেতে পারে। ভগবৎ অনুভূতি আনতে পারে। তাই মনকে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। আমাদের মনকে সৎ বিষয়ের দিকে পরিচালিত করতে হবে, **যাকে আমরা বেশি শ্রদ্ধা করি তার কাছে মন উন্মুক্ত করতে হবে—** তাতে আমাদেরকে আর মায়া বা প্রলোভনের ফাঁদে পড়তে হবে না। যদি আমরা নিরন্তর ঈশ্বরের ধ্যানকরি— তাকে স্মরণ করি— নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে তার নাম করতে পারি তবে অসৎ চিন্তা মনে আসবে না। বরং শান্তি মিলবে। নিজেকে আর পাপীতাপী বলে মনে হবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন— মনকে একাগ্র করে অবিরত তাঁর নাম গুণকীর্তন করলে মন সংযত হবে। দেহের সর্ব পাপ পালিয়ে যাবে। দেহ বৃক্ষের পাখী হল পাপ। নামকীর্তন করা মানে হাততালি দেওয়া। হাততালি দিলে যেমন গাছ থেকে পাখী উড়ে যায়— তেমনি তার নাম শুনে পাপপাখি পালিয়ে যাবে, দেহ শুদ্ধ হবে। আবার দেহ থাকলেই অসুখ হবে। এতে দুঃখ বা অনুতাপ কেন? মন সংযত থাকলেও অসুখ করবে না থাকলেও অসুখ হবে। এসবতো কলকব্জার ব্যাপার। গাড়ী বা কল চলতে চলতে খারাপ হতেই পারে। অসুখ সবারই হয়। তবে মন সংযত থাকলে অসুখের কষ্ট ততটা অনুভূত হবে না। রামকৃষ্ণ শেষ জীবনে অসুস্থ অবস্থাতেই ভক্তদের সাথে গল্প গুজব করে গেছেন। নাম করে করে অসুখের কষ্ট লাঘব করতেন তিনি। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বলেছেন— শুধু নাম কর। নাম করলেই মন সংযত হবে। কাজ কর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাম কর। অসুস্থ দেহ হয়ে উঠবে সুস্থ। পথে প্রান্তরে—শয়নে—স্বপনে—আহারে—বিহারে সর্বকর্মের মাঝে তাঁর নাম কর— তাঁকে চিন্তা কর— গাছে—লতায়—পাতায় তাঁর উপস্থিতি অনুভব কর— প্রত্যক্ষ কর— খুব ভাল লাগবে— মন শান্তিতে ভরে যাবে।

রত্নাকর দস্যু 'মরা-মরা' বলতে বলতেই 'রাম' উচ্চারণ করেছিলেন। তেমনি আমরাও যদি অসংযত ভাবেও বারবার তাঁর নাম স্মরণ চিন্তন ও কীর্তন করি তাহলে অবশ্যই সংযমী হয়ে উঠতে পারি।

☞ মন সংযত রাখতে অপরের কু-মন্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ হবে না। সর্বতভাবে আমাদের উদারতার আশ্রয় নিতে হবে। হৃদয়কে রসসিক্ত করতে হবে। নিজেকে সর্বদা ঈশ্বরানন্দে মগ্ন রাখতে হবে। ভাবতে হবে— আমিই ব্রহ্ম— আমার মধ্যে ঈশ্বর আছেন, তবে একমন না হলে ঈশ্বরানন্দ লাভ হবে না। তাই মন সংযৃত করুন। একমুখী হোন। ভগবান অন্তরে বসে আছেন জেনে তাঁকে পূজা করুন। তাতে শান্তি আসতে পারে।

☞ **মনকে সংযত করার পরেও যদি আনন্দ উপলব্ধি না হয়, কিংবা ভগবানে বিশ্বাস যদি না আসে তাহলে উন্মুক্ত নীল— ঘন নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে কিংবা অনন্ত তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগরের দিকে চেয়ে অথবা সুউচ্চ ভীমবর্ণ গিরিরাজের পাদপীঠতলে দাঁড়িয়ে অকপটে বলুন মনের কথা—** চেয়ে নিন আত্মবিশ্বাস আর উন্নতির পথ।

তা না হলে ভগবান বিশ্বাসী সাধুর কাছে গিয়ে মনের কথা জানান। তাতেও যদি অসমর্থ হন তাহলে **নিজের মনের সাথে সংগ্রাম করুন।** (স্বামীবুধানন্দ)

দ্বিতীয়তঃ কোন মতেই মনকে সংযত করতে না পারলে এমন কি মানসিক যন্ত্রণায় মন দুর্বিসহ হয়ে উঠলে জোরে জোরে—'ভগবান—ভগবান—তুমি কোথায়' বলে ডাক— মন আনন্দে ভরে যাবে। আনন্দ আসবেই। আর তখনই জীবের বিকার কেটে যাবে। **শ্রীমাও রামকৃষ্ণের মত বলেছেন—** নাম করলে শান্তি অবশ্যই আসবে। আগে কর তারপর বলবে! তবে মন দিয়ে ডাকো। সে ছাড়া আর তোমার কেউ নেই ভাবো—তবেই হবে। তবেই শান্তি। দু-নৌকায় পা দিয়ে কিছু হয় না।

ভগবান কি কখনো বেইমান হতে চান? তুমি কাউকে ভালবাসলে সে যদি ভাল না বাসে তবে সে বেইমান— নেমকহারাম। তাহলে ভগবান কি বেইমান হতে চাইবেন? তুমি কি বলতে চাও মানুষের মত তিনিও অজ্ঞান—বেইমান—বিবেকহীন—চেতনাবোধহীন? মোটেই না। তাহলে তিনি ভগবান হতে পারতেন না।

☞ **তীর্থে বা মন্দিরে** গেলে, **তিলক ধারণ করলে অথবা গেরুয়া জড়িয়ে সারাদিন বসে থাকলে ধর্ম হয় না।** ধর্ম নাই মালায় ঝোলায়— ধর্ম আছে হৃদয়ে। তুমি গায়ে চিত্র-বিচিত্র করে চিতাবাঘ সেজে বসে থাকতে পার কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলছে ততদিন সব বৃথা। (বিবেকানন্দ)

☞ **ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ বলেছেন—** ভগবান সবচেয়ে বেশি ভালবাসার কাঙাল। মন দিয়ে সত্যকারের কেউ তাকে ভালবাসেন না বলে তিনি করুণা করেননি। আমি জানি, ভগবান নিজে ভক্তের শরণাগত হওয়ার জন্য ডাক দিচ্ছেন আর আশ্বাস দিয়ে বলছেন— কাছে এসো বাছা, আমি তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসব, তোমাকে আদর করব। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। **আমার ভক্তের কোনদিন বিনাশ হয় না।**

☞ মানবদেহ ও মানবাত্মাই একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর। অবশ্য অন্যজীবজন্তুরাও ভগবানের মন্দির বটে কিন্তু মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির—মন্দিরের মধ্যে তাজমহল।

যদি মানুষের মধ্যে তার উপাসনা করতে না পারলাম তবে কোন মন্দিরেই কিছু উপকার হবে না। (বিবেকানন্দ)

☛ মানুষকে ভালবাসাই ভগবৎ ভজন। তাতেই ভগবানের করুণালাভ হবে। অযথা শাস্ত্র পড়ে লাভ নেই। তবে জ্ঞানলাভ করে মানুষকে যদি ভালবাসতেই শিখলাম না তবে কিসের জ্ঞানলাভ? তাছাড়া যে শাস্ত্র **হতাশ প্রাণে আশার আলো দিতে পারে না সে কীসের শাস্ত্র?** সে শাস্ত্রের প্রয়োজন নেই।

যে শাস্ত্রে গৃহীর উন্নতি হয় না সে কীসেব শাস্ত্র? যে শাস্ত্র রোগে-শোকে দারিদ্র্যে সান্ত্বনা দিতে পারে না সে শাস্ত্রই নয়।

☛ **আমরা কেউ পাপী তাপী নই।** পরকে আশ্রয় দেওয়া যদি পুণ্য কর্ম হয় তাহলে নিজেদের বাড়ীতে আমরা তো অনেক তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাণীকে আশ্রয় দিয়েছি। তাদেরকে আশ্রয় দেওয়াতো ভগবানের সৃষ্টিকে ভালবাসা। তাহলে আমরা স্বার্থপর কবে হলাম? নিজেদের জ্ঞানে অজ্ঞানে আমরা মশা-মাছি-বিড়াল-কুকুর প্রভৃতি বহু প্রাণীকে খাদ্য ও বাসস্থান দিয়েছি। সকলের কল্যাণের মধ্য দিয়েতো আমরা ভগবানের কাজ করে চলেছি। তবে আমরা পুণ্যবান হব না কেন?

আত্মা-পরমাত্মা ও ভগবৎ জ্ঞান

একটি উত্তপ্ত লৌহপিন্ড থেকে যেমন অনেক স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে তেমনি পরমাত্মা থেকে অনেক জীবাত্মার উদ্ভব। যদিও আত্মার কোন দৈহিক কর্ম নেই তবু অবিদ্যার জন্য ধর্ম ও অধর্ম নামে তার দুটি মানস কর্ম রয়েছে। আর সেজন্যেই সে দেহধারণ করে।

মানুষের হৃদয় থেকে যে বাহাত্তর হাজার নাড়ী নির্গত হয়েছে তার মধ্যে স্থির দীপের মত আত্মা বিরাজিত। মন-বুদ্ধি-স্মৃতি ও ইন্দ্রিয়কে অনন্য বিষয় করে এই হৃদয়ে দীপের মত আত্মার ধ্যান করতে হবে। নিরাকারের ধ্যান করতে না পারলে শব্দব্রহ্মের উপাসনা করা দরকার। সামবেদের জ্ঞানদ্বারা আত্মার জাগরণ হয়। **যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—** আত্মা অবিদ্যার বশে নানা যোনিতে নানা জাতিতে জন্মগ্রহণ করে। মলিন দর্পণে যেমন নিজের রূপ দেখা যায় না তেমনি অবিদ্যায় বিভ্রান্ত মানুষ আত্মদর্শন করতে পারে না। আত্মদর্শনই ভগবৎ দর্শন। **দেহাভিমানী জীব নিজের দেহেই নিজের বেদনা অনুভব করে কিন্তু আত্মাভিমানমুক্ত যোগী সকলের বেদনাই নিজের দেহে অনুভব করেন।** একই চন্দ্রকে বিভিন্ন জলাশয়ে যেমন ভিন্ন ভিন্নরূপে দেখা যায় তেমনি আত্মা এক হলেও নানারূপে প্রতিভাত হয়। মাকড়সা

যেমন নিজের লালা থেকে জাল রচনা করে নিজেই সেই জালে আবদ্ধ হয় তেমনি আত্মাও নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করে নিজের কর্মবশতই তাতে আবদ্ধ হয়।

☛ **আত্মা এক হলেও সত্ত্বা তার পৃথক।** তাই পৃথক পৃথক বস্তুতে সে অবস্থান করতে পারে। আত্মজ্ঞানলাভ হলে মানুষ যোগী হয়। যোগী মানে বিশ্ব আত্মার সাথে একাত্ম হওয়া। আর একাত্ম হওয়া মানেই আনন্দলোকে বিচরণ। যোগী তখন পদ্মাসনে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে ধ্যাননেত্রে দেখতে পাবেন। ধ্যান মানে চোখ বুজিয়ে কল্পনার নেত্রে দেখা নয়, ধ্যান হচ্ছে বৈষয়িক জ্ঞানশূন্য হয়ে আনন্দলোকে বিহার। এভাবে ধ্যান করতে করতে ব্রহ্মলাভ হয়।

☛ **আত্মাকে জানতে বন্ধুদের নিয়ে ধর্মালোচনার আসর বসান।** নিজের দেহ ও ওঁকার মন্থন করে ঈশ্বরকে দেখতে সচেষ্ট হোন। তখন আর কোন ভয় থাকবে না। মৃত্যুকে তখন সাপের খোলস ত্যাগের মত মনে হবে। জ্ঞানকে সারথি আর মনকে লাগাম করে বিষ্ণুপদে ছুটে যান। যমরাজ বলে কিছুই নেই। পন্ডিতেরা বলেন— যিনি আত্মার সংযম করতে পারেন তিনিই যম। নিজের আত্মাই যম।

☛ **মানুষ কখনো মরে না— মরে তার দেহ।** নিজেকে জানলে এটা জানা যায়। আমরা এখানে আসি না যাইও না। যত জীবাত্মা— সকলেই এক জ্যামিতিক বিন্দুতে অবস্থিত।

> যার হৃদয়বেদ খুলে গেছে তার কোন গ্রন্থের প্রয়োজন হয় না। গ্রন্থের কাজ হল মানুষের অন্তরে আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করা। গ্রন্থগুলিতো অন্যের অভিজ্ঞতামাত্র। (বিবেকানন্দ)

☛ **ঈশ্বরকে বিশ্বাস করলে নিজেকে খুব বড় ও মহান বলে মনে হবে।** এতে মনের ভারসাম্য বজায় থাকে। ভগবান যে কী নিজের অনুভূতি ছাড়া কাউকে বোঝানো সম্ভব নয়।

☛ Material happiness is like the mirage (মরীচিকা) of water in the desert. In the desert there is no water, but when a thirsty animal sees the mirage of water in the desert, he runs after it and dies. We know that there is no water in the desert– that the 'water' is just a reflection of the sunshine– but animals do not know this. Similarly, human life means to give up looking for happiness through sense gratification, which is just like a mirage in the desert and to try for spiritual happiness.

☛ **ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করতে হলে চারটি বস্তুর কামনা ত্যাগ করতে হবে।** (১) যা প্রাপ্য নয় তা, (২) যা প্রাপ্ত হয়েছেন তার প্রতি মোহ ও মমতা, (৩) পরশ্রীকাতরতা, (৪) নিজেকে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা। জীবনে চলতে হলে

এগুলি মন থেকে ত্যাগ করলে শুধু ভগবৎ মহিমার অধিকারী হওয়া যাবে না আদর্শ সুখী মানুষ হওয়া যাবে। স্বামী রামসুখ দাস আরো বলেছেন— আমাদের এইরূপ ভাবে মহৎ জীবনচর্চাকে জীবনচর্যায় সম্প্রসারিত করতে হবে। সেই সঙ্গে **চিরশান্তি পেতে হলে অপরকে কোনভাবেই দুঃখ ব্যথা দেওয়া চলবে না।**

☞ All our sufferings are due to ignorance. We have forgotten that we are eternal servants of Krishna .... There is a nice Bengali verse that explains this point. (শ্রীল প্রভুপাদ)

কৃষ্ণবহির্মুখী হয়ে ভোগবাঞ্ছা করি
নিকটস্থ মায়াতরী ঝাপটায়ে ধরি।।

☞ God is supplying all the necessities of the innumerable living entities. We should simply try to love God, without demanding anything. Our needs will be supplied. Even the cats and dogs are getting their necessities. They do not go to church and ask God for anything, but they are getting their necessities. So why should a devotee not get his necessities? If the cats and dogs can get their necessities of life without demanding anything from God, why should we demand from God– "Give me this and give me that?" No. we should simply try to love Him and serve Him. That will fulfil everything, and that is the highest platform of yoga.

(ভগবান সর্বদা আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তুর যোগান দিচ্ছেন। সেই ভগবানকে কোন কিছু না আকাঙ্ক্ষা করেই সহজ সরলভাবে ভালবাসা উচিৎ। শুধু আমরা নই বিড়াল কুকুররাও বাঁচতে গিয়ে না চেয়ে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস পেয়ে যাচ্ছে। তারা গীর্জাতেও যাচ্ছে না আর ভগবানকেও প্রার্থনা করছে না যে— হে ভগবান, আমাদের খাদ্য দাও। তাহলে একজন ভক্ত তার প্রয়োজনীয় বস্তু পাবে না কেন? অতএব কামনা বাসনা ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে ভগবানকে ভালবাসা উচিৎ। তিনি আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে সমস্ত কিছু পূর্ণ করে দেবেন। এটাই যোগ সাধনার উচ্চতম পন্থা।)

☞ কৃষ্ণ ভজনা করাই জীবনের শেষ উদ্দেশ্য। কারণ— Without Krishna consciousness everyone must suffer. That is the law of nature. As Krishna says in the Bhagbat Gita– you can be happy and free of suffering if you surrender me. **This is the only way.**

(Love of God, the ultimate goal)

ভগবানকে আমি দেখিনি, সবাই বলে তার নাম। আমার ঠাকুরদাকেও আমি দেখিনি; সবাই-এর মুখে শুনে তাকে বিশ্বাস করি। এভাবেই ভগবানকে বিশ্বাস করেছি। এই নিখিল বিশ্বের কার্যকলাপ তার অমোঘ বিধানে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে— এটা

বিশ্বাস করে আমি শান্তি লাভ করি। ভগবানকে সাথে নিয়েই আমরা দুঃখের বোঝা বইতে সক্ষম হই। তাই ভগবান নাও যদি থাকেন তাহলেও প্রয়োজনের তাগিদে আমাদেরকে একটা একটা ভগবান তৈরী করে নিতে হবে। কারণ **মানুষের ক্ষেত্রে ভগবানহীন জীবন অশান্তিজনক**। বিশেষ করে শেষ জীবনে ভগবানকে বন্ধু করা ছাড়া আমাদের আর গতি নাই। তাই আমি তার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে তার সাথে বন্ধুত্ব করেছি। আপনি যদি তাকে অস্তিত্বহীন বলেন তাহলেও মনে মনে একটি ভগবান তৈরী করে তাকে হৃদয়ে বসিয়ে রেখে আনন্দ উপভোগ করুন।

☞ অনন্ত শক্তির অধিকারী সর্ব্বব্যাপী ভগবানকে আমি অন্ধভাবেই বিশ্বাস করি। মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে, ধ্যানগম্ভীর হিমালয়ের মূর্তিমান বিস্তৃতির মধ্যে— গভীর বনরাজিনীলার ভেতরে তার সত্ত্বাকে উপলব্ধি করেছি। ভাগবতে পড়েছি কলিযুগে তিনি প্রচ্ছন্ন থাকবেন। কোন মানুষকে দেখা দেবেন না। তাই আমি সেই উক্তি মেনে নিয়ে তাকে সরাসরি দেখব— এ আশা করিনি। তবে জীবনের পথচলার মধ্যে দু'একটি মানুষের মধ্যে তার অসীম করুণা ও দয়া এবং অস্তিত্ব যেন উপলব্ধি করেছি। যখনই আমি মহাবিপদে— অর্থনৈতিক যন্ত্রণায় ও সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছি তখনই কোন ব্যক্তি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমার ধর্মগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃষ্ণ অভিসার' গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে আমি সামনে পেয়েছি বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ নিমাইসাধন বসু মহাশয়কে, পেয়েছি শ্রীমায়াপুরের গৌর গদাধর আশ্রমের সর্বাধিনায়ক ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ রসানন্দ বন মহারাজকে, পেয়েছি অধ্যাপক ডঃ অসিত মুখোপাধ্যায়কে। এইরূপ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সংকটে বিভিন্ন জ্ঞানী-গুণী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে কাছে পেয়েছি। তাই আমার সহৃদয় পাঠকবর্গকে ঈশ্বরের প্রতি অটুট বিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে অনুরোধ করছি। তাছাড়া তাদেরকে এটাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—

মন্ত্রে-তীর্থে-দ্বিজে-দেবে-দৈবজ্ঞে-ভেষজে-গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনাযস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।।

মন্ত্রে-তীর্থে-ব্রাহ্মণে, দেবতায়, দৈবজ্ঞে, ওষুধে এবং গুরুদেবে যার যেমন বিশ্বাস সে তদ্রূপ সিদ্ধিলাভ করে।

You should try to love Krishna, you will see how much you are satisfied. There is no other way to become fully satisfied. A great amounts of money will never give you satisfaction. If you transfer your love from your senses to Krishna you will be free from all misery.

(The Journey of Discovery)
(Srila Pravupad)

চতুর্থ অধ্যায়

সাধারণ দৃষ্টিতে জীবনের রূপ (প্রৌঢ় ও বার্ধক্যে)

"Friendly smiles, warm welcome, rich hospitality.
It is a way of life in this part of the country
And so much more."

আনন্দ-হাসি গান, উষ্ণ অভিনন্দন, গভীর আতিথেয়তা, দেওয়া-নেওয়া (give and take policy) আর প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা নিয়েই আমাদের জীবন। এই জীবনের পাঁচটি দশা— বাল্য-কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ় ও বার্ধক্য। ইতিপূর্বে 'হতাশ হবেন কেন' গ্রন্থে আমি বাল্য-কৈশোর-যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের জ্বালা-যন্ত্রণা ও বহুবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন এই গ্রন্থে প্রৌঢ় ও বার্ধক্যদশায় কীভাবে শান্তি পাওয়া যায় তা আলোচনা করছি। বার্ধক্য মানুষের চরম অবস্থা— পরম পরিণতি। এই দশায় অধিকাংশ মানুষের কাজকর্ম করার ক্ষমতা থাকে না— শরীরে থাকে না তেজ— মুখে থাকে না সাহসিকতার সুর। এককথায় বল-বুদ্ধি-ভরসা— সব হয়ে যায় ফর্সা। কৈশোরে বা যৌবনে মানুষের যত আনন্দ— বার্ধক্যে তত নিরানন্দ। যৌবনে আহ্বান— বার্ধক্যে বিসর্জন। এ যেন নদীর শেষ গতি— চাঞ্চল্য নেই, তরঙ্গ নেই, উচ্ছলতা নেই, নেই প্রাণপ্রাচুর্যের বাঁধভাঙা হিল্লোল।

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ ম্যাক্সমুলার বলেছেন— বার্ধক্য জীবন নদীর শেষ গতি হলেও— এই গতিতে চাঞ্চল্য না থাকলেও মিলনের একটা গভীর আনন্দ আছে। তা উপলব্ধি করলে হৃদয় তৃপ্তিতে ভরে যায়— জীবন সার্থক হয়— মন বিকশিত হয়ে অনন্তের মধ্যে মিশে যায়।

আমি কিন্তু এখানে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কিংবা জ্যোতিবাবু প্রমুখ মহান ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কথা বলছি না। **বলছি সাধারণ মধ্যবিত্ত কিংবা সাধারণ খেটে খাওয়া বয়স্ক মানুষদের কথা।** ভারতের ঐতিহ্য ছিল বয়স্কদের সম্মান-দেখানো— মর্যাদা দেওয়া। যেটা আমেরিকা-ইংলন্ডে ছিল না বা আজও নেই।

প্রৌঢ়ত্বের অবসাদ-জ্বালা যন্ত্রণা শেষ হতে না হতে বার্ধক্য হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করে মানুষের জীবনে— সাথে নিয়ে একরাশ দুশ্চিন্তা-হতাশা-অসুস্থতা আর ভয়াবহ মৃত্যুর বিভীষিকা। কত হাজার রকমের ব্যাধি তখন তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। করেও ফেলে।

যে দেহের একদিন পৌরুষের সীমা ছিল না— যে মানুষের একদিন অহংকারের অন্ত ছিল না— যে রূপবান যুবককে পাওয়ার জন্যে কত শত রূপসী

লালায়িত থাকত, যে রূপসীর যৌবনের ময়দানে কত নামকরা খিলাড়ী খেলার জন্য করত বাসনা আজ বার্ধক্য দশায় সেই অসুস্থ শয্যাশায়ী রূপবান যুবক যুবতীদের কী নিদারুণ পরিণতি! কেউ তাদের দিকে এখন ফিরে তাকায় না— কেউ তাদের নাম আজ আর লিস্টেডও করে না— কেউ তাদের বন্দনায় আকাশ-বাতাস মাতাল করে না— কেউ তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয় না।

তবে যে সব বিরাট খ্যাতনামা মহান ব্যক্তিদের আর্থিক সংগতি প্রভূত পরিমাণ —যেমন মন্ত্রী-জজ-এম. বি. বি. এস ডাক্তার-ব্যারিস্টার-বিখ্যাত শিল্পী-কোটিপতি শিল্প মালিক তাদের কথা বলছি না। তাদের কাছে যাওয়ার মত আমার রথ নেই। তারা আমার চিন্তা ও নাগালের বাইরে। তাদের জীবন পর্যালোচনা করার মত ধৃষ্টতাও আমার নেই। তাদের বার্ধক্য জীবন সুখের, আরাম শয্যায় দাসদাসী পরিবৃত, আত্মীয়স্বজন আবৃত। তাই তাদের কথা বলছি না। বলছি সাধারণ বার্ধক্য জীবনের কথা।

আমাদের মত সাধারণ জীবনের ক্ষেত্রে বার্ধক্য কখনো নিদারণ করুণ দৃষ্টি নিয়ে আসে। সেইক্ষেত্রে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিকে মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে— কিংবা অভাবগ্রস্ত হয়ে বার্ধক্যে আত্মহত্যা করতেও দেখেছি। কীর্তনগায়ক রাধারানী দেবী, অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তীর স্ত্রী ঊষারানী, যাত্রা অভিনেত্রী উমুক দেবীদের বার্ধক্য জীবনের মর্মান্তিক কথাও শুনেছি। নাম বলছি না অনেক প্রখ্যাত দুঃস্থ শিল্পীকেও বার্ধক্যের কষ্টে যন্ত্রণাদগ্ধ হয়ে মরতে দেখেছি। তাদের প্রতি আজ নেই কোন অভিনন্দন। কোথায় গেল তাদের জীবনের সেই গান— সেই প্রতাপ আর প্রাণপ্রাচুর্য! সব যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে— স্তব্ধ হয়ে গেছে জীবনের কলকাকলি। হায় রে বার্ধক্য! জীবনের অন্তিম দশা— তোমার এ কী করুণ পরিণতি!

তাই প্রথম জীবন থেকে শেষ জীবনের জন্য আমাদের সচেতন থাকতে হবে। মনের দৃঢ়তা নিয়ে এই বার্ধক্যকে এড়িয়ে নয়— মাড়িয়ে চলতে হবে। সাহস ও বীরত্ব নিয়ে আমাদের সকলকেই পার হতে হবে এই পথ। বলতে হবে— 'পথের ক্লান্তি ভুলে স্নেহভরা কোলে তব' অথবা 'দূর— আর কত দূর বলো-মা—'। মাথায় যদিও থাকে সীমাহীন যন্ত্রণার একরাশ বোঝা— তাতেও ক্ষতি নেই।

প্রৌঢ় ও বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা ও নানাবিধ ব্যাধি

মানুষ যখন প্রৌঢ় ও বার্ধক্যে উপনীত হয় তখন নানাবিধ ব্যাধি তাকে আক্রমণ করে। কারণ তখন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। সেইসব অসুখগুলির মধ্যে কয়েকটি তুলে ধরলাম। (১) বাত — জ্বরবাত, (২) হাঁটুর বাত

— ব্যথা ও কোমরের যন্ত্রণা, (৩) হৃদরোগ, (৪) কফ্-সর্দি, (৫) বদহজম, (৬) চর্মরোগ, (৭) অন্ধত্ব, (৮) পঙ্গুত্ব, (৯) স্বল্প বিরাম জ্বর, (১০) স্থবিরত্ব, (১১) অম্বল-গ্যাস, (১২) দাঁতের যন্ত্রণা, (১৩) ডায়বেটিস (১৪) টি. বি. ইত্যাদি।

নিত্যনিয়ত এইসব মহাব্যাধি বার্ধক্যজনিত দেহে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধে। আর তখনই মানুষের দেহের ভারসাম্য হারিয়ে যায়। মানুষের শরীরের রং জৌলুষ নষ্ট হয়। এ বিষয়ে ডাঃ জয়দেব হাজরা ডি. এইচ্. এম. এস ও ডাঃ এস. কুন্ডু এম. বি. বি. এস-এর পরামর্শ নিন।

শরীরকে সুস্থ্ রাখতে আজ থেকেই প্রাতঃকালে নিয়মিত হাঁটুন।

এখন **হাঁটুর বাত হলে কি করবেন**— এ বিষয়ে ডাঃ জয়দেব হাজরা মহাশয় কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন, শুনুন—

বয়স্ক লোকেদের মধ্যে অধিকাংশদেরই শরীরের বিভিন্ন স্থানে বাত হয়। এটা তবে মারাত্মক রোগ নয়। হাঁটুর বাতকে সারানো যায়। এবিষয়ে আমি কয়েকটি নির্দেশ দিচ্ছি, পালন করে দেখুন। নিশ্চয়ই সুস্থ্ থাকবেন।

(১) মাটিতে হাঁটু ভেঙে বসবেন না।
(২) গদিতে শোয়া-বসা করবেন না।
(৩) দাঁড়িয়ে রান্না করবেন।
(৪) থাইয়ের পেশির ব্যায়াম অথবা ম্যাসেজ করলে ভাল হয়।
(৫) জগিং নয় হাঁটতে হবে।
(৬) অতিরিক্ত ওজন কমাতে হবে।
(৭) দৌড়ঝাঁপ করা চলবে না।
(৮) কমোড ব্যবহার করলে ভাল হয়।
(৯) বাতে গরম সেঁক দেওয়া যেতে পারে।

তাবে যাতে না শরীরের কোন স্থানে বাত ধরে সেজন্যে কয়েকটি কথা বলছি শুনুন। সবকিছু করার আগে পাশের যেকোন ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিয়ে করবেন। কারণ আপনার শরীরে অন্যান্য আরো কিছু রোগ থাকতে পারে। শুনুন—

☞ **বাত না হওয়ার জন্য সাবধানতা—**

(১) যোগব্যায়াম প্রথম জীবন থেকেই অভ্যাস করবেন।
(২) প্রাতঃভ্রমণ চালিয়ে যান।
(৩) ডায়বেটিস যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।
(৪) হাই ব্লাডপ্রেসার যাতে না হয় সেদিকে সাবধান থাকুন।

(৫) দোকানের তেলেভাজা খুব কম খাবেন।

(৬) সপ্তাহে একদিনের বেশি মাংস খাবেন না। বিশেষ করে লাল মাংস মোটেই নয়।

(৭) প্রচুর জল খাবেন।

(৮) ভাতের চেয়ে শাকসব্জী বেশি করে খাবেন।

(৯) রসুন মর্তের অমৃত। এটা খেতে ভুলবেন না।

(১০) সিগারেট আর মদ মোটেই নয়।

(১১) নিয়মিত কোন ব্যথার ওষুধ খাবেন না। এতে কিডনির অসুখ ও পেপটিক আলসার হতে পারে।

(১২) মেয়েরা সিঁড়ি ভেঙে যথাসম্ভব ওপরে উঠা-নামা করুন।

☞ **বার্ধক্যে সুস্থ থাকার জন্য শরীরচর্চা, জগিং ও ব্যায়াম করা দরকার।**

শাস্ত্রে আছে, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।' আগে শরীরচর্চা তারপর ধর্মসাধনা। কারণ সুস্থ শরীর ছাড়া কোন কিছুই ভালভাবে সম্ভব নয়— কোন কাজে লাগে না মন। তাই শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য বাল্য থেকেই ব্যায়াম বা শরীরচর্চা দরকার। যারা দৈহিক কাজ করেন না তাদের ব্যায়াম বা জগিং একান্ত প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে শরীর ম্যাসেজ ও সকালে নিয়মিত হাঁটা দরকার। প্রাতঃভ্রমণ দ্বারাও হার্ট অ্যাটাক রোধ হতে পারে। এতে হাইপ্রেশারও কমে যায়। ব্যায়ামে কোলেস্টেরল হ্রাস পায়। চর্বি জমাট বাঁধে না। এছাড়া বার্ধক্যে সুস্থ থাকার জন্য অতিরিক্ত ধূমপান করা উচিৎ নয়।

☞ **শেষজীবনে নেশা করা অত্যন্ত ক্ষতিকারক।**

নেশা শরীরের চাঞ্চল্য আনয়ন করে। অনেকেই মনকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত রাখার জন্য নানারূপ বাজে নেশা ধরেন। তার মধ্যে গাঁজা, আফিং, চরস, গুড়াকু, মদ, হেরোইন উল্লেখযোগ্য। ধূমপানে যেমন হার্টের বা ফুসফুসের ক্ষতি হয় গাঁজাতে তেমনি কফ জন্মে। এই কফ থেকেই হাঁপানি শুরু হয়। তাই গাঁজা খাওয়া মোটেই উচিৎ নয়। অনেক লোক বলেন, গাঁজা খেয়ে দুধ পান করলে শরীর ভাল থাকে। আমার মনে হয়, যদি হজম করতে পারেন তাহলে দুধ খাবেন কিন্তু কোনমতেই গাঁজা খাবেন না। অনেকেই আফিং খেয়ে রোগযন্ত্রণা উপশম করেন। এটি করা উচিৎ নয়। এতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মদ লিভারকে নষ্ট করে দেয়। হেরোইন সেবন করলে প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে কমে আসে। মানুষ তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যায়।

☛ বৃদ্ধবয়সে যথাসম্ভব দই, কলা, মাখন, ঘি না খাওয়াই ভাল।

আগেই বলেছি দই, কলা, মাখন বৃদ্ধদের পক্ষে খাওয়া মোটেই ভাল নয়। এতে কফ বৃদ্ধি হয়। আর কফ থেকেই হাঁপানি আসে। ছানা খাওয়া যেতে পারে কিন্তু মাখন খাওয়া সম্ভব নয়। ঘি প্রথম জীবন থেকে খাওয়া অভ্যাস না থাকলে প্রৌঢ় বা বার্ধক্যে খাওয়া সম্পূর্ণ ক্ষতিকারক।

☛ ডায়বেটিস হলে করলা খাবেন।

মাটির নীচের ফসল সম্পূর্ণ বর্জন করাই ভাল। সুগার বা ডায়বেটিস রোগীদের নিমপাতার রস, করলার রস এবং হিংচা খেলে খুবই ভাল হয়। আমার জ্যাঠামশাই এইসব খেয়ে সুগারকে একেবারে শরীর থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছেন। এই রোগীদের কোন মিষ্টান্ন খাওয়া চলবে না। চিনিহীন চা খাবেন। আমাদের পাশের বাড়ীর এক দাদামশাই এভাবে খাওয়াদাওয়া করে ৯০ বছর পর্যন্ত বহাল তবিয়তেই বেঁচেছিলেন। সবাইকে মরতে একদিন হবেই। তাই তিনিও চলে গেছেন। তবে তিনি দেহ থেকে সুগারকে বাড়তে না দিয়ে ভালভাবেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

সুগার রোগীদের সাবধানতা সম্পর্কে ডাঃ জয়দেব হাজরার বক্তব্য শুনুন।

(১) তেলাকুচা পাতার রস মধুসহ ২ চামচ করে খেয়ে দেখুন।

(২) করলা অথবা নিমপাতার রস খাবেন।

(৩) এককোয়া রসুন দু'বেলা ভাত খাওয়ার পর খাবেন।

(৪) ভাতের বদলে অন্ততঃ একবেলা রুটি খাবেন।

(৫) আলুজাতীয় খাদ্য একেবারে নিষিদ্ধ।

(৬) খাসির মাংস, চর্বি, ঘি খাওয়া অনুচিত।

(৭) নিয়মিত শশা খাবেন।

(৮) মিষ্টি থেকে শতহাত দূরে থাকবেন।

☛ হাঁপানী রোগীদের ঘরে কোনরূপ পারফিউমের গন্ধ যেন না থাকে।

পারফিউম বা গন্ধতেল কিংবা সেন্ট হাঁপানীর পরম শত্রু। এতে রোগীদের শ্বাসকষ্ট সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাবে। এছাড়া হাঁপানী রোগীদের খোলামেলা ঘরে থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে। মুক্তবায়ু সেবন হাঁপানী রোগীদের একান্ত প্রয়োজনীয়। সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বুকে কফ না জমে। কফ জমলেই কিংবা ঠান্ডা লাগলেই হাঁপ বাড়বে। তবে 'যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোহত্র দোষঃ।' সাবধানতা সত্ত্বেও যদি রোগ হয় তাহলে তাকে কপালের দোষ বলে মেনে নিতেই হবে।

☛ **গ্যাসের রোগীরা কোন সময় পেট খালি রাখবেন না।**

গ্যাসের রোগীরা কিছু না পেলে অন্ততঃ জলপান করে পেট ভরিয়ে রাখুন। বারে বেশি, পরিমাণে কম করে খাবেন। আমার ৭৫ বছর বয়সী কাকা, ৮৮ বছর বয়সী দাদু, ৯৭ বছর বয়সী এক শিক্ষকমশাই এভাবেই সুস্থ আছেন। তবে তারা কোনদিন নেশা করেননি। সামান্য কারণে ওষুধও খাননি। পায়খানা পরিষ্কারের জন্য প্রচুর শাকসব্জী, জল, ফল ও ভুষি খেয়ে থাকেন। মাসে এক আধবার সামান্য হাল্কা রান্না মুরগী মাংসের স্বাদ গ্রহণ করেন। রাত্রে ২/৩ পিস্ রুটি কিংবা মুড়ি খেয়ে থাকেন। কোন কিছু খাওয়ার অন্ততঃ আধঘন্টা পরে জল খান। কেউবা একঘন্টা পরে। তাই তাদের গ্যাসের বিদ্রোহ নেই, বদহজম নেই। আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। গ্যাসের রোগীরা বেশি তেলমশলা দেওয়া রান্না মোটেই খাবেন না। উগ্র রান্নার স্বাদগ্রহণের লোভ সংবরণ করতে হবে। হাল্কা সেদ্ধ তরকারি খেলে খুবই ভাল।

☛ **বার্ধক্যে কোন কোন ব্যক্তির প্রস্রাবে জ্বালা হতে শুনেছি।**

এ বিষয়ে ডাঃ হাজরার পরামর্শ নিন। ডাঃ হাজরা বলছেন— শুনে নিন।

(১) গুরুপাক খাদ্য খাওয়া উচিৎ নয়।

(২) আখের রস ও মৌরী-মিছরির জল খাবেন।

(৩) নিয়মিত ভুষি খাবেন।

(৪) সহ্য হলে ঘোল খান। তবে কফের ধাতে দই কিংবা ঘোল খাওয়া ঠিক নয়।

☛ **দাঁতের যন্ত্রণায় ভুগছেন?**

চিন্তার কারণ নেই। শীর্ষাসন করুন। শীর্ষাসনের সময় অধিকাংশ রক্ত মস্তিষ্কপ্রদেশে উপস্থিত হয় বলে দন্তস্নায়ুগুলি ঐ রক্ত থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করে সবল হওয়ার সুযোগ পায় এবং দেহরক্ষী শ্বেতরক্তাণু এই সময় সদলবলে এগিয়ে গিয়ে দন্তমূলের রোগজীবাণু ধ্বংস করে। শীর্ষাসন না পারলে শশঙ্গাসন করবেন। তারপর সরিষার তেল নিয়ে ৪/৫ মিনিট মুখে রেখে কুলকুচি করবেন। তেল কুলকুচির পর ঠান্ডা জল দ্বারা ২/৩ বার কুলকুচি করবেন। প্রচুর পরিমাণে শাকসব্জী ও ফল খাবেন। যেসব ছেলেরা ছোটবেলা মাতৃদুগ্ধ বা গোদুগ্ধ পায় না তাদের যৌবনকালেই দন্তরোগ হয়ে থাকে। ক্যালসিয়ামযুক্ত খাদ্য খাওয়া দরকার। দাঁতের যন্ত্রণার কালে যদি অজীর্ণ রোগ হয় তাহলে উপবাস দ্বারা অজীর্ণ রোগজীবাণু নষ্ট করবে। পাইওরিয়া থাকলে ডেটল জলে মুখ ধোবেন। ত্রিফলার জলে কুলকুচি করবেন। টিঙ্কচার আয়োডিন ১ আউন্স, টিঙ্কচার অ্যাকোনাইট ১ আউন্স মিশিয়ে তুলার সাহায্যে দাঁতের গোড়ায় লাগালে পাইওরিয়া ভাল হয়।

☞ **দৃষ্টিশক্তির অসুবিধা হলে দিনে ৮/১০ বার চোখে ঠান্ডা জলের ঝাপটা দেবেন।**

জলের ঝাপটা দেওয়ার নিয়ম— মুখে খানিকটা জল পুরে ৮/১০ বার চোখে জলের ঝাপটা দিতে হয়। আহারাদির পর অবশ্যই ঝাপটা দেবেন। ডিম, চা, তেলেভাজা, ঘৃত কম খাবেন। শাকসব্জী, দুধ, ফল প্রভৃতি ক্ষারধর্মী পথ্য অবশ্যই গ্রহণীয়। বাদাম খাওয়া উচিৎ। ৫৫ বছরের পর ঘি-মাখন খাবেন না।

☞ **পক্ষাঘাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অম্লধর্মী খাদ্য অতিরিক্ত খাবেন না।** রক্তে অত্যধিক অম্লবিষ সঞ্চিত না হলে পক্ষাঘাত রোগ সৃষ্টি হতে পারে না। আমিষ খাদ্য অম্লধর্মী। এটা বৃদ্ধবয়সে ত্যাগ করা বিধেয়। নিরামিষ খাদ্যের মধ্যেও রুটি, ভাত অম্লধর্মী। এগুলো বেশি পরিমাণে খাবেন না। ঘৃত, মাখন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সবচেয়ে বেশি খাবেন শাকসব্জী, জল, দুধ (সহ্য হলে), দই, ঘোল, টক ও মিষ্টি ফল খুবই প্রয়োজনীয়। মদ্যপান, ধূমপান বর্জনীয়। অর্ধশলভাসন অভ্যাস থাকলে পক্ষাঘাত রোগ হয় না।

☞ **মেদরোগীরা দ্বিপ্রহরে অল্প ভাতের সঙ্গে যথেষ্ট শাকসব্জী খাবেন।**

ডাল ও মাছ অল্প পরিমাণে খেলে ভাল হয়। মাছ মাংস যথাসম্ভব কম খাবেন। ঘি-মাখন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যে কোন টকজাতীয় ফল খাবেন। রাত্রে ২/১ খানি রুটি আর এককাপ পাতলা দুধ খেলে ভাল হয়। সকালে খিদে পেলে জল খাবেন।

☞ **কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়ার কারণ ঃ**

(১) সব ওষুধে অল্পাধিক বিষ আছে। অতিরিক্ত ওষুধ সেবনে ঐ বিষ দেহে সঞ্চিত হয়। কিছু অংশ ঘাম, মল ও মূত্রের সাথে বেরিয়ে যায়। বাকি অংশ দেহের অনিষ্ট সাধন করে। ফলে অন্ত্রের স্নায়ুগুলি অবসন্ন হয়ে পড়ে। তারা মলবেগকে দ্রুতগতিশীল করতে পারে না।

(২) অলসতা ও শ্রমবিমুখতা কোষ্ঠবদ্ধতার দ্বিতীয় কারণ।

(৩) অতিরিক্ত চা, পান, তামাক, অতিরিক্ত আমিষ ভোজন কোষ্ঠকাঠিন্য ডেকে আনে।

(৪) শাকসব্জী না খাওয়া, দুধ না খাওয়া কোষ্ঠবদ্ধতার কারণ।

(৫) অত্যধিক চর্বিজাতীয় খাদ্য, ঝালমশলাযুক্ত খাদ্য কোষ্ঠবদ্ধতার পঞ্চম কারণ।

(৬) অতিরিক্ত হস্তমৈথুনাদি বদঅভ্যাস ও উচ্ছৃঙ্খল দাম্পত্য জীবনও কোষ্ঠবদ্ধতার কারণ।

কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করার জন্য ঃ

(১) বিভিন্ন আসন করুন।

(২) রাত্রি ৯টার পূর্বেই আহার শেষ করবেন।

(৩) আমিষ খাদ্য কম খাবেন।

(৪) শাকসব্জী ও ফল বেশি খাবেন।

(৫) শারীরিক পরিশ্রম দরকার।

(৬) কাঁচাবেলের মোরব্বা ও পাকাবেলের সরবৎ খাবেন।

(৭) ভূষিযুক্ত আটার রুটি খাবেন।

(৮) ঘৃত তেল না খাওয়া ভাল।

(৯) দিনে ভাত ও রাত্রে রুটি খাবেন।

(১০) মাঝে মাঝে নারকেল, ইশবগুলের ভূষি, ভিজা কিসমিস্ খাবেন।

☛ **পাতিলেবু খাওয়ায় অভ্যস্ত হোন।**

নিউমোনিয়া, কাশি, জ্বর, সর্দি থেকে রেহাই পাবেন। তবে যদি সহ্য না হয় খাবেন না। অনেকের পাতিলেবু খেলে পায়খানা হয়।

☛ **হৃদরোগ যাতে না হয় কি করবেন—**

(১) ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম করুন।

(২) চা, কফি, বিড়ি, পান, তামাক, সিগারেট, মদ ও আফিং খাবেন না।

(৩) খুব শারীরিক পরিশ্রম নিষিদ্ধ।

(৪) পায়খানা পরিষ্কার যাতে হয় সেদিকে লক্ষ্য দেবেন।

(৫) দুধ ও ফল বেশি খাবেন। গ্যাস হলে দুধ খাবেন না।

(৬) ভোজসভায় খাবেন না।

(৭) ৮/১০ ঘন্টা নিদ্রা প্রয়োজন।

(৮) একসঙ্গে অতিরিক্ত জলপান নিষিদ্ধ।

(৯) সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম লবণ বিশেষ সহায়ক।

(১০) হৃদরোগীদের সিঁড়িতে উঠানামা নিষিদ্ধ, চিৎ হয়ে শোবেন না।

☛ চা পানের অভাবে মাথা ধরলে বুঝতে হবে— ওটি অম্লশূল, পিত্তশূল, পাকস্থলীতে ঘা প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির আক্রমণের পূর্বসূচনা।

☛ ডালকে ভাল করে সেদ্ধ করে খাওয়া দরকার। কাঁচা ফলকে ভাল করে চিবিয়ে খাবেন, তা না হলে এই দুটি জিনিষ সহজে হজম হবে না। আমাশয়ের সৃষ্টি করবে।

ডাঃ জয়দেব হাজরা
ডি. এইচ. এম. এস.

প্রৌঢ়ে বিবাহ— বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা

আপনার অটুট সম্পত্তি আছে। স্ত্রী নেই। তাই পঞ্চান্ন বছর বয়সে আবার একটি তরুণীকে বিবাহ করলেন। প্রথম থেকেই কিন্তু আপনার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খিটিমিটি লেগেই থাকবে। ভালবাসায় ভাঙন ধরবে। কারণ অর্থসম্পদে পেট ভরতে পারে কিন্তু মন ভরে না। মন ভরাতে মনের মত মানুষ চাই। আপনি যৌনসংক্রান্ত ব্যাপারে বারবার পরাজিত হবেন। ক্রমশঃ স্ত্রীর কাছে হেয় হতে থাকবেন। অর্থসম্পদের চেয়ে কামসুখ বড়। এখন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মধ্যে কাম বড়। এই কামের মধ্য দিয়েই জগৎ বেঁচে আছে। এই সুখের দ্বারা জগত এত রঙীন ও সুন্দর বলে মনে হয়। কামসুখ ছাড়া জীবন মরুভূমিতুল্য। মানুষ সাধারণভাবে দুঃখে কষ্টে সময় অতিবাহিত করতে পারে কিন্তু যৌনসুখে অতৃপ্ত হলে শান্তি পায় না। তাই প্রৌঢ় বা বৃদ্ধবয়সে তরুণী যুবতীকে বিবাহ করা অনুচিত। এতে সংসারে শান্তির থেকে অশান্তিই বেশি হবে। এরপর আপনার স্ত্রী আপনার অনুপস্থিতিতে পাড়ার যুবকদের সাথে মিশতে চেষ্টা করবে। বারে-হোটেলে যেতে চাইবে। তারপর আপনার সামনেই কদাচারে লিপ্ত হবে। আপনার তখন কিছুই বলার থাকবে না। অপনাকে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে রাখবে। তখন সর্বদা তার মন জুগিয়ে চলতে হবে। বেশি কথা বললে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে অন্য ছেলের সাথে। তারপর আদালতে খোরপোষের জন্য দাবী পেশ করবে। আপনি মহামুশকিলে পড়বেন তখন। তাই বৃদ্ধ বয়সে তরুণী ভার্যা গ্রহণ না করাই ভাল। প্রথম পক্ষের স্ত্রীহারা এক বয়স্ক লোক পুনরায় বিবাহ করার কিছুদিন পরে দেখা গেল ঐ স্ত্রী বৃদ্ধের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভপাত ছেলের সাথে আসক্ত। লজ্জা আর অসম্মানের ভয়ে বয়স্ক ভদ্রলোকটিকে মুখ বুজিয়ে থাকতে হবে। বলতে গেলে নিজের থুতু নিজের গায়েই পড়বে। যাই হোক, তরুণী ভার্যাকে বশীভূত করতে হলে নিম্নলিখিত কথাগুলি পালন করা দরকার। তাতে যদি কিছুটা সে আয়ত্বে থাকে কিংবা গৃহের মধ্যে শান্তি বজায় রাখা যায়।

(১) বৃদ্ধের তরুণী ভার্যাকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে দিতে হবে।

(২) দামী কাপড় গহনায় ভরিয়ে রাখতে হবে তার মনকে।

(৩) সর্বদা তার মন জুগিয়ে বলতে হবে— তোমার মত এত সুন্দর কাউকে দেখিনিতো আর!

(৪) প্রতি কথায় আর কাজে তরুণী স্ত্রীর প্রশংসা করতে হবে। সে যা চাইবে তা আপনাকে পূর্ণ করতে হবে। না দিলেই অশান্তি।

(৫) সংসার চালানোর সমস্ত দায়-দায়িত্ব তার হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

(৬) আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সিনেমাতে যাওয়ার পারমিশন দিতে হবে।

(৭) সেই স্ত্রীই হবে আপনার পরামর্শদাতা। তার বক্তব্য আপনাকে শিরোধার্য করতে হবে। না মানলেই শুরু হবে কলহ।

(৮) তরুণী ভার্য্যা অভিমানিনী হবেই। তার অভিমান ভাঙাতে আপনার সাত মন তেল শেষ হয়ে যাবে। অতএব ভেবে চিনতে বিবাহ করবেন।

(৯) সে বাড়ীর কাজকর্ম নাও করতে পারে। এ ব্যাপারে কোন কথা বলা চলবে না। বরং আরো বলবেন—তোমার মুখের মুচকি হাসি ভরিয়ে দিল মন, তুমি আমার চিরজনমের পরম আপন জন।

(১০) তার গতিবিধি আর চাল চলন আপনার মনে বিরক্তি উৎপাদন করলেও আপনাকে মুখ বুজে সব সহ্য করে নিতে হবে। কারণ আপনার বেলা বয়ে গেছে। আগের মত আর সাহস নেই।

তবে বৃদ্ধ বয়সে যদি বিয়ে করতেই হয় তাহলে কোন এক প্রৌঢ় বয়স্কা বিধবাকে বিয়ে করা উচিৎ। আবেগের বশে যে কোন অষ্টাদশীকে বিয়ে করবেন না। ভেবে চিনতে মেয়েটির সাথে খোলামেলা কথা বলে বিয়ে করা দরকার। তা না হলে যে শান্তির জন্য আপনি বিবাহ করলেন— সেই শান্তি পাওয়াতো দূরের কথা বরং অশান্তিতে জীবন ভরে উঠবে।

☛ আপনার বেশি বয়সে সন্তান জন্মেছে বলে হীনমন্যতায় ভুগবেন না।

বেশি বয়সে বিয়ে করেছে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে। আমাদের পাশাপাশি ৭৫ বছর বয়স্ক একটি লোকের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে একসাথে যমজ কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। সন্তান দুটির বয়স এখন ১২ বছর। ৮৭ বছরের বৃদ্ধ ও তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী এখন বহাল তবিয়তেই রয়েছে। তবে বৃদ্ধের অর্থ সম্পদের অভাব কোনদিন নেই। ঐ বৃদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নেই। তবে বিগত স্ত্রী দু'টির চারটি ছেলে ও পুত্রবধূ বোম্বেতে সোনার দোকান করে সেখানে থাকে।

(ক) **ঠাকুর রামকৃষ্ণের** বাবার ৬৩ বছর বয়সে রামকৃষ্ণের জন্ম হয়। আরো পাঁচ বছর পরে তার বোনের জন্ম হয়। **রবীন্দ্রনাথ** তার বাবার চতুর্দ্দশতম সন্তান। চৈতন্যদেব তার মায়ের **অষ্টমগর্ভের ছেলে**। শচীদেবীর অনেক বয়সেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। **গান্ধিজীর** বাবাও ছিলেন তৃতীয় পক্ষের ছেলে। **রামচন্দ্র** তার বাবার শেষ বয়সের সন্তান ছিলেন। **লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন** দশরথের একই সময়কার সন্তান। মুর্শিদাবাদের নবাব বংশের **ওয়াসেফ মির্জার** ছ'টি নিকে করা বেগম ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠা পত্নী স্বগুরু বেগম কলকাতার পার্কস্ট্রীটের একভবনে

বাস করতেন। নবাবের বয়স যখন ৭৫ বছর তার সেই কনিষ্ঠা বেগমের গর্ভে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল।

(খ) ভারতের সবচেয়ে চরিত্রবান ছেলে, ভীষ্ম তার বাবার বিবাহ দিয়েছিলেন। আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক বার্টান্ড রাসেল চতুর্থবার বিয়ে করেছিলেন। তথাপি ৯৮ বছর বেঁচেছিলেন। মরার আগের বছর পর্য্যন্ত বই লিখে গেছেন। তার ছেলেও জন্মেছিল।

(গ) আধুনিক যুগের চিত্রকর প্যাভ্লভ পিকাশো সত্তরের দশকে যখন পা দেন তখন স্ত্রীর বয়স দু'এর ঘরে। তারও সন্তান হয়েছিল। রসায়নের চিহ্ন সংকেতের প্রবর্তক ব্রার্জিলিয়াস ৬০ বছর অতিক্রম করে বিয়ে করেছিলেন।

অবশ্য এসব উদাহরণ দিয়ে আমি কাউকে বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করতে প্রলুব্ধ করছি না। ঘটনাক্রমে যদি কেউ বেশি বয়সে বিয়ে করে সন্তান সন্ততির জনক হয়ে পড়েন তাতে সংকোচবোধ করবেন না বা কোনরূপ হীনমন্যতায় ভুগবেন না। শেষ বয়সে বিয়ে করলে নিজেকে একটু সচেতন থাকতে হবে।

শেষ জীবনকে কীভাবে উপভোগ করবেন?

সবাই বলে বৃদ্ধবয়স খুবই জ্বালা যন্ত্রণাময়। কিন্তু তা নয়, বৃদ্ধবয়সই উপভোগের বয়স। বৃদ্ধ বয়সে জীবনের ছন্দ হারালে চলবে না। ছন্দ গেলে সব শেষ। ছন্দবিহীন জীবন মরুভূমিতুল্য। সব বিষয়েরই ছন্দ থাকা দরকার। নৃত্যের যেমন ছন্দ আছে, কবিতার যেমন ছন্দ আছে, গানের যেমন ছন্দ আছে তেমনি জীবনকে ছন্দোবদ্ধ করতে হবে। ছন্দপতন হলে সবই বেসুরো—সবই আলোনা বলে মনে হয়। মনের মধ্যে ছন্দ থাকলে ধূসর গোধূলিও আনন্দময় হয়ে উঠবে। তাই আপনি নিজেকে সর্বদা ফ্রি রাখতে ইচ্ছা করে প্রকৃতির সাথে অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে হৃদয়কে ভরিয়ে দিন। কারো সাতে-পাঁচে থাকবেন না। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। বার্ধক্যকে মনে পুষে রাখবেন না। মৃত্যু ভয়েও ভীত হবেন না। মৃত্যু যৌবনেও হতে পারে আবার প্রৌঢ়েও হতে পারে। কে বললে মৃত্যু আপনার দিকে বিরাট কুয়াশা নিয়ে ছুটে আসছে? শিশুর মত হেসে-খেলে মুহূর্তকে উপভোগ করুন। কেউ যদি আপনাকে বুড়ো দাদু বলে তাহলে আপনি বলুন—

শোন শোন নাতিগণ, নাতিনীরা সব শোন।
আমায় দেখে অকারণে হাস তোমরা কেন?
মুখোশ পরে রয়েছি আমি, ভেতর আমার শিশু।
হাত ধরে খেলি আয় জগা-কালা-বিশু।।

বৃদ্ধ বয়সে মন দিয়ে সকলকে ভালবাসুন। যাকেই কাছে পাবেন তারই প্রশংসা করুন। কেউ যদি নিন্দার কাঁটা দ্বারা আঘাত করে করুক কিন্তু সেই কাঁটা শরীরে বিদ্ধ হয়ে যেন না থাকে। কাঁটাটা তুলে দেবেন। সদা স্ফূর্তিতে থাকবেন।

ফ্রয়েড বলেছিলেন দুঃখ নিবারণের সবচেয়ে সহজ পথ হল কোন ঝামেলার মধ্যে না থাকা, সংসার থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া। তিনি আরো বলেছিলেন— Old is gold.

তাছাড়া বৃদ্ধবয়সই যে শ্রেষ্ঠ বয়স সে সম্বন্ধে কয়েকটি যুক্তিযুক্ত কথা আলোচনা করছি।

(১) মানুষ বৃদ্ধ হলেই সুন্দর হয়। বলুনতো আপনার বাবামায়ের যৌবন কালের ছবিটি আপনার ভাল লাগবে না বৃদ্ধ বয়সের— কোনটি চোখে সুন্দর লাগবে? বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, নজরুল, গান্ধীজী প্রমুখ ব্যক্তিদের বৃদ্ধবয়সের ছবিই বাঁধানো থাকে। বিদ্যাসাগর কিংবা গান্ধিজীর অল্প বয়সের ছবি কি আনন্দ দিতে পারে? মোটেই পারে না।

(২) বৃদ্ধ বয়সেই মানুষের মূল্যায়ন ও পুরস্কার প্রাপ্তি। তাছাড়া 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্।' সবাই বৃদ্ধের উপদেশ মেনে নেয়। সমাজে কোন কিছুর মীমাংসা করতে বৃদ্ধদের দরকার হয়।

(৩) বৃদ্ধ বয়সেই জ্ঞানী ব্যক্তিরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেন। জ্যোতি বসু, মনমোহনবাবু প্রমুখ ব্যক্তিদের আনন্দমুখর উপভোগময় বার্ধক্যের কথা ভেবে দেখুনতো! তারা কেমন সুখেই আছেন।

(৪) ফ্রান্সিস বেকন বলেছেন— Old wood best to burn old wine to drink, old friend to trust and old authors to read. পুরানো কাঠ ভাল জ্বলে, পুরানো মদ্য ভাল নেশা দেয়, পুরানো বন্ধু বিশ্বস্ত হয় এবং পুরানো লেখকদের বই সকলে পড়তে চায়।

☛ যৌবনের চাঞ্চল্য আছে কিন্তু বার্ধক্যের পবিত্র শুভ্রতার (অনাসক্তি) কাছে সে চাঞ্চল্য মলিন হয়ে যায়—রবীন্দ্রনাথ।

☛ **You are not this material body. You are a spirit soul, totally apart from this body. Actually a spirit soul does not require a material body for its survival and enjoyment.**

☛ **অনেকে বলেন বৃদ্ধবয়স বড় দুঃখের।** আমি বলছি না। বৃদ্ধবয়সে আপনাকে সংসারের কোন ঝামেলা নিতে হবে না। কোন মেয়ের সাথে প্রেমের কথা বললেও কেউ আপনাকে সন্দেহ করবে না। সকালে দেরী করে বিছানা ছাড়তে পারেন।

ঘুরে বেড়িয়ে সময়কাটালেও কেউ আপনাকে বাধা দেবে না। প্রকৃতির সাথে অঙ্গ বিহীন আলিঙ্গনে হৃদয় ভরাতে পারবেন। কোন সমস্যার সমাধানের জন্য লোকজন আপনাকে মধ্যস্থ মানতে পারেন। তবে যদি ঐসব ঝামেলা পছন্দ করেন তবে মধ্যস্থ থাকবেন। বৃদ্ধবয়সে পুত্রদের নিয়ে আনন্দ উৎসব করতে পারেন। গুণী পুত্র হলে গৌরববোধ অবশ্যই করবেন। আপনি কবি-সাহিত্যিক-উকিল-ব্যারিস্টার কিংবা রাজনীতিবিদ হলে সর্বদাই আপনাকে ব্যস্ত থাকতে হবে। তখন আপনি বৃদ্ধ কি যুবক তা ভাববার অবসর পাবেন না। অর্থাৎ আপনার কোন রিটায়ারমেন্ট থাকবে না। গানবাজনা করতে পারেন। জীবনকে হাসিকান্নার পৌষ-ফাগুনের পালায় ভরিয়ে দিতে পারবেন। বৃদ্ধবয়সে আপনি বাড়ীর সমস্ত ব্যক্তির প্রণম্য। আমার ৮০ বছরের জ্যাঠামশাই বলেন— আমি ইচ্ছামত ঘুম·থেকে উঠি। গল্প করি। আড্ডা দিই। চা খাই। চিঠি লিখি। কবিতা লিখি। সন্ধ্যায় বুড়োদের কথকতার আসরে যোগ দিই। এখন অনেক স্মৃতি আমার কাছে প্রীতি। মরার ভয় আমার নেই। এতদিন যখন মরিনি তখন ঐ ভয়টা আমার আর আসে না। এবছর অষ্টপ্রহরব্যাপী নামযজ্ঞ করব মহা ধূমধামে। ছেলেরা টাকাপয়সা দেবে বলেছে। সব আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করব। বাড়ীতে চাঁদের হাট বসাব। শুধু চাঁদের হাট নয় বাড়ীকে কয়েকদিনের জন্য বৃন্দাবন করে রাখব।

আমার রাজেন দাদুর বয়স ৯০-এর মতো। সারাদিন ঘুরে বেড়ান। দুটো ছেলে। একজন ডাক্তার অপরজন স্কুল মাস্টার। সামান্য অসুখ হলে ছেলের কাছে চলে যান। ডাক্তার ছেলেটি একটু দূরে থাকেন। তিনি বাবাকে খুব ভালবাসেন। তাই রাজেনদাদুর সুখের কপাল। সারাদিন এখানে ওখানে আড্ডা দেন— গল্প করেন— বই পড়েন আবার পাড়ার মিটিংয়ে যান। ৯০ বছর বয়সেও খালি চোখে বই পড়তে পারেন। খাওয়াদাওয়ার দিকে চাহিদা মোটেই নেই। সামান্য কিছু খাদ্য হলেই হল। রাত্রে ২৫ বছর ভাত খাননি। মুড়ি অথবা রুটি। রিচ্ খাবার মোটেই নয়। বেশি ওষুধও খাননি।

আমাদের পাশের আশ্রমে টুকটুকে ফর্সা ল্যাক্টোজেন বেবীমার্কা চেহারা নিয়ে ৯৪ বছরের শচীনন্দন বাবাজী বহাল তবিয়তেই আছেন। আশ্চর্য ব্যাপার ওনার পাকস্থলীতে ঘৃত ও দুগ্ধ এখনো ভালই পরিপাক হচ্ছে। বেশ নাদুসনুদুস চেহারা। গলায় কীসব নাম না জানা শুকনো ডুমো ডুমো ফলের মালা। কপালে-বাহুতে-বুকে-পেটে-কোমরে চন্দনের ছোপ। পরণে কৌপিন এখনো মজবুত। লুঙ্গির মত কাপড় পরেন। গলায় একটা উড়নি। দেখলে ভাল লাগে। শ্রদ্ধা আসে।

এরপর নিমাইবাবুর কাছে আসি। বয়স ৭০-এর কাছাকাছি। ভদ্রলোক শিক্ষক ছিলেন। দীর্ঘ চেহারা। ফর্সা তবে রোগা। ঈষৎ বক্র দেহ। পোশাকের বেশ

পরিপাটি। সকাল থেকে এখানে ওখানে চায়ের দোকানে আড্ডা। মনমাতানো কথা বলতে পারেন। এটা তার নিজস্ব প্রতিভা। যাকে বলে God gifted. খাওয়াদাওয়া বেশ রুচিসম্পন্ন। বিভিন্ন ফাংশানে যেতে খুব পছন্দ করেন। আমন্ত্রণও আসে। সর্বদা সঙ্গে থাকে একটা সাইড ব্যাগ। তাতে কীসব থাকে জানি না। তবে জলের বোতল, চায়ের ফ্লাস্ক আর টুপি রাখতে দেখেছি। মানে বাইরে থেকে দেখতে পেয়েছি। জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পাইনি। উনি মাঝে মাঝে আমার বই সংশোধন ও সংমার্জন করে দেন। ভদ্রলোক বেশ ভাল। তাই নমস্কার জানাই।

আমার মায়ের শিক্ষকমশাই প্রহ্লাদবাবু— প্রহ্লাদচন্দ্র পাত্র। বেঁটে লোক। ৯৭ বছরে সুস্থ সবল আছেন। দু'বেলা টিউশনি করেন। কারো সাতে পাঁচে থাকেন না। খাওয়াদাওয়ায় কোন লোভ নেই। ধর্মগ্রন্থ পড়তে খুব ভালবাসেন। সেই প্রণম্য মাস্টারমশাই এখন সুস্থই আছেন। কোন বড় কিছু তাকে আক্রমণ করতে সাহস পায় না। বলতে ভুলে গেছি ভদ্রলোকের স্ত্রী নেই।

অজিত রায় আমাদের বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। এখন তাঁর বয়স ৯৪/৯৫। আজও চুটিয়ে পাট ব্যবসা চালাচ্ছেন। আমি আজ ৩৩ বছর ব্যাপী একই রকম তার আদল দেখছি। লম্বা-ফর্সা লোক। বেশ রোগা। রাস্তায় সারাদিন ঘোরেন। বসে থাকেন না।

আমার কাকা কিশোরীবাবু। প্রায় ৮০-র মত। খাওয়াদাওয়াতে বেশ রেস্ট্রিক্‌শন। স্লিম ফিগার। সারাদিন সাইকেল নিয়ে রান দিতে পারেন। কোন কাজে বিরক্ত নেই। জীবনখানা হাসিখুশী আর প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর।

আমার মায়ের বয়স ৭২ বছর। মোটাসোটা নয়। খাওয়ার দিকে চাহিদা নেই। টিভি দেখেন, গান শুনে, সাংসারিক কাজকর্ম করে সময় কাটাচ্ছেন। তাঁকে বসে থাকতে দেখিনি।

এবার জ্যোতি বসু ও তাঁর মন্ত্রীসভার বৃদ্ধদের কথা আপনারা নিজেরা ভাবুন। মনমোহনবাবুর মন্ত্রীসভার মানুষদের বয়সের দিকে লক্ষ্য দিন। তারা কেমনভাবে জীবনকে উপভোগ করছে দেখুন। এদের বার্ধক্য দেখে লোভ হয়।

আবার শিষ্টতা, পরিচ্ছন্নতা, প্রীতি ও আগ্রহ বার্ধক্যকে আনন্দমুখর করে তোলে। আমি সেদিন আমার এক বৃদ্ধ অধ্যাপকের কাছে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, ভীষণ ফিটফাট তিনি যেন আমারই জন্য অপেক্ষা করছেন। এভাবেই তিনি সারাদিন থাকেন। তারপর তাঁর সে কী প্রাণখোলা কথা! কথার মধ্যে কত আন্তরিকতা! যেন হাজার বছরের কত প্রেমের স্নেহময় সম্ভাষণ! না দেখলে বুঝতে পারবেন না। তাই আপনিও পোশাক পরিচ্ছদে— কথাবার্তায়— স্নেহ মমতায়— স্মার্টনেসে— আপটু ডেট্ কায়দায় বার্ধক্যকে উপভোগ করুন।

পঞ্চম অধ্যায়

(ক) বার্ধক্যে হতাশ হবেন না

আনন্দ সবাই পেতে চায়, জগৎ আনন্দ থেকে উদ্ভূত। আনন্দের মধ্যেই আবার বিলীন হয়। তাই মানুষকে এমন কথা বলা বা মানুষের সাথে এমন ব্যবহার করা উচিত— যাতে সে আনন্দ পায়। জীবনের পাঁচটি পর্যায়ের মধ্যে শৈশব সবচেয়ে আনন্দমুখর। 'যেথায় যাবে সেথায় যেন আনন্দেরই লহর বয়।' তারপর যৌবন— জীবনের তৃতীয় পর্যায়, এটিও মানুষের জীবনে আনন্দ আনে। কিন্তু সেই আনন্দের পাশাপাশি দুঃখ-ব্যথা-হতাশা মানুষকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। তারপর নানা দায়িত্ব নানান ঝামেলা নিয়ে প্রৌঢ়ত্ব এসে উপস্থিত হয়। কাঁধে তার জড়তা আর দুশ্চিন্তার নামাবলী। সে যেন জীর্ণ শীর্ণ কৃশাদীর্ণ বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। সে সংসারের চাপে আনন্দ থেকে বঞ্চিত। খুঁজেই পায় না সেই সূত্র— আনন্দাৎ ভূতানি জায়ন্তে। এরপর বার্ধক্য আসে মানুষের জীবনে একরাশ দুরাশা আর ব্যথা নিয়ে। সে যেন একটা অপ্রয়োজনীয় ঝামেলা। তখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন মিল থাকে না। যৌন আকর্ষণ একেবারেই বিলীন হয়ে যায়। সংসারে খিটিমিটি লেগেই থাকে। তখন কেউ কারো মেজাজ সহ্য করে না। কেউ বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কথা গ্রাহ্য করে না। অবশ্য ব্যাঙ্কের পাশ বইয়ে টাকা জমা থাকলে হয়ত ছেলে-মেয়ে-পুত্র-পুত্রবধূ আপনার কথা, আপনার যুক্তি কিছুটা শুনতে পারে— আপনাকে শ্রদ্ধা করতে পারে।

তাই বার্ধক্যে আনন্দ পেতে হলে ব্যাঙ্কের পাশ বইতো রয়েছেই— সেইসঙ্গে বাড়ীর সবাইয়ের সাথে সহৃদয় ব্যবহার করুন। দুঃখ-ব্যথায় কাতর না হয়ে আপনার কথায় সবাই যাতে আনন্দ পায় সেইরকম মিষ্টি কথা বলুন। কারণ—

প্রিয়বাক্য প্রদানেন সর্বে তুষ্যন্তি জন্তবঃ।
তস্মাৎ তদেব বক্তব্যং বচনে কা দরিদ্রতা।।

প্রিয়কথা বললে সবাই যদি তুষ্ট থাকেন তাহলে তা বলতে কৃপণতা কেন? এতে আপনার মানমর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। সবাই আপনাকে ভালবাসবে। আর পাবেন সীমাহীন সহানুভূতি।

☛ আমাদের অক্ষমতা আমাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে।

শেষজীবনে যদি কোন কারণে দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়েন তাহলে দুঃখ করবেন না। অনেকেই অন্ধ হতেই পারেন। এতে দুঃখ পাওয়ার কী আছে? ইংরেজ কবি মিলটন সারাজীবন অন্ধ ছিলেন। অন্ধকবি হোমারের কথা ভাবলে কারও দুঃখ থাকা উচিৎ নয়। বিল্বমঙ্গলের নামতো শুনেছেন। তিনিওতো অন্ধ হয়েছিলেন।

অনেক অন্ধ গায়ক ভালই আছেন। আমার দাদামশাই অন্ধ অবস্থায় থেকে শেষজীবনে কোনরূপ অসুবিধাবোধ করেননি। সামান্য একটু মানসিক ব্যথা পেলেও তিনি পরিবারের সহানুভূতি পেয়ে এবং হাতপায়ের আটকলে সাধারণভাবেই জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। আবার এটাও জানবেন— অন্ধ হয়ে গেছেন বলেই আপনি শারীরিক সুস্থ আছেন। তাছাড়া এটাও ভাবতে হবে— আমাদের অক্ষমতা আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে। অর্থাৎ অক্ষমতা দ্বারা **(১) লোকের সহানুভূতি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। (২) কোন দায়িত্ব কেউ ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় না। (৩) শরীরের এক অঙ্গ অক্ষম থাকলে অন্য অঙ্গ বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। অনেক অন্ধ ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধি-স্মরণশক্তি ও সংগীতের ক্ষমতা প্রকটরূপে দেখা যায়। (৪) অন্ধ গায়ক হলে কোন ফাংশানে সহজে চান্স পেতে পারেন এবং সহজেই মানুষের সহানুভূতির অধিকারী হতে পারেন।**

☞ **বৃদ্ধবয়সে পুত্র-পত্নী অথবা স্বামী বা স্ত্রীর শোকে কাতর হবেন না,** কারণ শোক তাপ সবারই জীবনে রয়েছে। যে যতবড়ই মানুষ হোক না কেন— কোন না কোন প্রিয়জনের বিচ্ছেদ সহ্য করতে হয়েছে তাকে। ইন্দিরা গান্ধীর পরিবারে একের পর একজনের মৃত্যুকাহিনি তো জানেন? আসলে জ্বালা-যন্ত্রণা আপনার একার নয়— আমাদের সকলের।

☞ **অর্থের প্রাচুর্য নেই বলে বুদ্ধি হারাবেন না, সন্তুষ্ট থাকতে হবে।** আপনার চেয়ে যারা বড় তাদের দিকে তাকাবেন কেন? যারা আপনার চেয়ে নীচের স্তরে আছেন তাদের কথা চিন্তা করুন। তাতে অশান্তি হবে না। আপনার যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন। অশান্তির সংসারে মাংস খাওয়ার চেয়ে শান্তিপূর্ণ সংসারে ডাল ভাত খাওয়া অনেক সুখের, অনেক তৃপ্তির। ভগবান গরু-ছাগলকে যা দিয়েছেন তা খেয়েই তারা হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছে। আপনার-আমার প্রতি তারা রাগ করছে না। তারা আরামেই জাবর কাটছে। আমরা তবে ভালমন্দ খেতে পাই না বলে ব্যথায় ভেঙে পড়ব কেন? আদিবাসী অথবা ভিক্ষুকদের সংসার দেখুন— তারা কেমন স্বাধীনভাবে সুখেই রয়েছে।

☞ **রোগ-শোক-অসুখে বিসুখে নিজেকে পাজল্ড করবেন না**— রোগ সবারই শরীরে রয়েছে— থাকবেও। নীরোগ কেউ নন। খোঁজ নিয়ে দেখুন না— পৃথিবীতে কে নীরোগ! সবার কিছু না কিছু কম বেশি অসুখ আছেই। রামকৃষ্ণেরও ক্যান্সার হয়েছিল। বিদ্যাসাগর দু'বছর দুরারোগ্য আমাশাতে একেবারে শয্যাশায়ী হয়েছিলেন। কার্ল মার্কস— লেলিনের একটানা রোগভোগের কথা যদি জানতেন তাহলে আপনি নিজেকে সুখী ও ভাগ্যবান বলে মনে করবেন।

☛ **জীবনে যা ঘটবে তা কপালের লিখন বলে মনে করবেন।** 'যদ্ভাবী ন তদ্ভাবী ভাবী ভাবী চেদ্ তদন্যথা'— যা ঘটবার ঘটবে— তা কোনদিন অন্যথা হবে না। এমনকী শত চেষ্টা করেও তা রোধ করা যাবে না। শ্রীমা সারদামণি বলেছিলেন—কারো কপালের লিখন যদি 'ঠ্যাং ভাঙা' থাকে সে সাবধানে থাকলে এবং ভগবদভক্ত হলে পায়ে কাঁটা ফুটে শোধ হতে পারে। তবে মৃত্যুলিখন থেকে রেহাই পাওয়া দুঃসাধ্য। তাই বিপদে গালে হাত দিয়ে বসবেন না। বিপদ এলে তার প্রতিকার করা কর্তব্য। তাতে যা হবার হবে। ভালও হতে পারে আবার খারাপও হতে পারে।

☛ **বয়ঃপ্রাপ্ত হলেও সর্বদা চিন্তা ও কাজে প্রফুল্লতা আনা দরকার।** তাতে নরক স্বর্গে পরিণত হবে। সংসারে কাকেও খারাপ বলা চলবে না। সকলকেই ভালবাসতে হবে। সেই সঙ্গে সর্বদা মনের মধ্যে চিন্তা রাখতে হবে— জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হল আপন জনের কাছ থেকে এবং উপকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে অকৃতজ্ঞতা লাভ করা। যীশুখ্রীষ্ট ১১ জন রোগীকে রোগমুক্ত করে তাদের প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন। কিন্তু তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল একজন। তাই সংসারে আপনার উপকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কে কোথায় কেমন ভাবে কৃতজ্ঞতা দেখাল কি না দেখাল— এ নিয়ে না ভেবে বরং অকৃজ্ঞতার আশা করুন এবং মনকে প্রফুল্ল রাখুন। ভাল থাকবেন, সুখে থাকবেন, শান্তি পাবেন।

☛ **অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী হয়ে পরিবারবর্গকে হুকুম দিয়ে কথা বলবেন না।** কারণ কেউ কারো হুকুম তামিল করতে চায় না। বিশেষতঃ শয্যাশায়ী বৃদ্ধের হুকুম কেউ মানবে না। কারণ সংসারে তখন আপনার মূল্য কম। অবশ্য যদি ব্যাঙ্কে টাকা জমা থাকে তাহলে ব্যাপার আলাদা। তখন অনেকেই আপনাকে খাতির করবে। সহায়সম্বলহীন-অর্থহীন বার্ধক্যজর্জরিত মানুষদের ভাল মন্দ কোন হুকুমই কেউ মানবে না। হুকুম করে কথা বললেই প্রত্যুত্তর পাবেন ও সেই সঙ্গে অবহেলিত হবেন।

☛ **বার্ধক্যদশায় ভাগ্যে যদি আলুসেদ্ধ ভাত থাকে— তাহলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন।** ক্ষোভ প্রকাশ করে কোন ফল লাভ হবে না। সন্তুষ্ট মন নিয়ে খাওয়াদাওয়া করলে যাই খান না কেন, তাতেই সুস্থ থাকবেন। এটা জানবেন, ভালমন্দ খাবার খেলে আপনার শরীর খারাপ হবে— তাই ভাগ্যদেবী আপনাকে আলুসেদ্ধ দিয়েই ভাত খেতে বলেছেন। আসলে সন্তোষই সমস্ত সুখের মূল।

বাঁচতে গেলে অর্থ দরকার। কিন্তু সেই অর্থের দাস হলে শান্তি মিলবে না।

জীবন চালাতে অর্থ চাই। অর্থ ছাড়া একমুহূর্ত চলে না। ভোর থেকে রাত্রিতে

ঘুমানো পর্যন্ত অর্থ দরকার। অর্থহীন জীবন জীবনই নয়। সন্ন্যাসীদেরও অর্থ দরকার। তাই প্রত্যেকের অর্থ রোজগার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু লোক ঠকিয়ে অর্থ রোজগার করা উচিৎ নয়। তাতে লোকের মনস্তাপ পড়বে সেই প্রতারকের উপর। আবার অর্থ রোজগারের জন্য জঘন্যতম কাজ করাও উচিৎ নয়। কারণ অর্থ আমাদের সঙ্গে যাবে না। তবে কম অর্থ রোজগারের জন্যও ভেঙে পড়া চলে না। জীবন চললেই হল! তাই অর্থের ক্ষতিকে ক্ষতি না মনে করে সংযত থাকা দরকার। কারণ আপনি ঐ টাকা এই পৃথিবীতেই রোজগার করেছেন আবার এখানেই দিয়েছেন।

☞ **রামকৃষ্ণ বলেছিলেন—**

'যদি শাসন করতে চাও, তবে সকলের গোলাম হয়ে যাও। গোলাম হলে তবে তোমার শাসন মানবে, ভালবাসা যেকোন ভাষার আবরণেই থাকুক না কেন— মানুষ তা বুঝতে পারে।' তাহলে শান্তি লাভের জন্য আমাদের চিন্তা কেন? গোলাম হলেতো শান্তি মিলবে। বলুন হে ভগবান, আমি তোমার গোলাম।

☞ ভয় পেও না। কে বলে তুমি পাপিষ্ঠ! সাহসী হও— কাপুরুষেরা নিজেদের পাপী বলে থাকে। বীর কখনো পাপ করে না— মনে পাপচিন্তা আসতে দেয় না।

☞ **অহংকার-উপাধি ত্যাগ করলে শান্তি অবশ্যই পাবেন।**

☞ ভাঙতে পারে সবাই। গড়তে পারে ক'জন? নিন্দা করতে পারে সবাই কিন্তু ভালবাসতে পারে কে? তাই ঠাকুরের শরণাপন্ন হও, শরণাগতের ক্ষয় নেই— পাপ তাপ নেই। **শরণাগত ব্যক্তিদের ব্রহ্মশাপও ব্যর্থ হয়।** (রামকৃষ্ণ)

☞ মানুষ ঈশ্বরকে কি পুত্র-কন্যা কিংবা পিতা-মাতার মত ভালবাসেন? **আপনারা যখনই অর্থ, বন্ধু, পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নীর মত ভগবানকে ভালবাসতে পারবেন তখনই মুক্তি— তখনই শান্তি।**

☞ **ভগবানকে নিজের সত্ত্বা ভাবলে মৃত্যুভয় থাকবে না।**

যদি মনে করেন আমার মধ্যে ভগবান আছেন তাহলে মৃত্যুভয় কেন? যেখানে কেবল এক সত্ত্বা সেখানে ভয়ের স্থান কোথায়? যদি আমার মাথায় বজ্রপাত হয়, আমিই সেই বজ্র, কারণ আমিই একমাত্র সত্ত্বা। যদি ব্যাঘ্র আসে, ভাবতে হবে আমি সেই ব্যাঘ্র। যদি মৃত্যু আসে, আমিই সেই মৃত্যু। আমি জন্ম-মৃত্যু দুইই। আমরা দেখছি যে বিশ্বে দু'টি সত্ত্বা আছে— এধারণা ভয় থেকেই আসে। পরস্পরকে ভালবাসো— কিন্তু কিজন্যে ভালবাসব? কারণ তারা ও আমি এক। **এই একত্বভাব অনুভব করাই—** মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও ভালবাসার কারণ। পদতলবিহারী ক্ষুদ্র

কীট থেকে উচ্চতম জীব পর্যন্ত সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন শরীর আছে কিন্তু তারা সকলেই এক আত্মা। সকল মুখ দিয়েই তুমি খাও; সকল হাত দিয়েই তুমি কাজ কর; সকল চোখ দিয়েই তুমি দেখো। লক্ষ লক্ষ দেহে তুমি খাদ্যসুখ উপভোগ করছ, লক্ষ লক্ষ শরীরে তুমি ব্যাধি যন্ত্রণা ভোগ করছ। যখন এই ভাব আসে তখনই ভয় কেটে যায়, তখনই দুঃখের নিবৃত্তি হয়। জগতের উপর পূর্ণ প্রেম হয়, সেই অবিনাশী সর্বজনীন সহানুভূতি, সর্বজনীন প্রেম, সর্বজনীন সুখ মানুষকে সর্বশক্তির উপরে তুলে ধরে। এর কোন প্রতিক্রিয়া নেই— কোন দুঃখ একে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু জগতের পানভোজন, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অহংভাব সর্বদাই একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এর হেতু এই দ্বৈতবাদ— বিশ্ব থেকে— ভগবান থেকে আমি পৃথক। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা উপলব্ধি করতে পারব— **আমিই তিনি,** আমি বিশ্বের আত্মা, আমি চিরসুখী, চিরমুক্ত, তখন আসবে প্রকৃত প্রেম, চলে যাবে সব ভয় এবং অবসান হবে চিরদুঃখের।

ঈশ্বর নিজে অনন্তনাম নিয়ে স্থূলভাবে প্রকাশিত। তুমি যে ব্যক্তি এর চেয়ে তোমার নাম অনন্তগুণ শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর অপেক্ষাও ঈশ্বরের নাম বড়। এর প্রমাণ, সত্যভামা একবার কৃষ্ণকথাটি একটি পত্রে লিখে দাঁড়িপাল্লার একদিকে চাপিয়ে অন্যদিকে কৃষ্ণকে বসিয়েছিলেন। এতে কৃষ্ণনামের দিক ভারী হয়েছিল।

☛ সবাইকে ভালবেসে সবার মধ্যে তাঁকে অনুভব করাই ঈশ্বর দর্শন।

হজরত, রামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, কবীর, নানক সবারই জীবনালেখ্য পড়ে দেখেছি— ঈশ্বর বা ভগবানকে পৃথকরূপে দেখা সম্ভব নয়। পৃথিবীর সমস্ত জীবের মধ্যেই তিনি ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। তাই কাউকে পর না ভেবে সকলের সঙ্গে নিজেকে হারিয়ে যেতে পারলেই ঈশ্বর করুণা লাভ করা যায়। আর তাতেই শান্তি। স্বার্থবোধ থাকলে কিন্তু সকলের মধ্যে নিজেকে হারানো যাবে না। কে কোথায় স্বার্থত্যাগ করল বা না করল, কৃতজ্ঞতা দেখাল বা না দেখাল সেকথা না ভেবে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে একাত্ম হতে হবে। তবে গায়ে পড়ে একাত্ম নয়, অনুভূতি, চেতনা আর বিবেকের দ্বারা তাদেরকে আপনজন ভাবতে হবে। এতটুকু স্বার্থ রাখলে চলবে না। প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা মোটেই থাকবে না। মনের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ভয়ের লেশমাত্র থাকবে না। হিংসা আর ঈর্ষা কি বস্তু তা মনেই আসবে না। হৃদয়ে তখন বয়ে চলবে অনন্ত প্রেমের প্রস্রবণ। ঈশ্বর যদি স্বার্থপর হতেন তাহলে ইচ্ছা করলেই তো ভাল ভাল লোকগুলোকে নিয়েই মেতে থাকতেন। সবাইকে সমানভাবে বাঁচিয়ে রাখতেন না। তিনি যেহেতু সবাইয়ের মধ্যে অবস্থান করে

আছেন সেইহেতু **সবাইকে ভালবেসে সবার মধ্যে তাকে অনুভব করাই ঈশ্বর দর্শন**। আর সেটাই সুখ, সেটাই শান্তি। এইভাবে সর্বশক্তি দিয়ে সর্বভূতের কল্যাণে নিজের জীবনকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে ছেড়ে দেবার একটা অদ্ভুত প্রেরণা, একটা মনোবল— এ যার হয়েছে তিনিই শান্তিলাভ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও শ্রীমার এরকম হয়েছিল। সর্বকালে-সর্বদেশে যারা চিহ্নিত পুরুষ বলে পূজিত হয়ে এসেছেন— তাদের প্রত্যেকের এই ভাবটি এসেছিল— কাউকে পর বলে না জানা।

আসল কথা কি জানেন— এই বিশ্বব্রহ্মান্ড হচ্ছে ঈশ্বরের একটি রূপ। স্বামীজিও একই কথাই বলেছেন। এটা দেখার মত যার চক্ষু আছে তিনি ভগবৎ দর্শন করেছেন। তবে এই ভগবান কখনো-কখনো নরদেহ ধারণ করে মানুষকে দেখা দেন নিজের তৃপ্তির জন্য। শুধু নিজের তৃপ্তি নয়— যে তাকে আকাঙ্ক্ষা করে তারও তৃপ্তি। কে না চায়— অপরের সোহাগ, ভালবাসা আর অন্তরঙ্গতা? প্রতিটি জীবই চায় আপন সোহাগকারীর সাথে মিলিত হতে।

সবশেষে আবার বলছি শান্তি পেতে হলে (১) **সহিষ্ণুতার অধিকারী হতে হবে**। (২) **বিশ্বব্রহ্মান্ডে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে ফেলতে হবে**। (৩) **ঈর্ষা-রাগকে মনে পুষে রাখা চলবে না**। (৪) **সকলের প্রতি থাকবে অনন্ত সহানুভূতি**। (৫) **স্বার্থভাবকে দিতে হবে জলাঞ্জলি**।

তবে আরো একটা চিন্তার বিষয় আছে। ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান ভেবে সবার সাথে মাখামাখি করবেন না। মন্দলোকের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়। বাঘের ভেতরেও নারায়ণ আছেন। তাবলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। যদি বলেন, বাঘতো নারায়ণ, তবে পালাবো কেন? তারও উত্তর আছে। যারা বলছে— পালিয়ে এসো, পালিয়ে এসো— তারাও তো নারায়ণ। এক নারায়ণ তো সাবধান করছেন।

শাস্ত্রে আছে— অপঃ নারায়ণ, মানে জল নারায়ণ। কিন্তু কোনো জল ঠাকুর সেবায় চলে আবার কোন জলে আঁচানো, বাসন মাজা, কাপড় কাচা। কিন্তু খাওয়া চলে না। তেমনি সবলোককে ভালবাসবে, সমান চোখে দেখবে কিন্তু সবার সাথে মিশবে না। কারো সাথে কেবল মুখের আলাপ পর্যন্ত চলে, আবার কারো সাথে তাও চলে না। তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হয়।

তবে দুষ্টলোকের কাছে ফোঁস করে ভয় দেখাতে হয়। ফোঁস না করলে কেউ মানবে না। (রামকৃষ্ণ)

☞ **বিবেকানন্দ বলেছেন—**

সারা জীবনে যাই করুন শেষ জীবনে সমদর্শী হওয়াই বিধেয়। কাজ করার ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করবেন কিন্তু মন রাখবেন ভগবানের প্রতি। **ভগবানকে যদি কৃষ্ণরূপে দেখেন তাহলে কৃষ্ণতেই মন দেবেন আর যদি বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত— এটা অনুভব করতে পারেন তাহলে সেই বিরাটত্বেই মন দেবেন।** স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূকে স্নেহ করবেন কিন্তু মনে জানবেন তারা কেউ নয়।

রামকৃষ্ণও ঠিক একই কথা বলে গেছেন · বড় মানুষদের বাড়ীতে দাসী সব কাজ করছে কিন্তু মন পড়ে আছে তার দেশের নিজের বাড়ির দিকে। সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলে মনে করে। বলে, আমার রাম, আমার হরি কিন্তু মনে বেশ জানে এরা আমার কেউ নয়। **কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায় কিন্তু তার মন পড়ে থাকে ডাঙায়— যেখানে তার ডিমগুলি রয়েছে।**

কেউ কেউ বলেছেন, জীবনে শান্তি পেতে হলে একমাত্র অনাসক্তি দরকার। আপন-পর ভেদ জ্ঞান দূর করে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত ঈশ্বরের ছবি মনের মধ্যে ধারণা করতে হবে। প্রতিটি মানুষের মুখে, গাছের পাতায় পাতায়, প্রতিটি জীবের মধ্যে, প্রত্যেকটি তৃণে, আকাশ-বাতাস-সাগরের জলে, শশী-তারকায়-তপনে ঈশ্বরের প্রতিফলন দেখতে হবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বনপ্রদেশে ভ্রমণ করতে করতে বলেছিলেন, আমি বৃক্ষের প্রতিটি পাতায় অখিল মাতার হাতের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও কৃষ্ণ অভিসারে বেরিয়ে পথে-ঘাটে-বৃক্ষলতায় শ্রীভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন।

☞ **রামকৃষ্ণ আরো বলেছেন—** ঈশ্বরের পরিব্যাপ্ততা সব জীব গ্রহণ করে ভাবাবেগে আবিষ্ট হতে পারবে না। এটা অতি উঁচু ধরণের ভগবৎ চিন্তা। সবচেয়ে সহজ পন্থা হল— ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতা ছাড়া সাধারণের ভগবৎ দর্শন সম্ভব নয়। ব্যাকুল হয়ে কাঁদো। ছেলের জন্যে, স্বামীর জন্যে লোকে কাঁদে। টাকার জন্যে লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। প্রেমিকার জন্য প্রেমিক আকুল-ব্যাকুল হয়ে কেঁদে আত্মহত্যাও করে ফেলে। **কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কোথায় কেঁদেছে?** তাকে কেঁদে কেঁদে ডাকো— শান্তি পাবেই পাবে।

সুখ পেতে হলে আমাদের প্রয়োজন 'সন্তোষ'। মানুষের চাহিদার সীমা-পরিসীমা নেই। আর চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে মনের অতৃপ্তিও বাড়তে থাকে। তবে অতৃপ্তির যে মূল্য নেই তা কে বলল? বর্তমান সভ্যতার গগনচুম্বী বিজয়সৌধ

এই অতৃপ্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবুও 'সন্তোষ' দরকার। মনের শান্তির জন্য চাই সন্তোষ। উপযুক্ত শিক্ষা আর সংযম দিয়ে মনকে এমনভাবে তৈরী করা উচিৎ যে, যে অবস্থায় থাকি না কেন মনের স্বাচ্ছন্দ্য এবং আনন্দ যেন কিছুতেই নষ্ট না হয়।

☞ **ভগবান যদি নাই থাকেন তাহলে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করার আকুলতা তাঁর কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন কেন?** 'সেইখানেতে চরণ তোমার রাজে', 'গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে', 'তিনি গেছেন— যেখানে তারা খাটছে বারো মাস'। 'অন্ধকারে আছেন তিনি আমাদের এই ঘরে', 'তোমার আসন পাতব কোথায় হে অতিথি'— এছাড়া গীতাঞ্জলির পাতায় পাতায় কেন ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়েছিলেন? তাই বলছি, ভগবান প্রচ্ছন্নভাবে আছেন— আপনার আমার সামনে। বিশ্বাস করতে হবে— দেখতে চেষ্টা করতে হবে— অনুভব করতে হবে।

☞ **মানুষের অন্তরই শান্তির বা আনন্দের জন্ম দেয়।** ভদ্রতা-শিষ্ঠাচার মনকে শান্ত করে। মানুষেরই ভয়ে মানুষ আজ কম্পিত। কারণ তাদের মধ্যে ভদ্রতা শিষ্ঠাচার আর বিবেকের অভাব। মানুষ বড় আত্মকেন্দ্রিক। অপরকে হেয় করা, অপরকে হিংসা ও ঈর্ষা করা তার কাজ। তাই আজকাল মানুষের চেয়ে বাঘ অনেক ভাল। কারণ একটা বাঘ আর একটা বাঘের ভয়ে কম্পিত হয়নি। বাঘ বাঘকে ঈর্ষা বা ঘৃণা করেনি। তাই মানুষকে বিবেকবান হতে হবে— সহৃদয় হতে হবে। আমরা পারস্পরিক ঘৃণা-অবজ্ঞা আর পরশ্রীকাতরতার দ্বারা নিজেদের অন্তরকে কলুষিত করছি। আমরা ইচ্ছা করলেই আমাদের অন্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

☞ **আপনার চরিত্র মানুষকে যদি ভাল লাগাতে চান তাহলে স্বচ্ছ সরোবরের মত মন করতে হবে।** রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ ভরা পৃথিবী আর মানুষকে আপনি নিজেকে যদি ভাল লাগাতে চান তাহলে স্বচ্ছ সরোবরের মত মন করতে হবে— যে মনের ওপরে কেউ নখচিহ্ন বা পদচিহ্ন আঁকতে পারবে না। গ্রীষ্মের তপ্ত রৌদ্রও তাকে ক্ষিপ্ত করতে পারবে না। যদিও দুরন্ত কালবৈশাখী নৃত্য করে সেই স্বচ্ছ সরোবরের বুকে, তাতে সে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হবে—কল্লোলিত হবে তথাপি তার শান্তরূপময়তা সে হারাবে না। ঝড় শেষ হলে— বৃষ্টির তীক্ষ্ণ শরপতন শেষ হলে সে তৎক্ষণাৎ শান্তরূপ ধারণ করবে।

শান্ত মন সহসা উড়ে যেতে পারে বায়ুর তরঙ্গে— দেখে নিতে পারে জীবনের উৎসভূমি আর ঘন নীল চোখের ভেতর যেখানে নীল নীল সারি সারি দীপ সাজানো রয়েছে। দূরে-বহুদূরে সে দিতে পারে পাড়ি। স্বচ্ছ সরোবর যেমন হাওয়ার ভেতর ঢুকে পল্লবে পল্লবে মর্মরিত হতে পারে— দূরের অরণ্যে— মাঠের সবুজ

ঘাসে— পাহাড়ের গায়ে— পাদদেশে— শিশিরের রঙে রঙে রামধনু হতে পারে আবার ফিরে আসে আপনস্থানে। চির আনন্দে— চিরশান্তিতে থাকে সে। তাই আমাদের মনকে স্বচ্ছ সরোবরের মত করতে হবে।

☞ **শ্মশানে বই উপদেশ দেয়। বইকে বন্ধু করুন।**

মানবজীবনে কিছুটা শান্তি পেতে বই পড়া অভ্যাস রাখা দরকার। বিপদের দিনে বইয়ের ভাষা আপনাকে সান্ত্বনা দেবে। উৎসবের দিনে বইয়ের ভাষা আপনি আবৃত্তি করবেন। ঈশ্বরচন্দ্র বই পড়ে বিখ্যাত হয়েছেন। বই পড়েই মানুষ মন্ত্রীত্বের যোগ্যতা অর্জন করে। বই আপনাকে শুধু দেবে— নেবে না কিছুই। শ্মশানকালেও বই উপদেশে দেয়—

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।।

মানুষের জীবনে কৈশোর থেকে যেমন যৌবন আবার যৌবন থেকে যেমন প্রৌঢ়— তারপর বার্ধক্য আসে তেমনি মৃত্যুও জীবনের একটি অধ্যায়।

☞ **প্রসারিত বিশ্বদৃষ্টি দিয়ে চারিদিক দেখলে নিজেকে সুখী মনে হবে।** আপনি যদি নিজের সামান্য অসুখে দুঃখবোধ করেন তাহলে বিভিন্ন হাসপাতালে গিয়ে দেখতে হবে— মানুষ কী রকম যন্ত্রণায় ভুগছে। তখন নিজেকে সুখী মনে হবে। নিজেকে যদি গরীব দুঃস্থ বলে মনে হয় শহরের বস্তি এলাকাগুলো ঘুরে দেখে আসুন। মানুষ কেমন জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও কষ্টে বসবাস করছে। ঘরে বসে নিজের ভাগ্যকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

☞ **সংসার একটি ভয়ংকর অরণ্য।** সেখানে যাবতীয় জন্তু বাস করে। আপনি সেই সংসারে যখন বার্ধক্যের দিকে যাবেন তখনই সেখানে আপনি হবেন নিকৃষ্ট প্রাণী। পুত্র ও পুত্রবধূর দয়াতে খেতে পাবেন। কারো উপরে আপনার কোন কথা বলা চলবে না। আর বাঘ সিংহরা আপনার সাথে মেলামেশা করতেও আসবে না। এটা চিরদিনের কথা। তাই দুঃখ করে কোন লাভ নেই।

☞ **আজকাল কেউ কারো মনের কথা বুঝতে চাইছে না।**

আমরা এখন একনম্বর স্বার্থপর। ব্যক্তিগত স্বার্থছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এখনকার এই আত্মকেন্দ্রিক সমাজে আমরা যদি কেউ কারো মনের কথা বুঝতে সচেষ্ট হই তাহলে আমাদের স্বার্থত্যাগী হতেই হবে। অপরের মনের কথা বুঝতে পারা মানেই চেতনাবোধের অধিকারী হওয়া। তাদের সুখ-দুঃখের সমব্যথী হওয়া। স্ত্রী পুত্র নিয়ে তখন আর আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করা যাবে না। আবার খালি হাতে কাউকে সমবেদনা দেখানো যায় না। প্রতি

পদক্ষেপ অর্থ দরকার। এই অর্থ খরচের ভয়ে আমরা আত্মীয় পরিবার বর্গের মনের কথা জানতে বা বুঝতে চেষ্টা করছি না।

☛ **বাঁচার জন্য বাঁচতে হবে।** জীবনবীমা করে নিজের মঙ্গলের জন্য। কিন্তু মেয়াদী পলিশি করে প্রিমিয়াম দিতে দিতে বিরক্ত বোধ করে মানুষ। সেই রকম আজকাল বাবা-মাকে দীর্ঘদিন অর্থ দিতে অনেকেই বিরক্ত বোধ করে। জীবনের এটাই ট্র্যাজেডি। **জীবনবীমার মত দীর্ঘদিন ধরে মা বাবাকে আর প্রিমিয়াম দিতে চাইছে না কেউ।** তাই ছেলে নাই ভালবাসুক তথাপি নিজের জন্য নিজেকে ভালবাসতে হবে। এমনই ঝামেলাপূর্ণ আজকের জীবন।

☛ আজকের আত্মকেন্দ্রিক সংসারে আপনাকে যাতে বৃদ্ধাশ্রমে না যেতে হয় সেজন্য ব্যাঙ্কে প্রথম জীবন থেকেই টাকা গচ্ছিত রাখুন। টাকা থাকলে আপনার সেবাযত্ন করার লোকের অভাব হবে না। তাই বাড়ী ছেড়ে যাতে কোথাও যেতে না হয় সেজন্য আজই ব্যাঙ্কে, পোস্টঅফিসে টাকা জমান। কারণ টাকা এযুগের পরমেশ্বর। সারাজীবন ধরে সংসারে উদাসীনতা দেখালে পরিণামে ভুগতে হবে। ব্যাঙ্কের পাশ বই হবে আপনার শেষ জীবনের সাথী যেমন ধর্মগ্রন্থ— গীতা অথবা কোরাণ।

☛ **জীবন যদি অর্থহীন বা বর্ণহীন হয় তাহলে কী আত্মহত্যা করবেন?** না, তা করবেন না। নিজের আনন্দে নিজে মত্ত থাকুন, মানুষকে কাছে ডেকে কথা বলুন। চলার পথে পা ক্ষতবিক্ষত হলে মানুষ পান্থশালায় আশ্রয় নেয়। পাখীর পালক ঝরে গেলে সে মৃত্যুর নীড় খুঁজে নেয়। সব স্বপ্ন— সব কল্পনা— সব রঙ— সব সত্য মিথ্যা হয়ে গেলে মানুষের উদাসীন জীবন শূন্যের মাঝে উৎসের সম্মুখীন হয়। তেমনি সব শব্দ অর্থহীন হলে এ জীবন তখন ঘর খুঁজে নেয়। ঘরে বসে ঈশ্বরের ধ্যানে জীবন কাটাতে হয়।

☛ **আপনার প্রচুর বিষয় বৈভব। আপনজন বলতে কেউ নেই।** প্রতিবেশিরা দল পাকাচ্ছে ঐ বিষয়সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্যে। আপনাকে অনেকেই ভয় দেখাচ্ছে। আপনি কোনমতেই শান্তি পাচ্ছেন না। এখন কী করবেন! নিজের প্রয়োজনমত অর্থসম্পদ রেখে বাকীটা দান করে দিন। অথবা কোন এক ব্যক্তিকে দত্তক নিয়ে তাকে সমস্ত সম্পদ উইল করুন। তবেই শান্তি পাবেন। **দানেই শান্তি।** রৌদ্র নিজেকে চতুর্দিকে বিলিয়ে দিয়েই শান্ত, মেঘ সব বৃষ্টি দিয়েই ক্ষান্ত, বায়ু ঝড় হয়ে সর্বত্র উন্মাদ করেই ক্লান্ত, আর জঙ্গল পুড়ে গেলেই তার ভয়ংকরতা হয় ক্ষান্ত। তবে আপনি অশান্তিতে ভুগবেন কেন?

☛ **আনন্দ কোনমতেই খুঁজে পাচ্ছেন না**— অথচ প্রচুর বিভব আছে আপনার। কি করে আনন্দ পাবেন?

(১) **উৎসবের আয়োজন করে লোকজনকে খাওয়ান।** মানুষের হাসিকান্না, কোলাকুলি, নদীর কলতান, ঝর্ণার গান শুনতে থাকুন একমনে। পথ চলার মাঝে লতাপাতার স্পর্শ ও ফুল-ফলের প্রাচুর্যের মধ্যে আনন্দ লাভ করুন।

(২) স্ত্রী না থাকলে নতুন করে বিবাহ করুন— সন্তানের জন্ম দিন। বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে আহ্বান করুন। তাদের সাথে গল্পের আসর জমান। মাঝে মাঝে টিফিনের ব্যবস্থা রাখুন।

(৩) নাতিনাতিনীদের নিয়ে মেতে থাকুন।

(৪) রাজনীতি-গান-কীর্তন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারেন।

☞ **নিজেকে যদি অপরাধী বলে মনে হয় তাহলে অনুশোচনা করা দরকার।**

অনুশোচনা দ্বারা মন নির্মল হয়. অনুশোচনাই পাপের নিবৃত্তি। কুকর্মকারী ব্যক্তি দান করে শুদ্ধ হয়, নদী শুদ্ধ হয় স্রোতের দ্বারা, বায়ুর দ্বারা হয় পথ শুদ্ধ, দ্রব্য শুদ্ধ হয় মাটি ও জলে এবং দ্বিজ শুদ্ধ হয় সন্ন্যাসে। বেদবিদরা তপস্যায়, পাপীরা জপ আর অনুশোচনায় এবং মন শুদ্ধ হয় সত্যে। এই পঞ্চভূতের দেহ শুদ্ধ হয় জ্ঞানে। আর ঈশ্বরজ্ঞানে সমস্ত মানুষের তথা জীবনের বিশুদ্ধি। তাই অপরাধ করেছেন বলে ভয় কেন? ঈশ্বরের সাথে আত্মীয়তা করতে হবে। অন্তর দিয়ে অনুশোচনা করে অন্তরতমকে মনের কথা জানাতে হবে। তাকে ভালবাসতে হবে। তাতেই হবে অপরাধের নিবৃত্তি।

☞ **অর্থ রোজগার আর সংসারপালন ইচ্ছায় হয় না।** তাহলে সবাই ইচ্ছে করলে প্রচুর টাকা উপার্জন করতে পারত। প্রচুর অর্থ রোজগারের বাসনা সবারই আছে। কিন্তু ক'জন পারে? অর্থ লাভ হয় পূর্ব কর্ম থেকে। পূর্ব কর্ম আর বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। কিন্তু ইচ্ছা ও বস্তুর মধ্যে এতটুকুও সম্বন্ধ নেই। কেউ কি বলতে পারে ইচ্ছা করলে প্রভূত অর্থ আজই অর্জন করতে পারবে। ইচ্ছা করলেই কী ধনী হওয়া যায়? না, তা হওয়া যায় না। ইচ্ছার সঙ্গে বস্তুর কোন সম্পর্ক নেই। পূর্বকৃত কর্মই ভাগ্য আনয়ন করে। পূর্বকৃত কর্মকে ভাগ্য আর বর্তমান কর্মকে পুরুষার্থ বলে। কিন্তু ইচ্ছার সাথে পরমাত্মা বা ভগবানের সম্পর্ক বিদ্যমান। পরমাত্মাকে পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা হলে তাকে পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রবল ইচ্ছায় অর্থ পাওয়া যাবে না। কারণ বস্তুর সাথে আমাদের বিচ্ছেদভাব আছে। বস্তু আমাদের থেকে দূরে কিন্তু পরমাত্মা দূরে নন। পরমাত্মা বা ঈশ্বর আমাদের সাথে সাথে ঘুরছেন।

● **সংসার জীবনে যে আনন্দের স্থায়িত্ব নেই সে আনন্দ আনন্দই নয়।**

শৈশবে খেলনা ভাল লাগে— যৌবনে ভাল লাগে না। যৌবনে প্রিয়া ভাল

লাগে, পুতুল খেলা নয়। কিন্তু বাল্য-কৈশোর ও যৌবনে ঘুম সবার ভাল লাগে। যখন খেলনা ভাল লাগত তখন ঘুমও ভাল লাগত। যখন স্ত্রীপুত্র ভাল লাগত তখন ঘুমও ভাল লাগত। কিন্তু যখন গভীর ঘুম লাগে তখন স্ত্রী-পুত্র-খেলনা কিছুই ভাল লাগে না। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরাও রাতে ঘুম ত্যাগ করতে পারে না। সকল পরিস্থিতিতেই ঘুম ভাল লাগে। রাত্রে যাতে ভাল ঘুম হয় সেজন্যে পাখা টাঙানো হয়, মশারি খাটানো হয়। যখন ঘুম পায় নানাবিধ সুখাদ্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য— কোনকিছুই ভাল লাগে না। এতে প্রমাণ হয় ঘুম আমাদের সকল বস্তুর চেয়ে প্রিয়। **ঘুমের জন্য সবকিছুই ত্যাগ করা যায় কিন্তু কোনকিছুর জন্য ঘুম ত্যাগ করা যায় না।** কেবলমাত্র ভগবতভজনে এমনই প্রেম জন্মায়, এমনই আনন্দ জন্মায় যখন ঘুমও ভাল লাগে না— ঘুমও ত্যাগ করা যায়।

ঘুমের সময় সকলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু সংসারের সঙ্গে স্বীকৃত সম্বন্ধকে আঁকড়ে থেকে ঘুমানো হয় বলেই জেগে গিয়ে তাতেই আমাদের মেতে উঠতে হয়।

সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শুধু সেবা করার জন্যে। পরিবার প্রতিপালন ছাড়া সংসারের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। মা বাবার সেবা করতে হবে, স্ত্রী-পুত্রের পোষণ করতে হবে, ভাই-বোনের বিয়ে দিতে হবে— আরো কত কী! তথাপি শান্তি মেলে না। শান্তি মিলবে তাদের সেবার পর সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করলেই। সংসারের সাথে মেনে নেওয়া এমন কোন সম্বন্ধ নেই যার জন্য মানুষ ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রাও ত্যাগ করবে কিন্তু ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ জাগ্রত হয়ে গেলে নিদ্রাও ভাল লাগবে না, খাওয়া-দাওয়াও ভাল লাগবে না, ভাল লাগবে না শরীরের প্রতি মোহ। এতেই বোঝা যায় আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ ভগবানের সাথে। এটাই আমাদের বুঝতে হবে। তবে এজন্যে সাধু হতে হবে না, জঙ্গলে যেতে হবে না। কেবল এটি মেনে নিতে হবে যে এই সংসার বাস্তবে আমাদের নয়— কেবল ভগবানই আমাদের। ব্যক্তিদের সাথে আমাদের যে সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় তা তাদের সেবার জন্যে। বস্তুর সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়.তা হল সেগুলিকে অন্যের সেবায় লাগানোর জন্যে। মা-বাবার দেওয়া শরীর তাদের সেবায় নিয়োগ করতে হবে। এতে আনন্দ বা শান্তি কোথায়?

কিন্তু ভগবদানুভূতির আনন্দ প্রভূত শান্তি দান করে, চির আনন্দ দান করে। সাংসারিক যাত্রা-গান-মেলার যে আনন্দ সে সব অস্থায়ী। সংসারের আত্মীয় স্বজন নিয়ে আনন্দ অস্থায়ী। কেবল ভগবদানুভূতির আনন্দ চিরস্থায়ী। এই আনন্দে ডুবে থাকতে হবে আমাদের। তবে চিরশান্তি লাভ হবে।

☞ **সংসার যদি আপনার কাছে কসাইখানার মত মনে হয় তাহলেও ব্যথা পাবেন** না। কারণ সারা দেশ একটি কসাইখানা। শক্তিমানেরা দুর্বলদের হত্যা করছে, তিলে তিলে পেষণ করছে সারা দেশের মানুষকে। আপনার ধনসম্পদ ঐশ্বর্য থেকে আপনি যে বিচ্যুত হতে পারেন— তা কোন নতুন কথা নয়। সভ্যতার রক্তরঞ্জিত কসাইখানায় আজ কাক-শকুনের বিচরণ। নির্মমভাবে পশুহত্যা কসাই-এর বৃত্তি। বর্তমান সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির ধারক ও বাহকেরা কসাই-এর মত আজ গণহত্যায় মত্ত। আকাশ থেকে বোমা নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে গণহত্যার নতুন কৌশল আবিষ্কার করছে। নদীর জলে ব্যাধির জীবাণু মিশিয়ে নরহত্যার নারকীয় আয়োজনও এই সভ্যতার অবদান। ভেজাল ওষুধ বিক্রি করে অসুস্থ পৃথিবীকে করে তুলছে অধিকতর অসুস্থ। এক দেশ অন্য দেশকে আক্রমণের ভয় দেখিয়ে পরোক্ষভাবে বিক্রি করছে মারণাত্মক অস্ত্র। শ্রমজীবী মানুষদের রক্ত নিয়ে বুদ্ধিজীবীর দল মোটর হাঁকিয়ে সেই শ্রমজীবীদের করছে মোটরের চাকায় পিষ্ট। তাই আপনি সংসারে সর্বস্ব দিয়েও যে পিষ্ট হবেন— এতো সভ্যতার চিরদিনের কথা। এটাই তো জগতের নিয়ম। তাতে ব্যথা না পাওয়াই ভাল। এই নির্মম সত্যটাকে আনন্দের উপাদান বলে মনে করতে হবে।

☞ **সুখ-শান্তির চারটি স্রোতে গা ভাসান।**

(১) বন্ধুকে তো বন্ধু ভালবাসবেই। শত্রু মিত্র ভুলে সবাইকে যে ভালবাসতে পারে সেই যথার্থ প্রেমের অবতাররূপে চিহ্নিত। সে চিরসুখী।

(২) নারীর জন্ম শুধু বিলাপ আর আত্মহননের জন্য নয়, নিঃস্বার্থ সংসার সেবায় আত্মনিয়োগের মধ্যেই নারীজন্মের স্বার্থকতা। আর সেই নারীই সুখী।

(৩) সংসারকে স্বর্গ বানাতে হলে মনের কূপমন্ডুকতা পরিহার করে, ব্যক্তি স্বার্থের সংকীর্ণ সীমানা ছাড়িয়ে, নির্মল হৃদয়ে উন্নত শিরে উঠে দাঁড়াতে হবে। সত্যের শাশ্বত বাণীকে পাথেয় করে অপরের জন্য নিজেকে ত্যাগ করলে সংসার হয়ে উঠবে শান্তি ও আনন্দের অমরাবতী। এছাড়া শান্তির কোন পথ নেই।

(৪) আমাদের মনের সংকীর্ণতা দূর করতে হবে— পরস্পর ব্যবধানের প্রাচীর ভেঙে সংসার-সমাজকে আপন করতে হবে— আনন্দে গান গাইতে গাইতে জীবনের ঘূর্ণিপাকে, নদীবক্ষে ভাসমান জঞ্জালের মত ভেসে যেতে হবে এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে। তাতে দুঃখ আসবে— ক্ষতি কি। বিদ্যাসাগর-রামমোহন-সুকান্ত-বিবেকানন্দ-বঙ্কিমচন্দ্র— এরা কি জীবনে কম দুঃখ পেয়েছেন? দুঃখের সাথে পাঞ্জা লড়তে লড়তে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। লেনিন, কার্ল মার্কস, শ্রীচৈতন্য, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এদেরও শেষ জীবনে দুঃখের সীমা ছিল না।

☞ শেষ জীবনে সূর্যের মত চারদিক রাঙিয়ে যান— বিশ্বজগৎ আপনার মঙ্গল গান গাইবে।

সূর্য রক্তবর্ণ হয়ে উঠে আবার রক্তবর্ণ হয়ে পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়। সে যখন অস্ত যায় তখন তার লাল আভায় সারা আকাশ রঙিন হয়ে উঠে। তেমনি মানুষকে শেষ জীবনে এমন কাজ করতে হবে যাতে করে পরিবারবর্গ থেকে প্রতিবেশীবর্গ তাঁর গুণগানে মুখর হয়ে উঠেন। সেই কাজগুলি হচ্ছে—

(১) মানুষকে ভালবাসা।

(২) মানুষের সেবা করা। কাউকে অহেতুক কার্কশ্য প্রদর্শন না করা।

(৩) শক্তি ও সামর্থ থাকলে সমাজের-দেশের-দশের মঙ্গল সাধন করা। যেমন— পাড়ার মধ্যে পানীয় জলের অভাব হলে পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করা, নিরক্ষরদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা, গ্রামের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার যদি কেউ না থাকে তাকে সহযোগিতা করা।

(৪) গ্রামের মধ্যে উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

(৫) দয়া-মায়া-মমতার অধিকারী হওয়া।

(৬) ক্ষমাপরায়ণ হওয়া। ক্ষমা করা দেবধর্ম। কেউ কেউ ক্ষমা করাকে দুর্বলতা বলে থাকেন কিন্তু ক্ষমা মহৎ গুণ। ক্ষমার দ্বারা জগৎ বশীভূত হয়।

(৭) কেউ কোন ভাল কাজ করলে তার প্রশংসা করা।

(৮) সবাইকে আন্তরিকতা দেখানো। আমাদের আচার ব্যবহারের মধ্যে যেন আন্তরিকতা থাকে। আন্তরিকতা আচার স্বর্গসুখ দান করে।

(৯) কারো প্রতি খারাপ সমালোচনা না করা। ভুল কাজ করলে গোপনে ডেকে তাকে বুঝিয়ে বলা। জনসমাজে তাকে হেয় না করা।

তবে যা যুগ পড়ছে আপনি যতই পরের উপকার করুন আপনার অবর্তমানে কেউ আপনার প্রশংসা করবে না। যতদিন কিছু দিতে পারবেন ততদিন হয়ত কিছুটা ভালবাসা পাবেন তবে কৃতজ্ঞতা নয়। আপনার দেহপতনের সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। মানুষ এমনই বেইমান।

তবে নাই কৃতজ্ঞতা দেখাক আপনি মনের তৃপ্তি ও শান্তি নিয়ে দেহত্যাগ করতে পারবেন যা জগতে দুর্লভ। শান্তি ও তৃপ্তি নিয়ে চিরশান্তির দেশে গমন করা পরম গৌরবজনক ব্যাপার।

☞ বৃদ্ধ বয়সেই মানুষের কৃতকর্মের মূল্যায়ন ও পুরস্কারপ্রাপ্তি হয়। অবশ্য সাধারণ শ্রমিক চাষী বা খেটে খাওয়া বৃদ্ধ মানুষদের কথা বলছি না। সাধারণ বৃদ্ধরা নাতি নাতিনীদের নিয়ে সময় অতিবাহিত করুন। বাগান তৈরী করুন। গান

করুন। গানে গানে ভুবন ভরিয়ে দিন। বাঁচতে ভাল লাগবে। গ্রামের মানুষরা ধানের শিষে শিশিরবিন্দু দেখে কল্পজগতে পাড়ি দিন। নাতি নাতিনীদের গান শুনুন, গান শেখান, টিভি দেখুন। শিক্ষিত ও যোগ্য ব্যক্তিরা সরকারের সর্বশিক্ষা অভিযানে যোগ দিন। নাইট স্কুল খুলুন। ধর্মপ্রিয়গণ ধর্মালোচনা করুন। ছেলেদের জীবনমুখী শিক্ষাদান করুন। ভাল থাকবেন। সম্মান পাবেন।

☞ ধর্ম রক্ষা করুন। ধর্মপথে চলুন। বার্ধক্যে শান্তি পাবেন।

ধর্ম নিয়ে আলোচনা করুন। কর্মের অবসরে ধর্ম নিয়ে মেতে থাকুন। ঐ মাতামাতিই আপনাকে বার্ধক্যে শান্তিদান করবে। যৌবন কিংবা প্রৌঢ় থেকে ধর্মকে জড়িয়ে রাখলে কর্ম আপনাকে শুদ্ধ করবে। আর বিদ্যা শুধু ভেল্কি দেখানোর জন্য না হলে, শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য না হলে, অল্পবুদ্ধিদের ঠকানোর জন্য না হলে ক্রমশঃ মানুষকে সৎকর্মের মধ্য দিয়ে যথার্থ ধর্মের পথে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে।

বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়
শক্তি পরেষাং পরিপীড়নায়।
খলস্য সাধো বিপরীত মেতদ্
জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়।।

খলের বিদ্যা বিবাদের, ধন অহংকারের, শক্তি পরকে পীড়ন করার জন্যে। কিন্তু সৎলোকের বিদ্যা, দান ও রক্ষণের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারণ সেই বিদ্যায় ধর্ম আছে।

ধর্ম হচ্ছে যা আমাদের ধরে রাখে। ধর্ম আমাদের কর্তব্যবোধ ও ঔচিত্যবোধ শেখায়। ধর্ম আমাদের সকলের কল্যাণ করতে শেখায়। যে আচরণের দ্বারা সকলের কল্যাণ হয়— সেটাই ধর্ম। ধর্মের সারকথা সকলের হিতসাধন, মৈত্রী আর ভালবাসা।

বেদাহং জাজলে ধর্মং সরহস্যং সনাতনম্।
সর্বভূতহিতং মৈত্রং পুরাণং যং জনা বিদুঃ।। (মহাভারত)

— শোন জাজলি, আমি সনাতন ধর্মের রহস্য জানি। তা হল সর্বপ্রাণীর হিত আর মৈত্রী। এই ধর্মই প্রাচীন ও সনাতন। সকলে একেই ধর্ম বলে জানে।

ধর্মের মধ্যে কোন ভেদ নেই। আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টির জন্য ধর্মের ভেদ করে থাকি। ধর্মের পার্থক্য জমিতে আল দেওয়ার মত। একটু উপর থেকে দেখলে পুকুর-নদী-জমির আল যেমন একাকার দেখায় তেমনি উন্নত চিন্তা করে দেখলে ধর্মও এক এবং একাকার। সব নদী যেমন বিভিন্নভাবে একই সাগরে পড়েছে

তেমনি সব ধর্মই বিভিন্ন পথ দিয়ে একই সত্যে মিশেছে। পার্থক্য শুধু পথের— যা নিয়ে আমরা মারামারি করে থাকি।

সনাতন ধর্ম চির শাশ্বত পুরাতন ধর্ম। ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছর পূর্বে ধর্মের যে শাশ্বতরূপ আবিষ্কৃত হয়েছিল তা সনাতন ধর্ম। দীর্ঘকাল প্রচলিত ধর্মই সনাতন ধর্ম। যে ধর্মের মূলমন্ত্র একতা— সেটাই সনাতন ধর্ম। সনাতন ধর্ম কোন ধর্মকেই ঘৃণা করে না। মন্দির-মসজিদ-গীর্জা— কারো বা মূর্তি, কারো বা তাও নেই। কেউবা নানা উপাচার দিয়ে পূজো করে, কেউবা শুধুমাত্র প্রার্থনা করে। এইরকম বাইরের আচরণে প্রভেদ থাকতে পারে, আসলে কিন্তু সবই এক। শুধু প্রকাশের পার্থক্য মাত্র। এই জ্ঞান নিয়ে কর্ম করলে মানুষ উন্নত মার্গে উঠতে পারে। শান্তি পেতে পারে।

☛ **যথার্থ আনন্দ লাভ একা একা হয় না।** শুধু নিজের সুখ নিয়ে বেঁচে থাকলে আনন্দ লাভ হয় না। "আমার সুখে সকলের সুখ হোক— আমার শুভে সকলের শুভ হোক, আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হোক, আমি যা পাই, তা যেন পাঁচজনের সাথে মিলিত হয়ে উপভোগ করতে পারি— এই কল্যাণময়ী ইচ্ছাই আমাদের আনন্দ উৎসবের প্রাণ।" কারণ আমরা স্বরূপতঃ সকলে এক। একই আত্মা। তাই পাশের সকলে দুঃখিত থাকলে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করতে পারে না। পাশের লোকের বিপদে আমরা অনেকেই আনন্দিত হই বা সুখী হই ঠিক কথা— কিন্তু সেটা বাহ্যিক সুখমাত্র— অন্তর অন্যকথা বলে। এজন্যেই সার্বজনীন পূজার আয়োজন— দীর্ঘদিন ব্যাপী মেলার অনুষ্ঠান— আর রিজার্ভ বাসে ভ্রমণবিলাসীদের একত্রে দেশভ্রমণ, তীর্থভ্রমণ। একাতে সুখ নেই, বহুতেই সুখ। ভূমৈব সুখম্। সকলের মঙ্গল হোক, কল্যাণ হোক, সুখ ও আনন্দ হোক— এমন জীবনের কথাই মহাপুরুষরা বলে গেছেন। এমনকি ঈশ্বরানুভূতির আনন্দ লাভ ঈশ্বরকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে হয়।

দৈহিক সুখে কিংবা ইন্দ্রিয়ভোগে চিরন্তন আনন্দ নেই— এর পেছনে থাকে দুঃখ আর হতাশা। যথার্থ আনন্দ আছে পরের উপকারে, ত্যাগে, সকলের মঙ্গলের কাজে।

☛ **পবিত্র থাকার নিয়ম পালন করুন।**

(১) ছোট বড় আমরা একই মানুষ। সবাই-এর গতি মৃত্যুর দিকে— এটা বুঝতে হবে।

(২) মনসংযোগ অভ্যাস করতে হবে। সকাল-সন্ধ্যায় মনের গ্রহণ ক্ষমতা বাড়ে। সেই সময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে।

(৩) সকলের কল্যাণ কামনা করার ইচ্ছা থাকবে মনে।
(৪) মহামানবদের জীবনী পাঠ করা উচিৎ।
(৫) হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা মন থেকে মুছে ফেলতে হবে।
(৬) একাগ্রতা চাই।
(৭) সবশেষে পরচর্চা থেকে বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

● বার্ধক্য উপভোগ করার গোপন তথ্য ●

এ দেহটা দেবালয়স্বরূপ। দেহের ভেতরে দেবতা আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—

(১) ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। তাই দেবালয় বা দেহমন্দির নোংরা রাখা উচিৎ নয়। মানুষকে সর্বদা এটা বুঝতে হবে। ভাল কাজে বাধা বেশি আসবে। কারণ আমাদের প্রবণতা খারাপের দিকে যাওয়ার। হঠাৎ কিছু ভাল দেখলেই আমরা শঙ্কিত হয়ে পড়ি— কারণ আমাদেরকেও ভাল হতে হবে। তাই স্থিরভাবে ধৈর্যের সঙ্গে সংযমের মধ্য দিয়ে কাজ করতে হবে। ঐকান্তিকভাবে মন একমুখী করে ভেতরের চিন্তাটাকে কাজে রূপায়িত করার জন্য নিরলস চেষ্টা থাকলেই বাইরের বাধা কোনদিন কাউকে ঘিরে ধরবে না। তাতে সুখে থাকা যাবে।

(২) সর্বদা মহামানবদের জীবনকথা চিন্তা করুন। গীতা পাঠ করুন। কচ্ছপ যেমন ডাঙায় ডিম পেড়ে জলে থেকে তার চিন্তা করে তেমনি সর্বদা ভগবানের কথা চিন্তা করুন। ভগবান যা করবেন তাই হবে— এটা ভেবে আনন্দে থাকুন। আনন্দপূর্ণ স্বর্গধামের কথা কল্পনা করুন। ভগবানকে সর্বদা জানান— যেন সুস্থ অবস্থায় তোমার চরণে ঠাঁই পেতে পারি।

(৩) স্মরণ রাখবেন— জীবনটা একটা রঙ্গমঞ্চ। অভিনয় শেষ হলে গ্রীনরুমে চলে যেতে হবে। বার্ধক্যে সর্বদা এটা ভাবুন।

(৪) জীবনের শেষ দিকে যাতে অসহায় বলে মনে না হয় সেজন্য গানবাজনা, রাজনীতি বা ধর্মালোচনাকে জীবনের সখ করে রাখুন।

(৫) সংসারে বৃদ্ধবয়সে কারো প্রতি অভিমান করা উচিৎ নয়। কেউ তখন অভিমানের মর্যাদা দেবে না। প্রচুর সম্পদ থাকলেও বার্ধক্য দশাকে সংসারের ভাল লাগে না।

(৬) কোন কারণেই উত্তেজিত হয়ে প্রেসার বাড়ানো ঠিক নয়। তাতে হার্টফেল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

(৭) ভগবানে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখুন। সুখে থাকবেন।

(৮) নির্জনে গিয়ে ভগবানের কৃপা পাওয়া যায় না। সকলকে ভালবাসার মধ্য দিয়েই তার করুণা লাভ করা যায়।

(৯) বৃদ্ধবয়সে আপনার ছেলে অমানবিক ব্যবহার দেখাতে পারে। চঞ্চল হয়ে মাথা খারাপ করবেন না। এটা জগতের নিয়ম। এতে ভেঙে পড়বেন না।

☞ যোগী হোন— শান্তি মিলতে পারে।

যোগ থেকে হয়েছে যোগী। যোগ মানে যুক্ত হওয়া। যিনি সকলের সাথে যুক্ত হতে পারেন তিনিই যোগী। গীতাতে কৃষ্ণ বলেছেন— যিনি সকলের সাথে অভেদভাবে মিশে যেতে পারেন এবং মিশে গিয়ে অন্যের দুঃখ বা আনন্দকে নিজের বলে অনুভব করতে পারেন তিনিই পরম যোগী।

"আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন।
সুখং বা যদিবা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।।" (গীতা)

অপরের সুখে-দুঃখে নিজেকে যিনি অভিন্ন ভাবতে পারেন তিনিই যোগী। বিশ্বের সাথে তুমি যেখানে যুক্ত হয়ে আছো সেখানে আমিও তোমার সাথে যুক্ত হব— এটাই যোগ সাধনার সারকথা। শুধু মন্দির-মসজিদে নয়— বিশ্বের সাথে ভগবান যুক্ত— তাই তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী। সকলের সাথে যিনি নিজেকে যুক্ত করে রেখেছেন তিনিই যথার্থ রোগী। যিনি নিজেকে সকলের মাঝে হারিয়ে ফেলেছেন— নিজের পৃথক কোন সত্ত্বা রাখেননি তিনিই যথার্থ যোগী। যোগীর কাছে পৃথিবীর সবকিছুই আপন। তাই তার দুঃখ ব্যথা নেই— মান অভিমান নেই। না পাওয়ার অভাব নেই। কোন মায়ামোহও নেই।

☞ বার্ধক্যে সুখ আনয়নের কয়েকটি রাজপথ ঃ

সুখ সবাই চায়-- কিন্তু পাচ্ছে কোথায়? মানুষের জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নেই। কৈশোর ও যৌবনে যে সুখ থাকে বার্ধক্যে সে সুখ এবং শান্তি মিলে না। তবে নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অনুসরণ করলে কিছুটা সুখশান্তি মিলতে পারে।

(১) অহংভাব মোটেই দেখানো চলবে না। অহংকার থাকলেও অপরের ক্ষতি করা চলবে না বা অপরকে তুচ্ছ ভাবা উচিত হবে না। অহংকে সৎকাজে লাগাতে হবে।

(২) নিজেকে ভগবানের দাস মনে করে কাজ করতে হবে।

(৩) বৃদ্ধবয়সে অসাধারণ সহ্যশক্তির অধিকারী হতে হবে। সংসারের কোন ঝামেলায় থাকা চলবে না।

(৪) সবাইকে মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে।

(৫) জীবনবীমা করে রাখুন। যৌবন থেকেই পাশ বইয়ে টাকা জমিয়ে রাখা দরকার।

(৬) পুত্র-পুত্রবধূর মতে সায় দিয়ে চলতে হবে।

(৭) অন্যায় দেখেও চোখ রাঙানোর চেষ্টা করবেন না। তাতে আপনার প্রতি অন্যের বিরূপ মনোভাব হবে।

(৮) মিষ্টি কথার দ্বারা সবাই-এর মন জয় করতে হবে।

(৯) নাতি-নাতিনীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবেন না। পুত্র-পুত্রবধূদের প্রতিও নয়।

(১০) বিষয় সম্পদ ছেলেমেয়েদের নামে লিখে দিলে জীবনসত্ব করে রাখা প্রয়োজন।

(১১) প্রাতঃভ্রমণ থেকে বিরত থাকবেন না। শুয়ে-বসে না থেকে যথাসম্ভব ঘোরাফেরা করুন।

(১২) পারেনতো যেকোন একটি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকুন।

(১৩) লোভের বশীভূত হয়ে অতিভোজন করা ঠিক নয়। একবেলা ভাত আর একবেলা রুটি খাবেন। নিরামিষাশী হতে চেষ্টা করুন। মিষ্টান্ন থেকে বিরত থাকাই ভাল।

(১৪) নিয়মিত প্রাতঃকৃত্যের দিকে লক্ষ্য রাখুন। পায়খানা পরিষ্কার না হলে ভূষি খান।

(১৫) নেশা না করাই ভাল।

(১৬) নরম বিছানায় শোবেন না।

(১৭) মাংস খুবই কম খাওয়া দরকার।

(১৮) টাইমমত খাওয়া দাওয়া করবেন।

(১৯) বৃদ্ধবয়সে মাঝে মাঝে শরীরকে ডাক্তার দ্বারা চেক করাবেন। সামান্য অসুস্থ হলে ওষুধ খাবেন। সামান্য অসুস্থতাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবেন না। তাতে সামান্যটাই বড় আকার ধারণ করতে পারে।

(২০) জ্বর-সর্দি-কাশি থেকে রেহাই পেতে ঠান্ডায় ঘুরে বেড়ানো চলবে না। বৃদ্ধবয়সে গরম সহ্য করা যাবে কিন্তু ঠান্ডা সহ্য করা যাবে না।

(২১) সত্ত্বগুণের অধিকারী হতে হবে। অধিকাংশ মানুষই তমোভাবে আচ্ছন্ন। প্রথমে তমোভাবকে জয় করতে হবে রজোভাবের দ্বারা তারপর রজঃকে জয় করতে হবে সত্ত্বগুণ দ্বারা। যারা তমঃ প্রকৃতির তারা ইন্দ্রিয় সুখভোগেই তৃপ্ত। মায়ামোহে বদ্ধ। রজোগুণীরা অহংশূন্য হয়ে কাজ করতে পারেন না। তাদের

কাজের মধ্যে আমিত্ব খুব বেশি থাকে। তারা আদর্শ ও উদ্দেশ্য ঠিক রেখে কাজ করতে চেষ্টা করলেও তা পারেন না। সাত্ত্বিক লোকেরা সর্বদাই আত্মনিষ্ঠ ও একমুখী। সত্ত্বগুণের ব্যক্তি সকলকে ভালবাসেন। তারা যা কিছু করেন তা বিশ্বজনহিতায়। তারা **সবকিছুর ভেতর মূলসত্ত্বার সন্ধান পান ও শান্তিলাভ করেন।** সত্ত্বভাব আমাদের সবার মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু রজঃ ও তমগুণ একে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাই আমাদের সবার লক্ষ্য হওয়া উচিৎ এই সত্ত্বভাবকে বিবেক ও চেতনা দ্বারা প্রকাশিত করা এবং সর্বমোহ ত্যাগ করা।

(২২) বার্ধক্যে সংসারে থাকবেন কিন্তু সংসারের প্রতি থাকবে না কোন মোহ। কারও প্রতি কোন চাওয়া-পাওয়া থাকবে না। উদারতার অধিকারী হবেন। ছোট বড় নির্বিশেষে সকলকে সমান চোখে দেখবেন। তবে ভালবাসা থাকবে কেবলমাত্র ভালবাসার জন্য। সেটাই আপনাকে অমর করে রাখবে।

ক্ষুদ্র ভালবাসায় সবসময় কিছু না কিছু প্রতিদানের আশা রেখে দেওয়া হয়। তা যখন থাকে না, যখন শুধু ভালবাসার জন্যই ভালবাসা যায়— তখন তারই নাম হয় প্রেম। তেমনি ভগবানকে অহেতুক ভালবাসুন। বিশ্বাস না করেই ভালবাসুন। ভালবাসতে ক্ষতি কি? পয়সাতো লাগবে না।

(২৩) বৃদ্ধবয়সে এটা জানতে চেষ্টা করুন— সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম যখন জগতের সমস্ত কিছুর মধ্যে আছেন তখন তিনি আমাদের মধ্যেও আছেন। জগতে এমন কিছু বস্তু নেই যে যার মধ্যে তিনি নেই। সর্বদা ভাবতে হবে আমি তাঁর থেকে অভিন্ন, আমি তাঁর বাইরে নই। আমিও সেই। এইরূপ মনে করতে পারলে জীবনের পরিপূর্ণতা আসে। জীবনের পূর্ণতা তখনই আসে যখন এই প্রকাশিত ব্রহ্ম, যিনি এই প্রকাশিত জগৎকে ব্যাপ্ত করেই শুধু নন তার বাইরেও আছেন। আমি তা থেকে অভিন্ন মনে হলে-- নিজেকে অমর মনে হবে। দেহ ও নাম চলে গেলেও মনে হবে আমার অস্তিত্ব অনন্ত— কখনো নষ্ট হচ্ছে না, আমার জ্ঞান অসীম এবং আমি অনন্ত আনন্দের অধিকারী। আর এটাই হচ্ছে পূর্ণতা। পূর্ণতাই আনন্দ। এই আনন্দ যখন গতিশীল তখন তা হয় প্রেম বা ভালবাসা।

(২৪) সর্বদা স্মরণ রাখবেন বিবেকানন্দের কথা— জগতে পাপ বলে কিছুই নেই। মানুষকে পাপী বলার মত পাপ আর নেই। দুর্বলতাই পাপ। মানুষ ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট এবং চিরমুক্ত। ভাল কাজ করলে যদি পাপক্ষয় হয় তাহলে আমরাতো অনেকেই পরের উপকার করছি। পরকে তো পীড়ন করছি না। পাপক্ষয় ব্যাপারটা যদি যান্ত্রিক নিয়মে হয় তবে একটা জিনিস ক্ষয় হয়ে শেষ হয়ে যাওয়ার মতই হওয়া উচিৎ।

(২৫) হিন্দুরা বিশেষ করে গীতা ও মুসলমানেরা কোরাণ পাঠে অভ্যস্ত থাকুন। টিভি দেখুন। গান শুনুন। বৃদ্ধবয়সে ঐ গ্রন্থগুলি আপনার বন্ধু হয়ে দাঁড়াবে। ওদের সাথে কথা বলবেন। কারণ বার্ধক্যে আপনার কোন মানুষসঙ্গী থাকবে না।

☛ **গভীর শোকে ও অসুস্থতায় প্রাণ খুলে কেঁদে শোক দূর করুন।**

আপনি সংসারে কোন কারণে শোকাচ্ছন্ন হয়েছেন। অথবা পুত্র-পুত্রবধূ আপনাকে বিষাক্ত চোখে দেখছে। দুঃখে-ব্যথায় ভেঙে পড়ছেন আপনি। তাতে যদি কান্না আসে কাঁদুন। চোখের জল মানুষের দুঃখকে সহজে জয় করে নিতে পারে। কান্নার সাথে মনের যে একটা গভীর সম্পর্ক আছে তা নিয়ে হল্যান্ডের মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, শরীরকে সুস্থ রাখতে আমেরিকার মহিলারা খুব বেশি কাঁদেন। স্পেন ও বুলগেরিয়ার মহিলারা নাকি নিজেদেরকে সুস্থ রাখতে নিজের বাড়িতে বসে সন্ধ্যাবেলা অকারণে কাঁদতে থাকেন।

টিলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদগণ বলেন—

দেহের দূষিত পদার্থকে চোখের জল প্রস্রাব ও পায়খানা দ্বারা নিঃসৃত করে দেয়। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, যদি কেউ প্রাণ খুলে কাঁদতে পারেন তাহলে তার হৃদযন্ত্র বিকল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সেজন্যে পুরুষের তুলনায় মেয়েদের হৃদরোগ খুব কম হয়। বিজ্ঞানীরা বলেছেন— পুরুষেরাও যদি মেয়েদের মত কাঁদতে পারেন তাহলে তারাও হৃদরোগ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ ও মিনেসোটায় সেন্টগেলের সাইক্রিয়াটিক রিসার্চ ল্যাবরেটরির অধ্যক্ষ ডাঃ উইলিয়ম ফ্রে'র মতে— কান্না শরীরকে সুস্থ রাখতে সর্বদা চেষ্টা করে। যারা কাঁদতে পারে তাদের কম অসুখ হয়। হৃদরোগ তো হয়ই না। তিনি চোখের জলের ওপর দীর্ঘদিন গবেষণা চালিয়ে একথা স্থির করেছেন। কান্না অনেকক্ষেত্রে আলসার থেকেও মানুষকে রেহাই দেয়।

বার্ধক্যের বুলেটিন

☛ **আগে থেকেই সচেতন থাকুন।** বৃদ্ধবয়সের জন্য সজাগ হোন।

(ক) আপনার পুত্রবধূ সংসারে অকারণ ঝামেলা বাড়াতে পারে।

(খ) আপনার বয়স্কা স্ত্রী আপনাকে ভাল চোখে দেখতে নাও পারে।

(গ) নাতি-নাতিনীরা আপনাকে সংসারের অহেতুক ঝামেলা মনে করবে।

(ঘ) আপনাকে চাকরের মত থাকতে হবে।

এর জন্য প্রয়োজন প্রথম জীবন থেকে ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখা। ব্যাঙ্কে টাকা থাকলে আপনার মৃত্যুর পর ছেলেরা আপনার সমাধি মন্দির করে দেবে। আপনার ফটোতে মালা দেবে। আপনার জন্মদিন অথবা মৃত্যুদিন পালন করবে।

জীবন কোন ফরমূলায় চলে না। তাই সবসময় হাতে টাকা পয়সা রাখুন। কখন কী হবে তা কেউ জানে না। জীবনে পুরস্কার-তিরস্কারের জন্য মাথাব্যথা করবেন না।

☞ **কোন জীবনই ব্যর্থ নয়। ভালমন্দ নিয়েই জীবন। জীবনে অনেক কিছুই ঘটতে পারে।**

আপনারাতো জানেন, ভগবান কৃষ্ণের পুত্রগণও লম্পট-দুরাচারী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের মেয়েও বিধবা হয়েছিল। দ্রৌপদী, কুন্তী ও মন্দোদরীর দুঃখের অবধি ছিল না। সীতা আর বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা বলাই বাহুল্য। নেতাজীকেও ভয়ে আত্মগোপন করতে হয়েছিল। রামকৃষ্ণেরও ক্যানসার হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধীকে তার দেহরক্ষী হত্যা করেছিল। বঙ্গবন্ধু মুজিবর আততায়ীর হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন। সাদ্দামকে তার আপনজনই ধরিয়ে দিয়েছিল। **জীবনে অনেক ভাগ্য বিড়ম্বনা আসবে।** হাসির হাটে অকারণ কান্নার স্রোত বইতে পারে। রামচন্দ্রকে বনবাসে যেতে হয়েছিল এবং শেষ জীবনে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করতে হয়েছিল। সীতাকে পাতালে পাঠিয়ে তার অনুশোচনার সীমা ছিল না। যীশুকে নিজের ক্রুশ কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল তাঁর বধ্যভূমিতে। তাই কার জীবনের পরিণতি কি হবে কেউ তা জানে না। আজ আমি ভাল আছি, কাল কোনো অ্যাকসিডেন্টে মরতে পারি। আজ যে আপন কাল সে একটা সামান্য কথায় পর হতে পারে। সেদিন একটি ছেলে শ্বশুরবাড়ী থেকে যৌতুকস্বরূপ মোটর সাইকেল পেয়ে বিয়ের তিনদিন পরে সেই মোটর সাইকেল নিয়ে সে পথে অ্যাকসিডেন্ট করে। সঙ্গে সঙ্গে স্পট ডেথ্।

ইংলন্ডের **বিখ্যাত কবি শেলিকে** কে না চেনেন? মাত্র তিরিশ বছর বয়সে ঝড়ের সমুদ্রে নৌকাডুবি হয়ে মারা যান। কেউ বলে আত্মহত্যা করেছিলেন। অথচ কী অসাধারণ সম্পদ না দিয়ে গেছেন তিনি। ৩৭ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেছিলেন **ইংলন্ডের ভিনসেন্ট ভ্যান গথ। স্যামুয়েল টেলর কোল্‌রিজকে** উচ্চশিক্ষিত মাত্রই চেনেন। তিনি ছিলেন 'দ্য রাইম অফ্ দি অ্যানসিয়েন্ট মেরিনার'-এর বিখ্যাত কবি। ভবঘুরে হয়ে সারাজীবন ঘুরেছিলেন। চাকরি পাননি।

মাত্র ২৬ বছর বয়সে অসম্ভব অর্থকষ্টে যক্ষ্মারোগে মারা যান **জন কীট্‌স। দস্তয়ভস্কি** নির্বাসিত হয়েছিলেন সাইবেরিয়ায়। **কবি সুকান্ত** মাত্র ২১ বছর বয়সে যক্ষ্মা রোগে মারা যান। **রবীন্দ্রনাথকে** সারাজীবন বহু শোক সহ্য করতে হয়েছিল। তাছাড়া সাহিত্য জগতে তার অবমাননার সীমা ছিল না। তাই কোন কিছুতে ব্যথা পাবেন না।

ব্যস্ত হোন— সুস্থ থাকবেন

☞ **শেষ বয়সে যদি স্ত্রীবিয়োগ হয় তাহলে নিজেকে খুব অসহায় লাগবে একথা সবাই জানেন।** কিন্তু আপনার কিছু করার নেই। কাউকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখাতো মানুষের হাত নয়। আপনি সর্বদা কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকুন। নাতি-নাতিনীদের নিয়ে হাসিখুশীতে কাটান। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে জহরলাল নেহেরু প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি স্ত্রীকে হারিয়ে একা একা বার্ধক্য জীবন কাটিয়ে গেছেন। আমার ঠাকুরদা প্রৌঢ় বয়সে ঠাকুমাকে হারিয়ে আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ করতে করতে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। আমি দেখছি আমাদের পাড়ার কয়েকটি স্ত্রীহারা ও সস্ত্রীক বৃদ্ধকে সারাদিন-রাত ধর্মালোচনা করে সময় কাটাতে। তারা পাড়াতে একটি আশ্রম তৈরী করেছেন।

সেইজন্য আমাদের সকলেরই একা একা থাকা অভ্যাস করা উচিৎ। কখন কার ভাগ্য কেমন হবে তা কেউ জানে না। একা একা রান্না করে একা একা খান। একা রাত্রি কাটান। ঈশ্বরকে মনে মনে স্মরণ করে তার সাথে কথাবার্তা বলুন। এছাড়া আমাদের আর উপায় কী! আমি এক দুরের স্কুলে শিক্ষকতা করি। সেখানে একা থাকি। একা রান্না-বান্না করে খাই। আমার পাশে বীরেন দাস নামে এক কর্মকার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া-গন্ডগোল করে অনেকদিন কামারশালেই একা একা দিনরাত অতিবাহিত করছেন। তিনি বার্ধক্যে একা থাকার জন্য রেডি হচ্ছেন।

☞ **শেষ জীবনে সুখী হতে হলে প্রথম জীবন থেকেই এই নিয়মাবলী পালন করতে হবে।**

(১) স্ত্রীকে কখনো দাসীরূপে দেখবেন না। সর্বদা গঞ্জনাও দেবেন না।

(২) স্ত্রী হয়ে স্বামীকে ভেড়া বানানোর চেষ্টাও করবেন না।

(৩) উভয়ের উভয়ের সারাজীবন ধরে প্রশংসা করে যাবেন।

(৪) স্বামীর আয় বুঝে ব্যয় করবেন। স্বামীকে গোপন করে কোনো কিছুই করবেন না।

(৫) কেউ কাউকে তুচ্ছ ভাববেন না। উভয়ে শিক্ষিত হলে কেউ কোন বিদ্যার গরিমা প্রকাশ করবেন না।

(৬) উভয়ে উভয়ের খাওয়া দাওয়ার দিকে নজর দেবেন। পরস্পর পরস্পরের কথা বুঝতে চেষ্টা করবেন। কেউ অবুঝ হবেন না।

(৭) কেউ কারো উপরে জোর কর্তৃত্ব চালাবেন না। চালালেও দুজনের কেউ যেন না বুঝতে পারে যে পরস্পর শাসন চালানো হচ্ছে।

(৮) উভয়ের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা যেন না থাকে। থাকলে জীবন অকালেই রুইন্ড হয়ে যাবে।

(৯) উভয়ের ব্যবহারকে আন্তরিকতাপূর্ণ করতে হবে।

(১০) স্বামী সবদিন রাত্রে ভালমন্দ খেয়ে আসবে আর স্ত্রী বাড়িতে আঙুল চুষবে— এ যেন না হয়।

(১১) সবশেষে প্রথম জীবন থেকে উভয়ে উভয়কে মানিয়ে নিতে হবে। কেউ কাউকে হেয় ভাববেন না।

☞ **নিরূপায় হয়ে বৃদ্ধ সেবাশ্রমে যেতে অসুবিধা বোধ করবেন না।** পুত্রকন্যাদের বিদেশে চাকরি করতে পাঠিয়ে বৃদ্ধবয়সে একা একা থেকে শান্তি পাবেন না। তবে যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে থাকেন তাহলে হয়ত কিছুটা শান্তি মিলতে পারে। তবে সেই সঙ্গে একটা বাচ্চা মেয়ে কিংবা ছেলেকে রাখতে পারেন। তাকে ভালবেসে জীবন কাটাতে পারবেন। এছাড়া যদি মেয়ের বাড়ীর নাতি-নাতিনী এসে থাকে তাহলেও কিছুটা ভাল। নিরূপায় হলে বৃদ্ধ সেবাশ্রমে যেতে পারেন। সেখানে রাজকীয় ব্যবস্থায় থাকতে পারবেন। আপনার জন্য বহুমুখী আয়োজন রয়েছে সেখানে। পার্কে বেড়াবেন— টিভি দেখবেন— ব্যায়াম করবেন— বাগান করবেন— ধর্মালোচনা, শিক্ষাদান— হাতের যে কোন কাজ গানবাজনা— রাজনীতি আলোচনা সবই পাবেন। সেখানে কোনকিছুরই অভাব হবে না। বাড়িতে যেমন নিঃসঙ্গ জীবন সেখানে কিন্তু তা নেই। তাই শান্তি পেতে বৃদ্ধ সেবাশ্রমে যোগ দিতে পারেন।

☞ **আপনার সম্পর্কে অকারণে কেউ যদি কুসমালোচনা করে তাতে মন খারাপ করা ঠিক নয়।** কারণ কেউ কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হলে লোকে তার সম্পর্কে সমালোচনা করে আনন্দ উপভোগ করে। সেই সঙ্গে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ক্লাসের বন্ধুরা পরিণত বয়সে বলত— আমরা ঐ সম্রাটের কান মুলেছি। বিদ্যাসাগরের সহপাঠীরা বিদ্যাসাগরকে 'যশুরে কৈ, কসুরে যৈ' বলে মানসিক তৃপ্তি পেত। আসলে আমাদের পাশের কেউ আমাদেরকে ছাপিয়ে বড় কিংবা খ্যাতিমান হয়ে উঠলে আমরা তাকে সহ্য করতে পারি না। তখন তার দুর্বল স্থানগুলো খুঁজতে থাকি এবং সেই স্থানে তীর নিক্ষেপ করে মনে শান্তি পাই।

☞ **আপনার পাশের সমবয়সী লোকটি আপনার চেয়ে সুস্থ আছে বলে ঈর্ষা করবেন না।** কারণ আজ যে সুস্থ আছে কাল সে অসুস্থ হতেই পারে। রোগ-ব্যাধি দেহ বৃক্ষের ফল। অসুখ বিসুখের হাত থেকে কারো রেহাই নেই। নিরবচ্ছিন্ন সুখ

কেউ পায় না। বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, রামমোহন, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সকলকেই শেষ জীবনে খুব কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। মাইকেল মধুসূদনের শেষ জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা ভাবলে আপনার কোন দুঃখ-কষ্ট আর অসুখ-বিসুখকে দুঃখ-কষ্ট বলেই মনে হবে না। জরা-ব্যাধি-মৃত্যু মানুষের জীবনের সাধারণ ব্যাপার। তাছাড়া স্বাস্থ্যবান-অস্বাস্থ্যবান-ধনী-দরিদ্র-রূপবান-রূপবতী-গুণবান-গুণবতী— সবার একই গতি। রূপ, গুণ, স্বাস্থ্য কিছুই চিরস্থায়ী নয়। গুণবানকেও রোগ শোক গ্রাস করবে আর রূপবানকেও শেষ জীবনে কুরূপ হতে হবে। তবে এক আধটা যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়।

☞ **দুঃখের রাজমুকুট পরে কখনো সখনো সুখ মানুষের সামনে এসে হাজির হয়।** যে তাকে না ভেবেচিন্তে স্বাগত জানায় সে পক্ষান্তরে দুঃখকেই বরণ করে।

☞ কারো ভাল করতে চেষ্টা করলে নিজেরাই ভাল হবে। কারো উন্নতি করতে গেলে হয়ত কষ্ট হবে কিন্তু তাতে আমাদের মহত্ব বাড়বে।

☞ **আবার বলছি শেষ জীবনের জন্য হতাশ হবেন না। এখন জনস্বাস্থ্য বিভাগের কল্যাণে ৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষ স্বাভাবিক কাজকর্ম করছে বা ভবিষ্যতেও করবে।** যন্ত্রের পার্টসের মত মানুষের এক একটি যন্ত্রকে পরিবর্তন করে তাকে দীর্ঘায়ু করা হচ্ছে। **এখন ৭০ বছরের আগে কাউকে বৃদ্ধ বলা হচ্ছে না।** অধুনা বৃদ্ধদের বুড়ো দাদু না বলে মানুষ তাদের জেঠু, বড়দা, বড়কাকু বলে পথে ঘাটে সম্মান দেখাচ্ছে। সব বুড়ীরা আজকাল মাসীমার পর্যায়ে রয়েছেন। তাদের এখন বুড়ী বলে কেউ সেন্টিমেন্টে আঘাত করে না। মানুষ এখন বুঝদার হচ্ছে— সভ্য ভব্য হচ্ছে।

☞ মানুষের সহানুভূতি— সততা তাদেরকে সমাজ কল্যাণে নিয়োজিত করে। এটা তাদের অলিখিত শাস্ত্র। যারা এই অলিখিত গন্ডীর ওপরে উঠতে পারেন তারাই সুখী।

সংসারে বক্তার চেয়ে সবসময় শ্রোতা হোন।

☞ **বার্ধক্য কাটানোর ভাল উপায় হল কোন একটি শখ।** যেমন বইপড়া, বই লেখা, গান করা, রাজনীতি করা ইত্যাদি। এসবের কোন রিটায়ারমেন্ট নেই। এর শেষ নেই। তাই যেকোন একটি শখকে বাল্য থেকে পুষে রাখুন।

☞ **বার্ধক্যে ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করার নিয়মাবলী ঃ**

(১) নিজেকে কখনো বৃদ্ধ বা বয়স্ক মনে করা চলবে না।

(২) সর্বদা আনন্দের সাথে বেঁচে থাকব এটাই আমাদের চিন্তাধারা হবে।

(৩) মৃত্যু যখন ইচ্ছা হতে পারে। তবে বৃদ্ধ হলে মরব— এ ভয় কেন? এটা বুঝতে হবে।

(৪) হতাশা ও দুশ্চিন্তা মোটেই করা চলবে না। যা হবার হবে। যদ্ভাবী ন তদ্ভাবী।

(৫) আজকের দিনটি ভাল করে কাটাব— এটাই হবে আমাদের আজকের রুটিন।

(৬) কালকের কথা কাল ভাবব। কাল নতুন কিছু হতে পারে।

(৭) যে কাজ করবেন— তাতে যেন আগ্রহ ও প্রাণ থাকে।

(৮) আনন্দের সঙ্গে কাজ করলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

(৯) সবার কাছ থেকেই অনুপ্রেরণা নিতে হবে।

(১০) অবসর সময়ে মনকে ভাসিয়ে দিতে হবে নীল গগনে ও পাহাড়-পর্বতে।

(১১) রাত্রে ঘুম না এলে সর্বদা ট্যাবলেট না খেয়ে শুয়ে শুয়ে মনকে নীল আকাশে উড়ন্ত বকের দলে কিংবা ট্রেনের হুইসেলে ভাসিয়ে দিন। সমুদ্রের অসীমতা চিন্তা করুন। লম্বা লম্বা শ্বাস নিন— এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ করে গুণতে শুরু করুন। ঘুম আসবেই।

(১২) কোন ভাল কাজ করার চিন্তা থাকবে মনে।

(১৩) একবার ভুল করলে সব শেষ হয়ে গেল কখনো ভাববেন না।

(১৪) বৃদ্ধ বয়সে একটু অসুস্থ হলে মৃত্যুর ভয়ে ভীত হবেন না। আপনি যে বৃদ্ধ হয়েছেন— একথা কে বলল? আপনার শরীর ঠিক আছে। মোটেই খারাপ হয়নি। আপনার চেয়ে অনেক অসুস্থ শরীর রয়েছে।

(১৫) The way of a superior man is three fold, virtuous— he is free from anxieties, wise— he is free from perplexities, bold— he is free from fear. (কনফুশিয়াস)

(১৬) মনের একাগ্রতা, সংযোগ, লক্ষ্য বাড়ান। শান্তি আসবে।

(১৭) সুখের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করুন দুঃখ আসবে না। মানসিক আত্মনিয়ন্ত্রন করুন। কোন ব্যাপারকে সিরিয়াস্‌লি নেবেন না।

(১৮) আত্মবিশ্বাসী হোন। জীবনে যে কোন কাজের সিয়োরিটি বজায় রাখুন। ভগবৎ কৃপা পাবই— এই চিন্তায়ও দৃঢ় থাকুন।

(১৯) অতীতের ভুলকে একেবারে ভুলে যান।

(২০) নিজেকে দুর্ভাগ্য মনে করবেন না। জানেন কৃষ্ণকেও যদু বংশের লোক হিংসা করত। গৌরাঙ্গকেও নবদ্বীপ ছেড়ে পুরীতে থাকতে হয়েছিল। বিদ্যাসাগরকেও প্রাণভয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। তাই এসব দুর্ভাগ্য নয়। সাময়িক ঘটনা মাত্র।

ষষ্ঠ অধ্যায়

(ক) তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা

☛ **বৃদ্ধবয়সে বেশী আবেগপ্রবণ হবেন না, তাতে দুঃখ আছে।** বাল্যে আবেগ হোক— সে তবু ভাল। তাতে মন চাঙ্গা থাকবে। কাজে উৎসাহ থাকবে। প্রাণে চাঞ্চল্য আসবে। কিন্তু বৃদ্ধবয়সে আবেগপ্রবণ হলে সংসারে অশান্তি বাড়বে।

☛ **ত্যাগের দ্বারা ভোগ করলে সুখ হতে পারে।**

ত্যাগেই শান্তি। ভোগের দ্বারা ত্যাগ আসে না। ভোগের মধ্যে ভোগস্পৃহা আরো বেড়ে যায়। আগুনে ঘৃত দিলে আগুনের বৃদ্ধি বরং বেড়ে যায়, কমে না।

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুন্ডং দন্তবিহীনং জাতং তুন্ডং।
করধৃতকম্পিত শোভিত দন্ডং তথাপি ন মুঞ্চত্যাশাভান্ডম্।।

অঙ্গ বিনষ্ট হবে, মাথার চুল পেকে সাদা হয়ে যাবে, দাঁত সব ভেঙে যাবে, চোখ নষ্ট হবে, কান শ্রবণশক্তি থেকে বিরত থাকবে, হাত-পা কম্পিত হবে তবু মানুষের আশা মিটবে না। মানুষের এই বোধ থাকা প্রয়োজন, তাতে নির্লিপ্ততা আসবে।

☛ **বার্ধক্যের সাধনা হোক অনাসক্তি। তাতে শান্তি মিলবে।**

বিবেকানন্দ বলেছেন— অনাসক্তিই মানবজীবনের সাধনা হওয়া দরকার। যেখানে ভালবাসার বিনিময়ে দুঃখ ব্যথা আছে সেখানে অনাসক্ত থাকাই বিধেয়। যেখানে দানের প্রতিদান নেই সেখানে অনাসক্তিই শ্রেয়। যেখানে উপকারের কৃতজ্ঞতা নেই সেখানে অনাসক্তিই প্রধান। অনাসক্তি থাকলে লোভ আসবে না। সংসারে মোহাচ্ছন্ন হবেন না। জীবনকে হাল্কা মনে হবে। মৃত্যুভয় থাকবে না।

☛ **বৃদ্ধবয়সে লোভ-লালসা ত্যাগ করুন।**

লোভ মানবজীবনের ৬টি রিপুর মধ্যে একটি বড় রিপু।

(১) লোভের বশবর্তী হয়ে বৃদ্ধবয়সে মানুষ অতিরিক্ত খাওয়াদাওয়া করে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। যেটা অকাম্য।

(২) লোভ থেকে পাপ আর পাপ থেকে মৃত্যু।

(৩) লোভ না মিটলে ক্রোধের সৃষ্টি হয়। চৌর্যবৃত্তির অধিকারী হয় মানুষ।

(৪) লোভের ফলে ভাই ভাইকে হত্যা করে। মনে শান্তি আসে না। লোভ থাকলে জীবনে কেউ কোনদিন সন্তুষ্ট থাকতে পারবে না। মন উদ্বিগ্ন থাকবে। তাই এখুনি লোভকে জীবন থেকে বিসর্জন দিন।

☛ **দুর্বিনীত পুত্রের সাথে কখনো গন্ডগোল করতে যাবেন না।** তাতে অসুবিধা

আছে। কারণ দুর্বিনীত পুত্রগণ বিবেকরহিত, চেতনাহীন ও অবিবেচক। তাদের ভালমন্দ বোধশক্তি নেই। মূর্খদিগকে উপদেশ দিলে তারা যেমন তা গ্রহণ করতে না পেরে বরং উপদেশদাতার ক্ষতি করে এও তেমনি। এরকম পুত্র থেকে শান্তি নয়— শান্তি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

☞ **উচ্ছৃঙ্খল সংসারকে আপনি বৃদ্ধবয়সে শৃঙ্খলাপরায়ণ করতে পারবেন না।** বৃদ্ধবয়সে ছেলেরা কেউ আপনার কথা শুনবে না। কারণ মানুষ এখন আত্মকেন্দ্রিক। প্রত্যেকে নিজেকেই শ্রেষ্ঠ বলতে চায়। কেউ কারো জ্ঞান বা উপদেশ নিতে রাজী নয়। আবার অশিক্ষিত বাবার শিক্ষিত ছেলে হলেতো কথাই নেই। বাবাকে আমলই দেবে না।

☞ **অধ্যবসায় আর প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তির মিলিত স্রোতের নাম— সাফল্য, আনন্দ ও শান্তি।** বিবেকানন্দ বলেছেন— আমি কাপুরুষতাকে ঘৃণা করি। কখনো যদি তুমি অকৃতকার্য হও তাহলে জানবে দোষ তোমারই। কারণ তোমার ভেতরের শক্তিকে যথোপযুক্তভাবে প্রকাশ করতে পারনি। আগে নিজের প্রতি বিশ্বাস তারপর ঈশ্বরে। যতক্ষণ না ঈশ্বরে বিশ্বাস দৃঢ় ও যথার্থ হয় ততক্ষণ পুরুষাকারকেই আশ্রয় করা কর্তব্য। কবি ঘটকর্পর বলেছেন—

"উদ্যোগীনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোহত্র দোষঃ।।"

উদ্যোগী ব্যক্তিরাই লক্ষ্মীলাভ করেন। কাপুরুষরা দৈবের দোহাই দিয়ে থাকেন। দৈবকে পেছনে রেখে পৌরুষ অবলম্বন কর! চেষ্টা করে দেখো। না হলে দোষ কোথায়।

ঈশ্বরে বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ করলে তখন আর পুরুষকারের প্রয়োজন হয় না। একথা স্বামীজি বলেছিলেন। মহাকাশযানকে পৃথিবীর আকর্ষণের বাইরে পাঠাতেই যত ঝামেলা। মাধ্যাকর্ষণের বাইরে চলে গেলে আর কোন পুরুষকার লাগে না। স্বচ্ছন্দে সে মহাকাশে বিচরণ করে। মানুষও পুরুষকারের অন্তঃপ্রকৃতির ওপরে উঠে গেলে দৈব বা ভগবৎ কৃপার দ্বারা সম্পূর্ণ চালিত হয়। কাজেই দৈব ও পুরুষকারের ভাবের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তবে সম্পূর্ণ দৈবাধীন বা ভগবৎ কৃপাধীন হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত বা সেই বোধ লাভ করার জন্যই পুরুষকারকে আশ্রয় করা কর্তব্য।

ঈশ্বর সম্পর্কে এমন একটি ধারণা মাথায় নিন, তাহলে ভবিষ্যৎ জীবনে

আনন্দ পাবেন। ভগবান সকলের মধ্যেই আছেন কিন্তু সকলের থেকে তিনি আলাদা। কারো সাথে তার মিল নেই। তিনি সব কিছুরই আধার। সমস্ত আকাশে আমরা বিদ্যুৎ সঞ্চিত হতে দেখি। সেই বিদ্যুতের পরিমাণ যখন বেশি হয় তখন তার ধর্ম অনুসারে অপেক্ষাকৃত কম প্রোটেনসিয়াল জিনিসের দিকে আসতে চায়। তুলনায় বৃহৎ বলে একমাত্র পৃথিবীর প্রোটেনসিয়ালিটি হচ্ছে শূন্য। কাজেই সমস্ত বিদ্যুৎ এসে মাটিতে মিশে যেতে চায়। সেইরকম ঈশ্বরের প্রোটেনসিয়ালিটি হচ্ছে জিরো। কাজেই সব বস্তুই ঈশ্বরে মিলতে চেষ্টা করে। যা থেকে সবকিছু হয়েছে— যাতে সবকিছু আছে— যাতে সবকিছু মিলিয়ে যায়— যা সমস্ত প্রকাশ, আনন্দ ও জ্ঞানের মূল— সব অস্তিত্বের যা ভিত্তি— সবকিছুই তাতে আছে বলে যা সর্ববৃহৎ— যা নিজে কিছুমাত্র পরিবর্তিত বা বিকারগ্রস্ত হয় না— যা সবের মূল বলে মৌলতম এবং সেজন্যেই যার বিভাজন বা বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, মনের দ্বারা যাকে জানা যায় না, যা সবের কারণ হলেও যার কোন কারণ নেই, যার আদি বা অন্ত নেই, যা বস্তুতঃ দেশকালে সীমাবদ্ধ নয়, যা সমস্ত সীমার অতীত, যার কথা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না, স্বার্থবুদ্ধি যার স্বরূপ বুঝতে পারে না, যার কোন বিভব বা গুণ নেই, যা সবকিছুর মধ্যে থাকলেও সবকিছুকে অতিক্রম করেও আছে সেই ঈশ্বর।

(খ) যদি ভগবানে না মন দিতে পারেন

ভগবান বলে যদি কেউ না থাকেন তবে প্রাচীন কালের ঋষি-মুনি থেকে এযুগের শ্রেষ্ঠ মানুষরা কেন তার জয়গানে আজও বিভোর? কেন আজও ভগবানের নামে মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে নির্মাণ করছে মঠ-মন্দির? কেন তাকে নিয়ে উৎসব করে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে? কেন আজও তার নামে কবিরা রচনা করছে কবিতা, গীতিকার রচনা করছে গীতিকা? কেন তার কথা স্মরণ করলে, তার নাম সংকীর্তন করলে মনে আনন্দ জাগে? কেন ভীমবর্ণ নীল বিরাট পর্বতের পাদদেশে দাঁড়ালে তাঁর কথা মনে হয়— কেন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে তাঁর মূর্তির কথা মনে জাগে— কেন বিরাট বনপ্রান্তর আর মরুভূমির দিকে তাকালে তাঁর সত্ত্বাকে অনুভব করি? কেন সাধু সন্ন্যাসী দেখলে মন শ্রদ্ধা ভক্তিতে ভরে উঠে?

'হরিবোল' বললে মানুষ ভিক্ষা দেয়— হরিনাম করলে মানুষ তাকে ভক্তি করে, খেতে দেয় কিন্তু অন্য কারো নাম উচ্চারণ করলে কি সে খেতে পাবে? শচীন-সৌরভের নাম করে ভিক্ষা করুনতো— কেমন ভিক্ষা পান? এরপরও কি ভগবানে বিশ্বাস হয় না?

শিবনাথ শাস্ত্রীকে শিক্ষিত মাত্রই চেনেন। তিনি খুবই আদর্শবাদী ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও আজীবন ঈশ্বরের সাধনা করে গেছেন তাঁর রচিত সংগীতগুলির মাধ্যমে।

(১)

বড় সাধ মনে, হৃদয় রতনে হৃদয় মাঝারে পাই।
সে পদে বিকার, দাস হয়ে রব, পরাণ সঁপিব ভাই।।
বল বুদ্ধিমন, জীবন যৌবন, নিজের কিছু যে নাই।
সে প্রেমসাগরে জনমের তরে মগন হইতে চাই।।

তবে শিবনাথ শাস্ত্রী কি ভুল ধারণা করে এরকম ঈশ্বর বিষয়ক সংগীত রচনা করে গেছেন?

রবীন্দ্র ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কামিনী রায়, হেমলতা দেবী, হরিনাথ মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী— এরা কি সবাই অন্ধভাবে বোকা মানুষের মত ভয়ে ভগবান ভগবান বলে কাব্য কবিতা আর গীত রচনা করে গেছেন? এ প্রশ্নের উত্তর আপনারাই দিন। এদের ঈশ্বরবিষয়ক সংগীতগুলো অনুভব করুন—

(২)

অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমময়।
এ জগৎ-শিশুর মত চরণে ঘুমিয়ে রয়।
অভিমান অহংকার মুছে গেছে নাহি আর
ঘুচে গেছে শোক-তাপ নাহি দুঃখ নাহি ভয়।
কোটি রবি শশীতারা তোমাতে হয়েছে হারা
অযুত কিরণ ধারা তোমাতে হয়েছে লয়। (বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এবার শুনুন রজনী কান্তের ভগবদ্ভক্তির সুধারসের কুলুকুলু কলধ্বনি—

(৩)

আমি অকৃতী অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাওনি!
যা দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া কেড়েও তো কিছু নাওনি।
তব আশীষ-কুসুম ধরি নাই শিরে
পায়ে দলে গেছি চাহি নাই ফিরে
তবু দয়া করে কেবলি দিয়েছ— প্রতিদান কি চাওনি!
আমি ছুটিয়া বেড়াই জানিনা কি আশে
সুধাপান করে মরিগো পিয়াসে

তবু যাহা চাই সকলই পেয়েছি, তুমিও তো কিছুই পাওনি।
আমায় রাখিতে চাওগো বাঁধনে আঁটিয়া শতবার যাই বাঁধন কাটিয়া
ভাবি ছেড়ে গেছ; ফিরে চেয়ে দেখি এক পাও ছেড়ে যাওনি।। (রজনীকান্ত)

(৪)

কেন বঞ্চিত হব চরণে।
আমি কত আশা করে বসে আছি, পাব জীবনে না হয় মরণে।
তুমি আপনা হইতে হও আপনার যার কেউ নাই তুমি আছ তার
একী সব মিছে কথা— ভাবিতে যে পাই ব্যথা
সে ব্যথা বড় বাজে প্রভু মরমে। (রজনীকান্ত)

(৫)

অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুলো না তাঁয়,
থাকিলে তাঁহার সঙ্গে পাপ তাপ ভুলে যায়।
হৃদয়ের প্রিয়ধন তার সমান কে
সেই সখা বিনে সুখ শান্তি কে দেবে তোমায়? (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(৬)

ভাই বোন মিলে তব পদতলে
এসেছি গো পিতা, চাহ দয়া করে।
গাহিতেছি সবে হরষের ভরে, তব প্রিয় নাম ক্ষুদ্র কণ্ঠস্বরে।
এই কর প্রভু, সুখে দুঃখে কভু না ভুলি তোমারে ক্ষণেকের তরে,
যদি তোমা ভুলে যাই, কভু চলি কুপথের দিকে
রেখো হাত ধরে। (কামিনী রায়)

(৭)

কে সে পরম সুন্দর, যাঁহারি লাবণ্যে পূর্ণ অনন্ত অম্বর!
আনন্দ ঝংকারে যার মনের বিচিত্র তার,
ছন্দে ছন্দে সুরে সুরে বাজে নিরন্তর।।
যে সংগীতে হলে লীন মনোবীণা স্পন্দহীন
তিলেক বিচ্ছেদ তার ব্যাকুল অন্তর।
রূপ তার সর্বস্থানে রস তার ঝরে প্রাণে
প্রেম তার কোলে টানে বিশ্বচরাচর।। (হেমলতা দেবী)

(৮)

হরি, দিনতো গেল, সন্ধ্যা হল পার কর আমারে!
তুমি পারের কর্তা, শুনে বার্তা ডাকছি হে তোমারে।।

আমি আগে এসে
ঘাটে রইলাম বসে
যারা পাছে এল আগে গেল আমি রইলাম পড়ে।। (হরিনাথ মজুমদার)

(৯)

প্রখ্যাত কবি-ব্যারিস্টার-বাস্তববাদী নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও ঈশ্বরের সান্নিধ্য কামনা করে লিখে গেছেন আপনাদের চিরপ্রিয় সেই গান—

ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে!
কে ডাকে মধুর তানে-কাতর প্রাণে
'আয় চলে আয়— ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে'।
বলে আয়রে ছুটে আয়রে তোরা
হেথায় নাইকো মৃত্যু নাইকো জরা
হেথায় বাতাস গীতি-গন্ধভরা চির স্নিগ্ধ মধুমাসে,
হেথায় চিরশ্যামল বসুন্ধরা চিরজ্যোৎস্না নীলাকাশে।
কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে
ভূতের বেগার খেটে মরিস মিছে
দেখ ঐ সুধাসিন্ধু উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে ঘরের ছেলে আয় চলে আয় আমার পাশে।
কেন কারাগৃহে আছিস বন্ধ
ওরে মূঢ় ওরে অন্ধ
ওরে সেইতো পরমানন্দ— যে আমাকে ভালবাসে।
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে পড়ে আছিস পরবাসে।। (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

(১০)

মন পঙ্কিল করে কেমনে ডাকিব তোমায়
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়।
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনলসম,
আমি পাপী তৃণসম কেমনে পূজিব তোমায়। (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী)

(১১)

নয়ন তোমায় পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে,
হৃদয় তোমায় পায় না জানিতে হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।
সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ
তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ

নিরাশ্রয় জন, পথ যার গেহ, সেও আছে তার ভবনে;
তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর, সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার
কাল পারাবার করিতেছ পার, কেহ নাহি জানে কেমনে।
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর, লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর
তুমি আর আমি, এই আমি জানি কোন বাধা নাই ভুবনে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এছাড়া রবীন্দ্রনাথের কত শত গান ক্ষুদ্র মূর্তির গন্ডী ছাড়িয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে হয়েছে পরিব্যাপ্ত। সেই অনন্ত মহিমায় উদ্ভাসিত একটি গান—

আকাশভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান।
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
অসীমকালের সে হিল্লোলে, জোয়ার ভাটায় ভুবন দোলে
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান।
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান।
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি
জানার মাঝে অজানারই করেছি সন্ধান।
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

তাহলে এরা কী সবাই উদ্‌ভ্রান্ত পাগলের মত প্রলাপ বকে গেছেন? এর পরেও যদি ভগবানের চরণে মন দিতে না পারেন তবে সেটা আমার নেহাৎ দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী হতে পারে।

(গ) বার্ধক্যে আমার বাড়ী-আমার সংসার— এইভাব ত্যাগ করতে হবে।

আমার শরীর, আমার সংসার, আমার বাড়ী— এটা মানুষ প্রথম জীবনে ভাবতে পারে, কিন্তু বার্ধক্যে উপনীত হয়ে তা ভাবা ভুল। যে শরীর পাওয়া গিয়েছে তা নিজস্ব হতে পারে না। আর যা আমার সাথে সাথে যায় না সেও আমার নয়। অতএব আমি এবং আমার শরীর ভিন্ন। আমি যদি শরীর থেকে ভিন্ন না হতাম তাহলে শরীরের মৃত্যুর পর আমারও মৃত্যু হয়ে যেত। যেমন বাড়ী থেকে আমি চলে গেলে বাড়ী আমার সঙ্গে যায় না, বাড়ীটা এখানেই থাকে কিন্তু আমি

চলে যাই। সুতরাং বাড়ী এবং আমি ভিন্ন— এক নয়। সেইরূপ শরীর আর আমি আলাদা, এক নয়— এই বোধ যথার্থ হলে আমিত্ব দূর হয়ে যায়।

☛ **শরীর কেন আমার নয়?**

(১) শরীরের উপর আধিপত্য চলে না।

(২) শরীরকে একই রকম রাখতে পারি না। আজ অসুস্থ হচ্ছি, কাল রোগা হয়ে যাচ্ছি ইত্যাদি।

(৩) বেশি খাওয়া দাওয়া করলে শরীর খারাপ হয়।

(৪) শরীরকে যা দেওয়া হয় তা সে নিতে পারে না।

(৫) শরীরের পিছে পিছে আমাদের চলতে হয়।

(৬) শরীরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের কিছু করার ক্ষমতা নেই।

(৭) শরীরকে একদিনে এতটুকুও আয়ত্ত করা যায় না। বহু দিন ধরে, বহু কষ্ট করে সামান্য একটু আয়ত্ত করা যেতে পারে আবার নাও পাবে।

(৮) আমার যেটা ভালো লাগে শরীর সেটা সহ্য বা বহন করতে পারে না।

(৯) শরীর প্রতিনিয়ত আমাকে ছেড়ে রূপ পরিবর্তন করছে।

(১০) আমরা শরীরকে দিয়ে কাজ করাই, সে নিজে করে না, তাই সে পর।

(১১) ভজন, পূজন, সাধন, আরাধনা শরীর করে না। আমাদের মনের ভাব শরীরকে দিয়ে করায়।

(১২) মন আমাদের আর শরীর অপরের, আবার মনের ভাবগুলিও অপরের কাছ থেকে নেওয়া। তাই মন ছাড়া সবই অপরের।

(১৩) বাড়ী তৈরী করতে শরীরকে খাটিয়ে অপরের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। আমার মন। শরীরকেও মাতৃগর্ভ থেকে নিয়েছি, অন্ন জলও অন্যের কাছ থেকে পাওয়া, আলো-বাতাসও অন্যের কাছ থেকে নেওয়া, আমরা যে পথ দিয়ে চলি তাও অন্য কেউ তৈরী করে দিয়েছে, তাই অন্যের কাছ থেকে পাওয়া জিনিস অন্যেরই হয়ে থাকে, তাই আমার আমার করে লাভ কী? অতএব শরীরের জন্য দুঃখ করে লাভ নেই, এই ভাব এলেই শান্তি মিলবে। পরের কাছ থেকে পাওয়া জিনিসের জন্য মায়া করা ঠিক নয়। পরের ছেলে মারা গেলে আমাদের কি দুঃখ হয়? সেই কথা ভেবে শরীরের প্রতি মায়া মমতা রাখবেন না। তাবলে শরীরের যে যত্ন করবেন না তা নয়। দাসীর মত তার সেবা করে যান। তা না হলে বাঁচতে পারা যাবে না। দাসীরা মনিবের সেবা করে কিন্তু তাদের মন পড়ে থাকে ঘরে। তেমনি আমাদের মনকেও দাসীর মত করতে হবে। মনকে ভগবানের চরণে রেখে মনিবরূপে দেহের সেবা করতে হবে। তাহলে মৃত্যুকে ভয় লাগবে না।

আমার শরীর আমার নয়— এটা সর্বদা মনে রাখলেই সংসারের মোহ থাকবে না, মৃত্যুভয় থাকবে না, পরমাত্মার সঙ্গে ঐক্য স্থাপিত হবে। শঙ্করাচার্য থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পর্যন্ত যত মহাপুরুষ জন্মেছেন তারা প্রত্যেকেই পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা মেনেছেন কিন্তু শরীরের সাথে নিজেদের সম্পর্কের কথা কেউ মানেননি। শরীর ও সংসারের সাথে আমাদের মনের ঐক্য নেই— এই বিষয়ে সব আচার্য, সব পন্ডিত, সব দার্শনিক এর এক মত।

☞ **সংসারে কেউ মারা গেলে আমরা দুঃখ পাই কেন?**

কারণ সেই ব্যক্তির কাছ থেকে যে সুখ পেতাম তা আর পাওয়া যাবে না। সে যে অর্থ উপার্জন করত তা আর পাবো না, সে যেভাবে ভালবাসত সে ভালবাসাও পাওয়া যাবে না। তাই তার জন্য আমরা কাঁদি। সংসারে আশি বছরের বৃদ্ধ মারা গেলে আমরা দুঃখিত হই না, কারণ— তার কাছ থেকে আমাদের কিছু নেওয়ার নেই। কোনরূপ সুখ পাওয়ার আশাও নেই। যে লোক দশ বছর ধরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মারা গেল তাতেও আমাদের দুঃখ নেই। কারণ সেই লোকটির অসুখ ভাল হওয়ার নয়। সংসারে উপার্জন অক্ষম ব্যক্তি সহসা মারা গেলে হয়ত সাময়িক দুঃখ পাই কিন্তু সেই দুঃখ আন্তরিক নয়। কারণ বেঁচে থাকলে তার কাছ থেকে কিছু পেতাম না। আসলে আমরা যার কাছ থেকে কিছু পাই না তার মৃত্যুতে দুঃখ করি না। স্নেহ-মায়া-মমতাতেও স্বার্থ কাজ করে।

● সংসারে রবার বলের মতো থাকুন— আটকে যাবেন না ●

সংসারে সবাইকে দিতে হবে কিন্তু পাওয়ার ইচ্ছা করলে চলবে না। পাওয়ার ইচ্ছাতে মানুষ গাধারও দাসত্ব করে। নেওয়ার ইচ্ছা না থাকলে ভগবানেরও দাস হতে হয় না। মাটির পিন্ড বা গোলাকে যেখানেই ফেলা যায় সেখানেই আটকে যায়। সেখানেরই দাসত্ব করতে হয় তাকে। কিন্তু রবারের বল লাফালাফি করে। মানুষ যদি রবারের বলের মত সংসারে সেবার নিমিত্ত অবস্থান করে তাহলে সে আটকে যাবে না। সে সংসারে কাজ করবে কিন্তু নির্লিপ্ত থাকবে। তার কোনদিন দুঃখ থাকবে না।

● জগতে 'আছে'— 'আছির' গুরুত্ব বুঝতে চেষ্টা করতে হয় ●

ভগবান সর্বব্যাপক। সকল দেশ, কাল, বস্তু ব্যক্তি প্রভৃতিতে তিনি পরিপূর্ণ। তিনি আমাদের ছেড়ে তাই কোনদিন থাকতে পারেন না। তিনি যদি আমাদের ছেড়েই দেবেন তাহলে সর্বব্যাপক হলেন কিভাবে?

শরীর বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও বদলে যাচ্ছি বলে আমরা মনে করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা বদলাই না। আমাদের বাল্যাবস্থা শেষ হয়ে গেছে বলে কি আমরাও শেষ হয়ে গেছি? না। আমিত্বের শেষ নেই। তেমনি ভগবানও কোনদিন শেষ হননি। তিনি 'আছেন' আমরা আছি।

আমি আছি— এই ভাবটা শরীরকে নিয়ে। যদি শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকে তাহলে ভগবান 'আছে' ভাবটাই থাকবে। তিনি তো সর্বত্র পরিব্যপ্ত। তাহলে আমি তো তার মধ্যেই আছি। ইচ্ছে করলেই তাকে অনুভব করা যায়। ভগবান নেই বললে অন্তিমে 'নেই'ই থেকে যাবে। তাই অনুভব করুন, শৈশবে যে আমি ছিলাম আজও তাই আছি। অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে— সময় বদলে গেছে, সঙ্গী সাথী বদলে গেছে, ভাব বদলে গিয়েছে কিন্তু আমি বদলাইনি। এইভাবে সমস্ত সংসার বদলে যায় কিন্তু ভগবান বদলান নি। আমরা তাই সংসারের অংশ নই— ভগবানের অংশ।

'আছে' হল সমুদ্র আর 'আছি' হল তার তরঙ্গ। তরঙ্গ শান্ত হয়ে গেলে সমুদ্রতো থাকেই। সুতরাং আমাদের স্বরূপ 'আছে' থেকে অভিন্ন। শুধু বুঝতে হবে আমি তারই। এই রকম ভাব নিয়ে থাকুন 'আছি'টা 'আছে' হয়ে যাবে। 'আছি' আর 'আছে' বদলায় না। এটিই সার কথা। যত সাধু সন্ত আছে সবার এই একই কথা। কথাটি এত সহজ যে সহজেই এর অর্থ সবাই বুঝতে পারে। সংসারে শান্তি পেয়ে 'আছি' ও 'আছে' এর কথা সম্পূর্ণরূপে মনের মধ্যে গেঁথে রাখুন।

● নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য ●

জীবনে আনন্দ লাভ করতে হলে জ্ঞান ও ভক্তির অধিকারী হতে হবে। আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। দুর্বলতা ত্যাগ করে বলতে হবে— 'আমি মানুষের ভাল কাজ করছি। হে ভগবান, তুমি কাছে এসো— আমার সাথে কথা বল!' দেখবেন, আনন্দের বাতাস বইছে মনের মধ্যে। **আমি পাপী, আমি অপরাধী, ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন না— আমি ভক্ত নই— যোগ্য নই— জ্ঞানহীন ভজনহীন বলে ভগবানের কাছ থেকে কখনো দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ নয়।** বলহীন দুর্বললোকের দ্বারা আত্মা বা ভগবানকে লাভ করা যায় না। আমাদের বলতে হবে হে ঈশ্বর, তোমার এই অধম সেবককে উদ্ধার কর।

মা তার অযোগ্য ছেলেকে বেশি নজর দেন। তেমনি ভগবান যখন আমাদের অন্তরে আছেন— নিশ্চয়ই তিনি আমাদের মঙ্গল করবেন।

তাই বলছি তাকে মায়ের মত মনে করুন। জ্ঞান পান্ডিত্য দ্বারা তাকে বিচার করবেন না। কেবলমাত্র ভক্তিতেই লভ্য তিনি। ভক্তির দ্বারা— তার সাথে মিলিত হতে চেষ্টা করলে তিনি হাত ধরে টেনে নেবেন।

'নায়মাত্মা বলহীনেন্ লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।' ভক্ত-ভগবান মা-শিশুর সম্পর্কের মতো। ছোট শিশু যেমন মা ছাড়া আর কাউকে বোঝে না— এও তেমনি। এজন্যে মানুষ দুষ্ট-শিষ্ট যাই হোক না কেন ভগবানের প্রতি তার নিরাশ হওয়া উচিত নয়। ছেলে কাঁদলে মা তাকে তুলে নেবেই। তাই বলছি, নিজের সংসারকে ভগবানের হাতে তুলে দিন। সেই বুঝুক সুখ-দুঃখ।

আপনি যদি ভগবানকে ছাড়া না থাকতে পারেন তাহলে তিনি আপনাকে ছাড়া থাকতে পারবেন না। হয়ত অনেকেই বলবেন— ভগবানকে প্রত্যক্ষ দেখা যায় না— তাই তার প্রতি আমার বিশ্বাস নেই। দেখুন সব প্রত্যক্ষই কী বিশ্বাসের বস্তু? আয়নায় মুখ দেখে আপনি কি সেই মুখকে বাস্তব হিসাবে স্পর্শ করতে পারবেন? না। আবার প্রত্যক্ষ দর্শন না করেও আপনার অদেখা প্রপিতামহকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করছেন। তেঁতুলের টকস্বাদ কি দেখা যায়? খেয়ে অনুভব করতে হয়। বায়ুকে কি ধরা যায়? উপলব্ধি করতে হয়। অথচ বায়ু সর্বত্র বিরাজমান। অতএব **ভগবান উপলব্ধির বিষয়— অনুভবের বিষয়।**

● জীবন দুঃখপূর্ণ, তবু বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা কেন ●

কারণ বেঁচে থেকে সুখ আছে, আনন্দ আছে। সে সুখ উপভোগের সুখ, রূপ-রসাদি বিষয়জনিত সুখ— যাকে বিষয়ানন্দ বলে— তাও সেই পরমানন্দেরই এককণা— রসসিন্ধুর একবিন্দু। বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দেরই অংশবিশেষ— ব্রহ্মানন্দ লাভের দ্বার স্বরূপ। বিষয়ানন্দ লাভ করে পরমানন্দের সন্ধান পাওয়া যায়।

শরীরের সঙ্গে নিজেদের সম্বন্ধ মেনে নেওয়ার জন্যে আমরা শরীরের সুখকে নিজেদের সুখ বলে মনে করি। শরীরের সম্মানকে আমরা নিজেদের সম্মান বলে মনে করি। শরীরের রূপে আমরা বড়াই করি। শরীরের অপমানে আমরা অপমান বোধ করি। এই শরীরকেতো লোকজন একদিন জ্বালিয়ে দেবে। কিন্তু আমাদের মনের নাশ হবে না। সুতরাং সংসার যদি আমাদের আদর করে কিংবা আমাদের নিন্দা করে বা দুঃখ দেয়, শরীরকে টুকরো টুকরো করে তাতে বিচলিত হবেন না। পরমাত্মা স্বরূপ— আত্যন্তিক সুখে অবস্থিত মানুষকে ভীষণ দুঃখ ও বিচলিত করতে পারেন না। কিন্তু আমিও আমার শরীর আলাদা— এই কথাটিকে অনাদর

এবং শরীরের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে শরীরের দুঃখকে নিজের দুঃখ এবং শরীরের সুখকে নিজের সুখ মনে করা— দয়া করে এমন কাজটি করবেন না। এখানে আমি মানে আমার মন।

☛ **নিবৃত্তি নয়, নিস্পৃহতাই হলো জীবনের উদ্দেশ্য।**

পাপ-পুণ্য-দীনতা-অহংকার ভগবৎপ্রাপ্তির পথে বাধাস্বরূপ। শিশুকে কি মায়ের কোলে ওঠার জন্য প্রয়াস করতে হয়; বিদ্বান, শক্তিমান এমনকি শুদ্ধ হতে হয়? ভগবানের সাথে সম্পর্কটাও মা আর শিশুর মত। ভগবান মায়ের চেয়ে এমনকি নিজের শরীরের চেয়েও কাছের। কেননা মা বা নিজের শরীরতো কেবল একজন্মের। ভগবান চিরদিনের। তার কাছে যাওয়ার ইচ্ছাটাই হল বড় কথা।

অপরকে দুঃখ না দিলে ভগবান খুব সন্তুষ্ট হন। তিনি সেই ব্যক্তিকে কাছে নেওয়ার জন্য আকুল হয়ে উঠেন—স্বামী রামসুখদাস।

● সব গতিশীল কেবল পরমাত্মা স্থির ●

যত জীবিত প্রাণী রয়েছে তারা সব মৃত্যুর দিকে চলছে। যা দৃশ্যমান তা অদৃশ্য হচ্ছে। জগৎও চলছে, সংসারও চলছে কিন্তু পরমাত্মা স্থির রয়েছেন। একথা মানতে পারলে মৃত্যুকে আর ভয় লাগবে না, জীবনে কোন কষ্ট বলে অনুভূত হবে না। বিবাহের পর পুরুষকে তার স্বামী বলে মেনে নেয় স্ত্রী। মেনে নিতে কোন কষ্ট হয় না। পরমাত্মাকেও ঠিক এভাবে মেনে নিলেই হল। আমরা টাকা পয়সার জন্য অনেক কষ্ট করছি— কিন্তু টাকা পয়সা পেয়েও সুখী হচ্ছি না। পরিণামে দুঃখ পাচ্ছি।

তাই প্রকৃত সুখ বাইরে থেকে আসে না— আসে ভেতরের উপলব্ধি থেকে। প্রকৃত সুখ হচ্ছে পরমাত্মা প্রাপ্তি। তার সান্নিধ্যে থাকলে দুঃখ বলে কোন কিছুই মনে হবে না। দৃশ্যমান কোন বস্তু হলেই কিন্তু সত্য হয় না। দর্পণে যেমন মুখ দেখা যায় তেমনি সংসারও দেখা যায়। দর্পণের মুখ কিন্তু সত্যিকারের মুখ নয়— মুখের ছবিমাত্র। তেমনি সংসার মানে আপনার আমার ছবিসদৃশ। সে চলমান। তাকে ছেড়ে দিলে ছাড়া যায়। সে নিত্য পরিবর্তনশীল। সেখানে দ্বন্দ্ব-কলহ নিত্য রয়েছে। তাকে জড়িয়ে ধরে রাখা হয়েছে মাত্র। সংসার আর ধনসম্পদ আমাদেরকে কোনদিন সুখী করতে পারে না। এরাইতো আমাদেরকে দুঃখ দেয়। তাই ধনপতি হবেন, ধনের দাস না হওয়াই ভাল। জীবনে অনেক অর্থ সম্পদ এল আর গেল। আপনি কিন্তু ঠিক আছেন। তাই ধনক্ষয়ে ব্যথা না পাওয়াই ভাল। বিবেকবান ব্যক্তিগণ বিনাশশীল বস্তুর মধ্যে রমণ করেন না। ন তেষু রমতে বুধঃ। যিনি

বস্তুকে অস্থির বলে মনে করেন তিনি বস্তুর দাস হন না। বস্তুসমূহকে নিয়ে যে মানুষ সুখী বা দুঃখী হয় সে নিজের অবস্থান থেকে পতিত হয়— ছোট হয়ে যায়।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নো দ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থির বুদ্ধিরসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ (গীতা)।

যে পুরুষ প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হয়ে আনন্দিত হয় না আর অপ্রিয় বস্তু পেয়ে উদ্বিগ্নতা অনুভব করে না— সেই স্থিরবুদ্ধি সংশয়রহিত ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ পরব্রহ্ম পরমাত্মায় একীভূত হয়ে থাকেন।

☞ ত্যাগেই সুখ। যে মানুষ বৈরাগী, ত্যাগী— তাকে দেখে অন্যেরও সুখ হয়। যিনি সংশ্রবজনিত সুখের ভোগী নন সেইরকম ত্যাগী পুরুষ অন্যকে সুখ প্রদান করেন এবং জগতের খুব উপকার করেন। ত্যাগী মহাপুরুষ সংসারের যত উপকার করেন, তত উপকার আর কেউ করতে পারেন না। তাঁকে দেখে, তাঁর কথা শুনেও অন্যের সুখ হয়। এইরকম মহাপুরুষ যদি একান্তে বসে থাকেন তাহলেও তিনি জগতের সুখপ্রদানকারী হন—

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগভবেৎ।।

নিজের প্রতি বৈরীভাব যিনি রাখেন, তাঁকেও তিনি সুখ প্রদান করেন। যার মনে গর্ববোধ এবং স্বার্থ নেই, যাঁর ভাব হলো অন্যকে সুখ প্রদান করা, ভগবানের সেই শক্তির সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে যান— যে শক্তি সমগ্র জগৎকে পালন করছে। এইজন্য ভগবানের দ্বারা সাধিত উপকারে তিনি মাধ্যম হন এবং তার দ্বারা সাধিত উপকারে ভগবান মাধ্যম হন।

☞ স্বার্থবুদ্ধি আর ভোগবুদ্ধি— এই দুটি স্বভাবের পরিবর্তন হলে আত্মার দর্শন হয়।

শুধু সিং থাকলেই তাকে অসুর বলা যায় না। যারা কেবলমাত্র নিজের ভোগের জন্য অনর্থ করে তারা হল অসুর। ক্রোধ এবং মূঢ়তা ততটা ক্ষতিকর নয়, স্বার্থ দোষ যতটা ক্ষতিকর। সাধকের পক্ষে স্বার্থবুদ্ধি খুবই ক্ষতিকারক। সাধন-ভজন-ধ্যান, স্বাধ্যায় প্রভৃতি করছেন কিন্তু স্বার্থদোষ এদিকে অনর্থ ঘটাচ্ছে— সেদিকে কেউ দৃষ্টি দেন না। স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করে অন্যের ভাল করতে চেষ্টা করুন— জীবন সুন্দর হবে। কারণ এক ভগবান সকলের অন্তরে বিরাজমান।

আজকাল আমরা প্রতিটি কাজের বিনিময়ে অহংকারেরই আশ্রয় নিয়ে থাকি। দান ধ্যান করি, ভজন-পূজন করি, জপতপ করি, উপকার করি, সেবা করি - এসবের দ্বারা অহংকারই অর্জন করি, যা হলো আসুরী স্বভাবের মূল। এইটি ত্যাগ

করলে স্বভাবের সংশোধন হবে। অহংকার যদি করতেই হয় ত্যাগের অহংকার করতে হবে। মনে আনন্দ লাগবে।

অহংকার রাক্ষস মহান দুঃখদায়ী সব ভাঁতি।
ভো ছুটে ইস্ দুষ্টসে সোই পাবে শান্তি।। (রামচরিত মানস)

কাকেও কোনদিন বলবে না যে তুমি মন্দ। বরং তাকে বলো—তুমি বেশ ভাল—আরো ভাল হও! যদি তুমি কাউকে সিংহ হতে না দাও, তাহলে সে ধূর্ত শৃগাল হয়ে দাঁড়াবে। (বিবেকানন্দ)

☞ **মানুষের স্বভাবের একটি বিশেষ দুর্বলতা এই যে মানুষ কখনই নিজেকে পরীক্ষা করে না।** সে মনে করে, সেও রাজার ন্যায় সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত। যদি বা সে উপযুক্ত হয় তথাপি তাকে আগে দেখাতে হবে সে তার সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী কর্তব্য সম্পন্ন করেছে কি না! তবেই তার উপর উচ্চতর কর্তব্যের ভার অর্পিত হবে। এ সংসারে যখন আমরা আগ্রহ সহকারে কাজ করতে আরম্ভ করি তখন প্রকৃতিই আমাদেরকে চারদিক থেকে আঘাত করে। তখন তারই সাহায্যে শীঘ্রই আমরা আমাদের যথার্থ মর্য্যাদা খুঁজে পাই, বুঝতে পারি কোথায় কার স্থান!

● বিশ্বাস আর অনুভূতিতেই ভগবৎ করুণা লাভ হয় ●

হে জীবন সংগ্রামে জর্জরিত অসহায় মানুষ, এগিয়ে যাও— এগিয়ে যাও— শুধু বিশ্বাস, বিশ্বাস আর বিশ্বাস— অগ্নিময় বিশ্বাস, সহানুভূতি-সহানুভূতি-সহানুভূতি, অগ্নিময় সহানুভূতি নিয়ে এগিয়ে যাও। তুচ্ছ জীবন— তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা-তৃষ্ণা-তুচ্ছ শীত-বসন্ত, তুচ্ছ গ্রীষ্ম বর্ষা! জয় প্রভু! তুমি দাঁড়াও— তোমার ভক্তরা তোমাকে দেখার জন্য যাচ্ছে। এগিয়ে যাও— পেছনে ফিরে দেখিও না— এগিয়ে যাও— এগিয়ে যাও— **বিশ্বাস আর ব্যাকুলতা নিয়ে এগিয়ে যাও!** (বিবেকানন্দ)

সপ্তম অধ্যায়

সর্বব্যাপী ঈশ্বর দর্শনই শান্তির উপায়

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন— "Whoever loves God in all and whose soul is founded upon the divine oneness, however he lives and acts, lives and acts in God— that may almost be said to sum up the whole final result of Gita's teaching."

ভগবান বলেছেন— আমি সর্বভূতে আছি জেনে সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, সকলের সহিত মিত্রতা ও দানধ্যানাদি দ্বারা যে জীবনধারণ করে আমি তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকি এবং সর্ববিপদ থেকে রক্ষা করি।

বিশ্বপ্রেম বলে যদি কোন বস্তু থাকে তবে তার মূলে আত্মদর্শনজনিত সমত্ব বুদ্ধি। জগতের সমস্ত ধর্মশাস্ত্র, সমুদয় নীতিশাস্ত্রই শিক্ষা দেয়— নিজেকে যেমন পরকেও তেমনি ভালবাসবে। এটাই সর্বব্যাপী ঈশ্বর দর্শন। এতেই আনন্দ, এতেই শান্তি।

● বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে অখন্ড মহাপ্রাণের খেলা ●

বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন জড়ের মধ্যে চিদ্ বস্তুর আভাস। ঋষি অরবিন্দ বলেছেন— Modern Science itself has been driven to the same conclusion. Even in the mechanical action of an atom there is a power which can only be called an inconscient will and in all the works of nature that pervading will does inconsciently the works of intelligence. What we call mental intelligence is precisely the same thing in essence.

সমগ্র সনাতন ধর্মশাস্ত্র সমস্বরে ঘোষণা করছে— সৃষ্টির মূলে সর্বত্রই একবস্তু। প্রাণীতে-অপ্রাণীতে প্রতি অণুতে-পরমাণুতে এক অখন্ড মহাপ্রাণের খেলা। এমন কিছু বস্তু নেই যা এর দ্বারা আবৃত নয়, এমন কিছু নেই যাতে তিনি অনুপ্রবিষ্ট নন। ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদ এবং ধাতব পদার্থের প্রাণস্পন্দন রেখাঙ্কিত করে জগৎকে দেখিয়েছেন— সমস্তই চিন্ময়।

☞ **কোথায়-কোন বস্তুতে তিনি নেই?** তিনি না থাকলে সূর্য এতদিন নিভে যেত— নদীর স্রোত বন্ধ হয়ে যেত— পৃথিবীর অস্তিত্ব লোপ পেত। বেশি দূরে নয়, প্রতিটি বায়ুতরঙ্গে তিনি হাসছেন— চোখ মেলে দেখ। তার লীলার মধ্য দিয়েই তাকে আমাদের বুঝতে হবে— তাকে পেতে হবে। তিনি বেদপুরাণে পুস্তকস্থ, জপে তপে দূরস্থ কিন্তু লীলায় নিকটস্থ— একেবারে সম্মুখস্থ। আমরা

মানসনেত্রে দেখি, সেই রসময়-প্রেমময় মানবদেহ ধারণ করে মানুষের সঙ্গে লীলা করছেন— সকলকে সুমধুরসুরে ডাকছেন— ওরে আয় ছুটে আয় খেলার সাথী আয়রে কাছে আয়রে। তখনই আমাদের হৃদয়ের সন্তাপ দূর হয়। মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে স্বভাবতই তার দিকে ধাবিত হয়। তত্ত্বদর্শিনী মহীয়সী অ্যানি বেশান্ত বলেছেন— When he who is beauty and love and bliss, sheds a little portion of Himself on earth enclosed in human form the weary eyes of men light up, the third hearts of men expand with a new hope and new vigour. They are irresistably attracted to him. Devotion spontaneously springs up.

তাইতো কুন্তীদেবী শ্রীভাগবতে বলে গেছেন—

ভবেহস্মিন ক্লিশ্যমালানাম্ অবিদ্যা কাম কর্মভিঃ।
শ্রবণস্মরণার্হানি করিষ্যন্নিতি কেচন।।
শৃন্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
তত্রবপশ্যন্ত্য অচিরেণ তাবকং ভবপ্রবাহ অপরমং পদাম্বুজং।।

অবিদ্যাবশে কামনাকলুষিত কর্মাদিতে আসক্ত হয়ে জীবসকল অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। শ্রবণ ও স্মরণযোগ্য লীলাপ্রকাশ দ্বারা অবিদ্যাপীড়িত জীবগণকে উদ্ধার করার জন্যই তোমার অবতার গ্রহণ এ আমি জানি কৃষ্ণ। তাছাড়া যারা সতত তোমার পবিত্র লীলাকথা শ্রবণ করেন, গান করেন, কীর্তন করেন, স্মরণ করেন এবং অন্যের নিকট কীর্তন করে বিশ্ববন্দিত হন তারা অচিরেই তোমার ভবনাশন চরণপদ্ম দর্শন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে আমি তাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। অতএব তোমরা যেকোন ভাবেই আমাকে মন দাও—শান্তি পাবে। এ যুগে আমাকে সশরীরে কোনদিন দেখতে পাবে না। কালিতে আমি প্রচ্ছন্ন থাকব— এটা অঙ্গীকার করেছি।

তাই ভগবানকে সশরীরে দেখতে পাব— এ বাসনা মন থেকে মুছে দিন। কেবল তাকে মনে ভাবতে পারি। মনে এটা চিন্তা-ভাবনা করাই উপাসনা। তবে দায় সারা তাকে মনে করলে কোন ফল লাভ হবে না। তার প্রতি চিত্ত স্থির করতে হবে। সে যে আমার একান্ত আপন এটা ভাবতে হবে। সে যে আমাদের সাথে আছে তা ভাবতে হবে, কোনসময় একা আছি— এভাবলে চলবে না।

তিনি ছাড়া আমি নেই—একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে

তিনি ছাড়া আমি নেই— এটা সর্বদা মনে করতে হবে। তাতে শরীরে একটা ভাব আসবে। তাঁর অনুকারী সর্বত্র মঙ্গলময় শক্তি কামনা করতে হবে। তাকে

সর্বদা নিকটে দেখতে হবে, তাঁর স্বভাবের সঙ্গে একস্বভাব হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই মনে হয় আমরা ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে পারব। তার কৃপা পাব। তার স্বভাব প্রাপ্ত হব। আর তাতেই শান্তি।

☛ **মৃত্যুর ভয়ে ভীত হবেন না।** (ডাঃ ভবানীপ্রসাদ শাহু)

"মৃত্যুর জন্য মানুষের অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য দেখা যায়। অনেকে বলেন— মুমূর্ষ ব্যক্তির আত্মাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অদৃশ্য অবস্থায় যমদূত ও বিষ্ণুদূতেরা ঘোরাঘুরি করে বাড়ীর আশেপাশে। এটা নিছক মিথ্যা ও গাঁজাখোয়ী গল্প। মৃত্যুর সাথে যমদূত কিংবা বিষ্ণুদূতের কোন সম্পর্ক নেই। তাদের দেখা বা অনুভব করার কোন প্রশ্ন উঠে না। মৃত্যু একটি জৈবিক প্রক্রিয়া মাত্র। প্রাণবান শরীরের মধ্যে অসংখ্য জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া— বিক্রিয়ার ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা শরীরকে প্রাণচঞ্চল রাখে ও নানাবিধ কাজকর্মের জন্য শক্তি জোগায়। মৃত্যুর ফলে ঐ রাসায়নিক বিক্রিয়ার যেমন কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও তাপশক্তি নির্গত হয় এবং মোমবাতি নিভিয়ে দিলে তা থেকে যেমন কোন আত্মা বেরিয়ে যায় না— এই রাসায়নিক ক্রিয়াটিই বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক তেমনি জীবন্ত শরীরের মৃত্যুর সময়ও একই ব্যাপার ঘটে। নিভিয়ে দেওয়া মোমবাতি যেমন অশুচি হয় না— মৃতদেহ তেমনি অশুচি নয়। মোমবাতি জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ হওয়ার আগের মুহূর্তে যেমন কোন অস্তিত্বহীন প্রাণী ওর চারপাশে ঘোরাঘুরি করে না, তেমনি মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্যও যমদূত কিংবা বিষ্ণুদূত আসে না।

মোমবাতির কোন স্নায়ু নেই— মস্তিষ্ক নেই— সে কোনরূপ চিন্তা করতে পারে না কিন্তু মানুষের তা আছে। মানুষের প্রাণের চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই। তাই একে ঘিরে মানুষ অবিনশ্বর আত্মাসহ হাজার কল্পনা সৃষ্টি করেছে।

বহুদিন পূর্বে দার্শনিকগণ বলে গেছেন— মৃত্যু জীবনের বিস্ময়কর নয়— চরম সত্য। কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি— চির অবসান। মৃত্যু তাই বিভীষিকা নয়। মৃত্যু অনন্ত নিদ্রা ছাড়া আর কী হতে পারে।

দার্শনিক প্লেটো বলেছেন— মানবজীবনে বন্দী আত্মার মুক্তির নাম মৃত্যু। মৃত্যু আত্মার নবজাগরণ। ক্ষুদ্রতায়-অসুস্থতায় জীবন যখন আচ্ছন্ন হয়ে যায় আত্মা তখন নতুন ভাবে জাগরিত হয়। মানুষের মৃত্যুর অর্থ পার্থিব দেহ থেকে আত্মার বহির্গমন মাত্র।

মহাবীর বলেছেন যে চির আনন্দধামে গমনই হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যু মানে শান্তির পথে যাত্রা।

তাই মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে বরং আনন্দের সাথে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা

উচিৎ। মৃত্যু ঘুমেরই নামান্তর। রাত্রে বিছানায় শোবার পর কখন কিভাবে যে ঘুমিয়ে যাই তা মুখে বলা সম্বব নয়। মৃত্যুও তেমনি। তবে মৃত্যুর সময় কাউকে কাউকে যন্ত্রণা অনুভব করতে দেখি— সেটা যন্ত্রণা নয়, পেশীর ক্রিয়ামাত্র। তাই মৃত্যুকে ভয় না করাই ভাল।

মানুষ অমর হলে সংসারে কেউ ভাল থাকবে না। মৃত্যু আছে বলেই জীবনের তীব্রতা। মৃত্যু না থাকলে জীবনের গতি ব্যাহত হত— ছন্দহীন নিষ্করুণ পাথরের মত হত জীবন। তাছাড়া পৃথিবীতে কারো বসবাস করার জায়গা থাকত না। হে মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষ, আপনারাই বলুন চৌদ্দপুরুষ নিয়ে একত্রে গৃহে বাস করতে কী ভাল লাগবে? অসংখ্য বৃদ্ধ মানুষে গৃহ ভরে গেলে সেই ঘরে কী থাকতে ইচ্ছে করবে? মোটেই না। তাই মৃত্যুর জন্য কান্নাকাটি কেন? বরং বলুন— আসুক মৃত্যু আসুক প্রলয় কভু মোরা ডরিব না। Death will come when is cares. I am not concerned.

☞ কেউ কেউ বলেন— মৃত্যু নবজন্মের নামান্তর

মৃত্যু যদি নবজন্ম না হয় তবে একই পিতার পাঁচটি সন্তান পাঁচরকম কেন? রামকৃষ্ণ কিভাবে অতিবাল্যে আত্মসমাধি লাভ করেছিলেন? রবীন্দ্রনাথ কেন তার মহৎ জীবনের বিচিত্র কর্মকাণ্ডে তার জীবন দেবতার সাধনা করে গেছেন?

গীতা কেন বলেছে—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যনানি সংযাতি নবানি দেহী।।"

মানুষ যেমন পুরাতন কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরে, আত্মাও তেমনি জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নবদেহ ধারণ করে। এরই নাম মৃত্যু। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবাত্মা ব্রহ্মালোকে যাত্রা করে।

রাজেন্দ্রলাল আচার্য তাঁর **মৃত্যুর পরপারে** নামক গ্রন্থে লিখেছেন—

রবীন্দ্রনাথের আত্মা বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মাকে বলেছিলেন— এখানে আসার জন্য পাথেয় সংগ্রহ করতে হয়। যেমন বিদেশে বেড়াতে গেলে টাকা পয়সা নিয়ে যেতে হয়—এও তেমনি। এখানের বড় পাথেয় ভগবানের সেবা।

তাই বার্ধক্যে উপনীত হয়ে ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকা দরকার। মানে ভগবানকে সঙ্গী নিয়ে তার সাথে মনে মনে কথা বলতে হবে। অন্তর্য্যামীতো আমাদের অন্তরে আছেনই। তবু তাকে জাগাতে হবে— ব্যাকুলতা নিয়ে ডাকলে অবশ্যই জানবেন।

হিমালয়ের সামনে দাঁড়ালে কিংবা সমুদ্রের দিকে তাকালে অথবা গভীর রাতে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে মনের মধ্যে যেমন একটি ভাবাবেগের

আবেশ হয় তেমনি বিশ্বময় পরিব্যপ্ত ঈশ্বরকে ভাবের আবেগে দেখত হবে। তাতে আনন্দ লাগবে। জগতে এমন বস্তু আছে যাকে দেখতে পাওয়া যায় না অথচ তার একটা সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি— একটা বিরাট অনুভূতি আসছে। তেমনি ভগবানও সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষতর ভাবে বিরাজ করছেন— তাকে ভাব দিয়ে অনুভব করতে হবে। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অন্তর্যামীকে দর্শন করতে হবে। তিনি আমাদের সামনে-পেছনে-পাশে সর্বত্রই রয়েছেন।

বিবেকানন্দ বলেছেন— ভগবৎকৃপা লাভ করতে হলে আত্মবিশ্বাস একান্ত দরকার। (এই কথাটি আমি ইতিপূর্বে বলেছি।) সব দেবতায় বিশ্বাস আছে অথচ আত্মবিশ্বাস যদি না থাকে তবে কোনদিন শান্তি পাওয়া যাবে না। পৃথিবীর ইতিহাস আত্মবিশ্বাসীদেরই ইতিহাস। সেই বিশ্বাসই মানুষের ভেতরের দেবত্বকে জাগ্রত করে। **যখনই কোন ব্যক্তি আত্মবিশ্বাস হারায় তখন তার সব বিনাশ প্রাপ্ত হয়।** যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সে নাস্তিক। (তাবলে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ভাল নয়। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে টাইটানিক জাহাজ ধ্বংস হয়েছিল।)

● মৃত্যুর জন্য বার্ধক্য দায়ী নয় ●

মরতে কেউ চায় না। মরণ যে কোন সময় হতে পারে। তবে বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে মৃত্যু ভয় কেন? মৃত্যুর কথা ভাববেন না। ভাবলেই দুশ্চিন্তা। জীবনের প্রত্যন্ত প্রদেশে দাঁড়িয়ে নতুন দিনের কথা ভাবুন। সকালের জন্য অপেক্ষা করুন। কারণ মৃত্যু আজ বললেই আজ হবে না আবার ১০ বছর পরেও হতে পারে। অতএব সূর্যোদয়ের আশা নিয়ে থাকুন। কাল কি করবেন তার পরিকল্পনা নিন। আত্মবিশ্বাস নিয়ে মানুষের সাথে কথা বলুন। সূর্যোদয়ের হাতছানিতে, ভয়ের গুহায় লুকিয়ে থাকা আত্মঅবিশ্বাসীরা অন্ধকার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসুন।

এসব আগামীর সূর্যোদয় দেখার বাসনা থাকলেই সম্ভব। তাই বারবার বলছি আগামীর জন্য মনকে উৎফুল্ল রাখুন। মৃত্যুর কথা চিন্তা করবেন না। বার্ধক্য মানে মৃত্যুর দেশে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নয়। মৃত্যুর সময় নেই— বয়স নেই। **মৃত্যুর জন্য বার্ধক্য দায়ী নয়।**

Grow old along with me
The best is yet to be.
The lost of life for which the first was made.

বার্ধক্যে শান্তির সবচেয়ে বড় উপাদান হল ভগবানের প্রতি অটুট বিশ্বাস— ষোল আনা বিশ্বাস। যেমন বিশ্বাস আছে সূর্যের উদয়ে, যেমন বিশ্বাস থাকে বর্ষার

মেঘ, বৃষ্টি আর মাটির মমতায়, যেমন বিশ্বাস থাকে ফুল, ফল আর রাত্রির আঁধারে তেমনি ভগবানের প্রতি গভীর আত্মবিশ্বাস। একহাতে অমৃত আর একহাতে বিষের আস্বাদ নিয়ে অটুট বিশ্বাস।

☞ **আত্মশ্রদ্ধাই শান্তির শ্রেষ্ঠ উপায়।** কিশোর কাল থেকে তাই নিজেকে শ্রদ্ধা করতে শিখতে হবে। তেমনি বৃদ্ধবয়সেও নিজের প্রতি রাখুন শ্রদ্ধা— আমি অবিলম্বেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করব। সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আনন্দধামে যাব। যেখানে চির আনন্দ বিরাজিত। সেখানে দুঃখ নেই, শোক নেই, শুধু হাসি আর আনন্দ। জরা-ব্যাধি জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই নেই— একথা ভাবুন।

আমাদের আজ থেকেই ভাবতে হবে আমরা পাপী তাপী নই দুর্বল কাপুরুষ নই। আমাদের ভেতরে জ্ঞান আছে, বোধ আছে, শক্তি আছে। আর আছে প্রেম, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। আমরা সহানুভূতি সম্পন্ন জীব। আমরা যেটা হাতে নেবো সেটাতেই সফল হব।

☞ **ত্যাগেই আত্মদর্শন হয়।** এ জগতে যা কিছু দেখছি প্রতিটি বস্তুতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিরাজমান। সবই ভগবানের সাথে যুক্ত এবং ভগবানের করুণা দ্বারা চালিত। তিনি অকৃপণ হস্তে আমাদের সমস্ত কিছু দান করে চলেছেন।— এই আত্মবিশ্বাস প্রত্যেকের থাকা একান্ত দরকার।

ঈশাবাস্য মিদং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যচিদ্ ধনম্।।

গীতায় ভগবান কৃষ্ণ আর একটি সার কথা বলে গেছেন। ঐ কথাটি হচ্ছে জগতের ভালমন্দ-ভুল ত্রুটি ধর্মাধর্ম সব ত্যাগ করে আমার শরণাপন্ন হও। আমি তোমাদের সর্ব পাপ থেকে মুক্তি দেবো।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং তাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামী মা শুচঃ।।

Abandan all varieties of service and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactians. Don't fear.

উপরোক্ত নির্দেশগুলিতে বিশ্বাস রেখে কর্মপথে আমাদের চলতে হবে। দেখবেন নিজের প্রতি শ্রদ্ধা আসবে। নিজের প্রতি শ্রদ্ধাই আমাদের মনের সমস্ত অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করে দেয়। যেটা দূর সেটাকে কাছে নিয়ে আসে। যেটা দুর্বলতা-তুচ্ছ-ক্ষুদ্র-যেটা অন্ধকার, সেটাকে আলোকিত করে তোলে। এ ক্ষমতা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে। আমরা এই ক্ষমতাটাকে কাজে লাগাচ্ছি না। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আত্মশক্তি নিয়ে চিন্তা করতে অনুরোধ করছি।

• আত্মশ্রদ্ধার গুণাবলী •

(১) জীবনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নিজেকে শ্রদ্ধা করতে অনুরোধ করছি।

(২) আত্মশ্রদ্ধার দ্বারা হৃদয় থেকে একটা শক্তি আসবে। সেটার নাম অন্তরের শক্তি।

(৩) অন্তরের শক্তির দ্বারা মনোবল বৃদ্ধি পাবে। বার্ধক্যকে ভয় লাগবে না। মৃত্যুকে সামান্য একটা দৈহিক পরিবর্তন বলে মনে হবে।

(৪) জীবনের সব সমস্যার সমাধান করতে পারে আত্মশ্রদ্ধা।

(৫) আত্মশ্রদ্ধা ভয় দূর করে। মনে সাহস সঞ্চয় করে। আত্মশ্রদ্ধার দ্বারা কঠিন কাজ সহজে সম্ভব হয়। আত্মশ্রদ্ধাশীল মানুষকে সবাই শ্রদ্ধা করে, নমস্কার ও প্রণাম জানায়।

(৬) আত্মশ্রদ্ধা চরিত্র গড়ার কারিগর। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি কী যৌবনে, কী প্রৌঢ়ে, কী বার্ধক্যে— সকলের প্রীতিভাজন হয়ে থাকেন।

(৭) আত্মশ্রদ্ধার তুলনা বা বিকল্প নেই। এটা মানব জীবনের একটা বড় গুণ।

(৮) আত্মশ্রদ্ধার সাহায্যে যদি দেহ, মন ও হৃদয়— এই তিনটিকে গড়ে তুলি তাহলে আমরা ঠিক চরিত্রবান হয়ে উঠব।

অষ্টম অধ্যায়

জীবনে কোনমতেই যখন শান্তি পাচ্ছেন না তখন একটি নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করুন

আমরা সর্বদা আনন্দ খুঁজছি। প্রথম জীবনে আনন্দ খুঁজেছি মায়ের বুকের অমৃতে, দোলনায় শুয়ে, রঙিন খেলনায় আর আপনজনদের ক্রোড়ে। তারপর আনন্দলাভ করেছি ক্ষণভঙ্গুর খেলাঘরে— তারপর খেলার মাঠে। যৌবনে আনন্দ খুঁজি রঙিন স্বপ্নের মাধ্যমে আর ঘরছাড়া দূর কল্পনায়। তারপর সাংসারিক জীবন। ভুলে যাই খেলাঘর, খেলার মাঠ আর স্বপ্নের রাজ্য। জড়িয়ে পড়ি সমাজ সংসারের নানা ঝামেলায়। যতই পরিণতির দিকে এগিয়ে যাই ততই হতাশা গ্রাস করে। নিজেকে বড় একা বলে মনে হয়। সবাইকে যেন প্রতারক বলে ধারণা হয়। সবাই যেন আমাকে ঠকাতে চায়। সকলেই যেন মুখোশ পরে ঘুরছে। নিজের দৃঢ় বিশ্বাস, অকুণ্ঠ ভালবাসা, সত্যের জন্য সংগ্রাম ও জীবনের মূল্যবোধগুলিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য সহকারে পদদলিত হতে দেখে মনের ভিত্তি প্রস্তর যেন ক্ষেপে উঠে। যাদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছি, যাদের জন্য অন্যের সঙ্গে তিক্ত বিবাদে লিপ্ত হয়েছি, যাদের জন্য ব্যক্তিগত সুখকে উপেক্ষা করেছি— সেই স্ত্রী পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজন— প্রতিবেশি, সমাজ, পাড়া, ক্লাব, সংঘ-সংগঠন বা রাজনৈতিক দল কোন না কোন একসময় যেন আমার বা আপনার প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠছে। এটা জগতের স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাস পুরাণ ও মহাকাব্যের পাতা খুলে এমন কি মহাপুরুষদের জীবনে এই নগ্ন সত্য যাচাই করতে পারেন। সাধারণ মানুষের কথা বলাই বাহুল্য।

এটা লক্ষ্য করে থাকবেন যে মানুষ যতই পরিণত বয়সের দিকে এগিয়ে চলে ততই সে হতাশ বোধ করে। আমরা জীবনে অনেক রঙিন স্বপ্ন দেখি, অনেক কিছু আশা করি কিন্তু বাস্তবে এসে যখন সেই আশার বস্তুকে প্রতিষ্ঠা করতে না পরি তখনই হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ি। এই তিক্ত হতাশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা আর এক আশার জাল বুনি। নিজের মনকে ভুল বুঝাই। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে নিজের থেকেই এক অলীক ধারণা নিয়ে আবার নতুন উদ্যমে সেই আশার Blue Print তৈরী করতে থাকি। ভাবি, এবার নিশ্চয়ই ব্যর্থ হব না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনিশ্চিত বাস্তবতা আমাদের ঠকায়, হতাশ করে। আবার একটা উদ্যম নিয়ে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করি। এভাবে স্বপ্নের ভাঙা গড়ার মাধ্যমে যখন আমরা ক্রমশঃ পরিণত বয়সের দিকে এগিয়ে যাই তখন বুঝতে পারি যে বহুদিনের

আকাঙ্ক্ষা অনুসারে এই জগৎ সংসারে বাস্তবতা তৈরী করা অন্ততঃ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আশার আলো চিরদিনের জন্য অক্ষমতা ও বিড়ম্বনার দমকা হাওয়ায় নিভে যায় আর হতাশার অন্ধকারের নৈরাশ্য আমাদেরকে অক্ষম ও অন্ধ করে তোলে।

এখন প্রশ্ন হল কিভাবে আমরা এই হতাশারূপ শয়তানের চক্র থেকে মুক্তি পেতে পারি?

আমরা দু'টি জগতে বাস করি। একটা মনোজগৎ আর অপরটা বস্তু জগৎ। যাকে বলে Mental world and Material world. একে আবার বিভিন্ন নামেও বলা যায়। যেমন External world and Internal world বা Objective and Personal world. যাই হোক, হতাশা-দুঃখ-জ্বালা যন্ত্রণাপূর্ণ জীবনে শান্তি পেতে হলে আমাদেরকে এছাড়াও একটা নতুন পৃথিবী তৈরী করতে হবে। সেখানকার রাজা হব আমি। সেটা হবে আমার Extra personal world. সেখানে আমি একেবারে একা। সেখানে কারো প্রবেশের অধিকার নেই। এমনকি সেখানে আমার বাবা-মা, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বোন ও বন্ধু-বান্ধব কেউ প্রবেশ করতে পারে না—তথাকথিত মান-সম্মান, রাজনীতি, সংস্কার-কুসংস্কার মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি তো দূরের কথা।

কিন্তু ভেতরের জগতের (Internal world) সম্পর্কে এই Water tight বা মন নিরোধক ধারণাটি কেবলমাত্র কতকগুলি খুব উঁচু দরের মানুষ বা সাধুযোগীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের ভেতরের জগৎ আর বাইরের বস্তুর মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই।

যেসব নদী আর ভেতরের মাঠের মধ্যে lock gate নেই গ্রীষ্মের সময় সেই নদীর জল যেমন তপ্ত মাঠে প্রবেশ করে সোনার ফসল ফলায় তেমনি আবার বর্ষার সময় অবাঞ্ছিত ঘোলা জল অবাধে মাঠে প্রবেশ করে সবুজ ধান পচিয়ে দিয়ে যায়। সেইরূপ আমাদের সাধারণ মানুষদের ভেতর ও বাইরের মধ্যে কোন Safety valve বা সুরক্ষা পর্দা না থাকার জন্য বাইরের জগৎ (সমাজ সংসারই হোক আর প্রকৃতি জগতই হোক) অবাধে ভেতরের জগতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। যখন সে আমাদের অনুকূল থাকে তখন আমরা আনন্দ লাভ করি আর যখন প্রতিকূল হয়ে উঠে তখন আমরা দুঃখ ভোগ করি বা হতাশাগ্রস্থ হয়ে উঠি। আমাদের নিজস্ব জগৎ না থাকার জন্য আমরা তখন কোথাও আর আশ্রয় পাই না। চরম মুহূর্তে মানসিক ভাবে আশ্রয় হারা হয়ে অনেকেই শেষ আশ্রয় হিসাবে মৃত্যুকেই বেছে নিতে বাধ্য হই। এ ঘটনা আমাদের মত সাধারণ মানুষের জীবনেই নয়, অনেক

বিখ্যাত পন্ডিত থেকে শুরু করে বহু রাষ্ট্রনেতা, শিল্পপতি, চিত্রতারকা, নামী খেলোয়ারদের জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটছে। খবরের কাগজগুলোতে চোখ রাখলেই বোঝা যায়।

তাই শান্তি ও আনন্দ পেতে হলে আমাদেরকে একটি Extra Personal world তৈরী করতে হবে।

☞ কিভাবে আমরা Extra Personal world তৈরী করতে পারি?

প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে সাধারণ মিল থাকলেও প্রকৃত অর্থে কোন এক ভাবে প্রতিটি মনের singularity আছে। আর তা থেকেই যে যার প্রত্যেকেরই একটা Tendency বা ঝোঁক আসে। সেই Tendencyটি কী তা আমাদেরকে ঠিক করতে হবে। আমাদের মন জন্মগতভাবে, গঠনগতভাবে বা প্রবৃত্তিগতভাবে কাব্যিক কিংবা ধর্মীয় ভাবপ্রবণ বা আদর্শবাদী দার্শনিক চিন্তাধারা সমন্বিত বা দুঃখবাদী কিংবা নৈরাশ্যবাদী তা আমাদের নিজেদেরকেই ঠিক করতে হবে। যার মন যেদিকে যেতে চায় বা যেভাবে গঠিত বা যে বিষয়ে আগ্রহী সেই দিক চিন্তা করে নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করা দরকার।

তবে এইভাবে মনের জটিল প্রবণতাগুলিকে ভাগ না করে সরল কল্পনার দ্বারা একটি নতুন আনন্দপূর্ণ জগৎ তৈরী করা ভাল। এই জগৎ হবে স্রেফ্ কাল্পনিক। তবে তা এমনভাবে করতে হবে যেন তার অস্তিত্ব বা existance বাইরের জগতের উত্থান পতনের দ্বারা আক্রান্ত না হয়।

আমরা নিজের শরীরটিকেই ভাল করে জানি না। আমাদের পিঠ, ঘাড় ও পশ্চাদদেহ সম্পর্কে ধারণার পুরোটাই কল্পনামাত্র। নিকট পরিজনদের মুখখানিকেও আমরা ভাল করে দেখিনি। আমাদের নিজের ছেলের কানের গোড়াটিও দেখিনি। আরো অন্যান্য অঙ্গগুলির কথা ভাবতে গেলে আমাদের কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়।

একজন মানুষকে ভাবতে গেলেও কল্পনার দরকার। আমরা অনেকেই মথুরা, বৃন্দাবন কিংবা উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু, মহাসমুদ্রের তলদেশ, প্রান্তদেশ— এমনকি গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্রলোককে সারাজীবন ধরে কল্পনার নেত্র দিয়েই দর্শন করে মনের সাধ মেটাচ্ছি। লোকমুখে শুনে কিংবা বই পড়ে বিভিন্ন দেশ-সমাজ-রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণা নিচ্ছি কল্পনা দ্বারা। এমনকি আমাদের ইপ্সিত বস্তুটির প্রাপ্তিকে কল্পনার অনুলেপন দিয়ে প্রত্যক্ষ করে আনন্দ অনুভব করি, তৃপ্তি মেটাই। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— **আমরা যাকে চাই সে আমাদের মানস সরোবরের অগমতীরে বাস করছে। সেখানে কেবলমাত্র কল্পনাকে পাঠানো যায়— সশরীরে যাওয়া যায় না। স্বর্গ থেকে**

দেবতারা মর্তধামে এসে পূজা নিয়ে যান— এতো কল্পনামাত্র। কাজেই কল্পনাকে কোনমতেই ছোট করে দেখতে পারি না।

এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী **আলবার্ট আইনস্টাইন** বলতেন যে উচ্চতর পদার্থকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তা করা বা কল্পনার ধ্যাননেত্রে দর্শন করাটাই তার কাছে বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার চিন্তার ফলের সাথে বাস্তব প্রকৃতির মিল থাক বা না থাক তাতে কোন যায় আসে না। নব নব চিন্তালোকে পৌঁছে তিনি নিয়ত অনাবিল আনন্দ আস্বাদন করতেন। একেই তিনি বলেছেন— Delight of higher thinking. আর সে চিন্তার কোন এক অংশ যদি $E = mc^2$ এর মত বিখ্যাত সমীকরণের জন্ম দেয় তাহলে চিন্তা বা কল্পনা শক্তিকে গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষে বাধা কোথায়? মানুষের অধিকতর কল্পনা শক্তিই আজ বাস্তবে রূপান্তরিত। যে চাঁদে যাওয়ার জন্য একদিন মানুষ কল্পনা করত আজ তা বাস্তবায়িত।

অতএব আমাদের একান্ত জানা দরকার, সব বস্তুরই মূলশক্তি নিহিত রয়েছে তার ভেতরের Micro world এ বা Personal জগতে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে তার এক নিজস্ব ভেতরের জগৎ রয়েছে। সেখানে বিনা অনুমতিতে বাইরের জগতের কোন প্রবেশাধিকার নেই। সেই অপূর্ব সৃষ্টির জগতে তার নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য। যেহেতু তিনি কবি ছিলেন তাই নিজের ব্যক্তিগত জগৎ বা Personal world টিকে কাব্যিক কল্পনা দিয়ে তৈরী করেছিলেন। তা না হলে অতি বেদনাভরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে জড়িয়ে থেকেও 'গীতাঞ্জলি'র পাতায় পাতায় ঈশ্বরানন্দ অনুভব ও সৃষ্টি করতে পারতেন না।

গান্ধীজি ভারতের মত একটি বিরাট দেশের জাতীয় সংগ্রামের কর্ণধার ছিলেন। তাও আবার এক নতুন পরীক্ষামূলক অহিংস-অসহযোগ পদ্ধতির সাহায্যে। যে স্বপ্নের ভারত তিনি সবার কাছে তুলে ধরেছিলেন সে ভারত পেলেন কই? নিজের চোখের সামনে সেই ভারতকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখলেন। যে অহিংসা ও সত্যাদর্শের জন্য তিনি সারাজীবন সাধনা করে গেলেন সেই আদর্শকে চোখের সামনে পদদলিত হতে দেখলেন তার একান্ত অনুগত অনুগামীদের দ্বারা। তাতেও তিনি হতাশ হননি। দুঃখে ব্যথায় ভেঙে পড়েননি। আসলে তার মধ্যে দুটো সত্ত্বা কাজ করছিল। তার ভেতরের সত্ত্বায় তিনি ছিলেন তার নিজস্ব জগতের অধিকর্তা। সেখানে উন্মত্ত জনতা নেই, নেই সেই শোষক ইংরেজ— এমনকি স্ত্রী-পুত্র-পরিজনেরাও নেই, নেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার একগুঁয়ে পাগলামি। সেখানে রয়েছেন তাঁর প্রাণপুরুষ ভগবান রামচন্দ্র। সেই রামচন্দ্র কিন্তু পুরাণের বা ইতিহাসের রাম

নন। অথচ সেই রাম দিয়েই তৈরী তার মনের রামচন্দ্র, শান্তির রামচন্দ্র, আনন্দের রামচন্দ্র আর পরম তৃপ্তির রামচন্দ্র। গান্ধীজির সেই রাম তার চেতনারই যেন অন্য এক দিক। সেই রামকে কোন বিধর্মী ভাঙতে পারে না— কোন ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা খাটো করতে পারে না— সেই সীতাপতি রামকে কোন বাইরের বিড়ম্বনা বিক্ষুব্ধ করতে পারে না। তার এই ভেতরের মধ্যে রামজগৎটি ছিল বলেই তিনি গান্ধী হতে পেরেছিলেন। তার অন্তরের মধ্যে এই অন্য জগৎ ছিল বলেই তিনি স্বীয় আদর্শের অবমাননা সত্ত্বেও শিশুর মতো নির্মল হাসিতে মুখ ভরিয়ে, মানুষের সঙ্গে প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে নিজেকে জড়িয়ে মৃত্যুবরণ করে অস্তগামী সূর্যের মত দিগ্বিদিক রাঙিয়ে দিয়ে গেলেন।

চৈতন্যদেবের চেতনা ছিল কৃষ্ণময়। বাস্তবের একটা ডোবা তার কাছে ছিল বৃন্দাবনের সেই রাধাকুন্ড। এখন তিনি যদি বাস্তবে সেই দ্বাপর যুগের রাধাকুন্ড না পেয়ে বিলাপ করে বেড়াতেন তাহলে তিনি আনন্দ পেতেন কিভাবে?

অতএব বাইরে যখন সম্ভব নয়, তখন রাধাকুন্ড আমাদের মনের জগতেই খনন করতে হবে। ডুব দিতে হবে সেখানে। মনের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে যমুনার উচ্ছ্বলিত জলধারা— কালিন্দীর কলকল্লোল— কদম্বতলে সখীদের লীলাখেলা আর কৃষ্ণের সুমধুর বংশীনিনাদ। মনের সিংহাসনে প্রাণের ঠাকুরকে বসিয়ে মানসলোকেই করতে হবে তার আরাধনা— মনের জগতেই সৃষ্টি করতে হবে নব বৃন্দাবন— দর্শন করতে হবে সেই গোষ্ঠলীলা— সেই কালীয় দমন— সেই রাধাকৃষ্ণের নিত্য রাসলীলা। মনের জগতেই কান পেতে শুনতে হবে—

গোপালকে দড়ি বেঁধে রাখিস না আর
ছেড়ে দে মা জননী
মাখন চুরি করুক গোপাল
চুরি করে খাক ননী।

বাস্তব জগতের কঠোরতা— গ্রীষ্মের দাবদাহ— শীতের রুক্ষতা যতই আপনাকে পীড়া দিক সেসব ভুলে যেতে হবে। আমাদের আরো স্মরণ রাখতে হবে যে আমরা যতই যোগ্যতাসম্পন্ন হই না কেন— যতই অসীম ক্ষমতার অধিকারী হই না কেন, কখনই বাইরের প্রকৃতি আর মনুষ্যজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। জগৎ গঠনগতভাবেই আমাদের আয়ত্বের বাইরে। কাজেই আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাসনা-পরিকল্পনা, মূল্যবোধ-আদর্শ, আস্থা-বিশ্বাস, স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা-শ্রদ্ধা, রাজত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলিকে কখনই বাস্তবে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হতে দেখতে বা পেতে পারব না। হয়ত কেউ কেউ আংশিক পেতে পারেন।

কাজেই চিরস্থায়ী শান্তি ও আনন্দের জন্য আমাদেরকে একটি নিজস্ব আন্তর্জগৎ তৈরী করতেই হবে। সে জগতের উপর আপনার বা আমার সম্পূর্ণ অধিকার। সে জগৎ আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। তাকে আপনি ইচ্ছামত ভাঙুন-গড়ুন— ঠিক যেমন শিশুরা তাদের বাল্যের খেলাঘর ইচ্ছেমত ভাঙে-গড়ে।

শিশুরা এভাবে খেলাঘর ভাঙতে-গড়তে পারে বলেই নিত্য আনন্দে লুটোপুটি খায়। তাদের জীবনে নতুন প্রাণের লহর বয়। তাদের হাসির উচ্ছ্বলতাই বনে বনে ফুল ফোটায়। তাদের মতো অনাবিল আনন্দে আর কেউ থাকতে পারে না।

আমাদের সকলের অন্তরের মধ্যেও এক চিরন্তন শিশুসত্ত্বা সুপ্ত হয়ে রয়েছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই শিশু কিন্তু বুড়ো হয় না। কেবলমাত্র ভালবাসার অভাবে, সহানুভূতির অভাবে, অবাঞ্ছিতের মত সে মনের এককোণে পড়ে থাকে।

কচি হাত বড় হয়ে যখন ঝিনুকবাটি ছেড়ে খুন্তি ধরে আর ক্ষুদ্র কোল বৃহৎ হয়ে দাঁড়ায়, যখন পুতুল ফেলে পুত্র তুলে নেয় তখন সেই চিরন্তন শিশু ভাবে— এত স্থায়ীত্ব, এত হিসাব— এ আমার জন্য নয়। হঠাৎ করতে সে একা হয়ে পড়ে। চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে মনের অন্তস্থলে। তাই যারা মনের মধ্যে সেই চিরন্তন শিশুকে হৃদয়মধ্যে জাগিয়ে রাখতে পেরেছেন তারাই ধন্য। বাইরের জগতের কোন বাধা-বিঘ্ন-ব্যথা-বঞ্চনা হতাশ করতে পারে না। তাই বলছি, আপনি আপনার মনের খেলাঘরে ইচ্ছামত খেলতে থাকুন, কেউ বাধা দেবে না। ধর্ম, কাব্য, শিল্প— যা ভালবাসেন তাই করুন।

খেয়াল রাখবেন কখনই আপনার ভেতরের জগতের মূল ভিত্তিপ্রস্তরটি বাহিরের জগতের কোনকিছুর ওপরেই স্থাপন করবেন না। বাইরের জগতের ভিতটি এমনই যে এর সব পাথরই একবার না একবার নড়বেই। এজগৎ ভূমিকম্পপ্রবণ স্থান। এখানে সুখের রাজপ্রাসাদ অপ্রত্যাশিত ও অবিশ্বাস্যভাবে কোনদিন না কোনদিন ভেঙে পড়বে। হয়তো সে ভাঙন হল বৃদ্ধবয়সে। তখন অনেক দুঃখ সহ্য করতে হবে। তখন সবচেয়ে খারাপ পথটাই হাতছানি দেবে মুক্তির পথ হিসাবে।

তাই আমাদের সর্বদা সাবধান থাকতে হয়। কোনমতেই অন্তঃরাজ্যের ভিত্তি বাইরের জগতে স্থাপন করা উচিত নয়। করলেও কাঠের বাড়ীর মত। যতই গভীরভাবে স্থাপন করবেন ততই আপনার বিপদের সম্ভাবনা। বাইরের ন্যূনতম কল্পনাটিও ভেতরে সঞ্চারিত হবে। তখন দুঃখের অবধি থাকবে না। তবে যদি ইতিমধ্যে ভেতরের ঘরের খুঁটি বাইরে পুঁতে থাকেন আজ থেকেই তাকে তুলে ভিতরে স্থাপন করার চেষ্টা করুন। এককথায় বাস্তব আর কল্পনাকে কোনদিন একাকার করবেন না।

এমন অনেক দৃষ্টান্তই রয়েছে যেগুলো ভূমিকম্পের মত মানবজীবনের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ আর স্পর্শকে ধূলিস্যাৎ করে দেয়। আপনি রূপবতী, গুণবতী ও পতিব্রতা নারী পেলেন জীবনে। সুখেই আপনার জীবন কাটছে। ঘটনাক্রমে কোন কারণে সেই স্ত্রীর তিনটি গুণই চলে গেল অথবা তার ঐ তিনটি গুণই নকল বলে আপনার কাছে প্রমাণিত হল। তখন কীরূপ অবস্থা হবে আপনার ভেবে দেখুন। আপনার দীর্ঘদিনের বিশ্বাস আর রোমান্সপূর্ণ চিরবসন্তের বাগানে হঠাৎ করে দাবানল জ্বলে উঠল। আপনি দিশেহারা হয়ে পড়লেন। বাণবিদ্ধ পাখির মত করতে লাগলেন ছটপট। দাবানল নেভাতেও পারছেন না আর পরিবেশ পরিস্থিতি ও নৈতিক দায়বদ্ধতার জন্য কোনমতেই সেই স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করতেও পারছেন না। আপনার ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে, আপনার বয়স হয়েছে। এখন আপনার গালে হাত দিয়ে বসা ছাড়া আর উপায় নেই।

এতক্ষণ যে ঘটনাটি বললাম তা বাইরের জগতের। আপনি কিন্তু কষ্ট পাচ্ছেন ভেতরের জগৎ নিয়ে। আপনার ভেতরের জগতটা আসলে বাইরের জগতেরই প্রতিরূপ। তাই বাইরের বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভেতরেও তার প্রতিফলন হয়।

সুতরাং আমাদেরকে একটা ব্যক্তিগত আকার-আদর্শ বা Subjective ideal form বা Conception তৈরী করতে হবে। তৈরী করতে হবে নিজ নিজ অভিরুচি ও আদর্শ অনুসারে এক একটি মানস প্রতিমা। কল্পনার খড়-মাটি আর রঙ দিয়ে তাকে সাজাতে হবে মনের মত করে। তার রূপ-গুণ আর সতীত্বে কালের প্রভাব কোনদিন কালিমা ফেলতে পারবে না। তাতে আপনার Unconscious mind বা অবচেতন মন হয়ে উঠবে সক্রিয়।

তবে শর্তটা হল আপনাকে মাঝে মাঝেই তার সঙ্গে একান্ত নিভৃতে একবার করে দেখা করতে হবে, কথা কইতে হবে। দিনের বেলা অর্ধেক কথা কইবেন অর্ধেক রাতে। কিন্তু এভাবে তো মনে মনে কথা বলে বেশিদিন চলে না। বিরাট মাপের কবি-সাধক বা চিন্তাবিদরা হয়ত বাইরে নিরপেক্ষ হয়ে ভেতর নিয়েই কাটিয়ে দিতে পারেন সারাজীবন। কিন্তু সাধারণ মানুষরা পারবেন কেন?

তাহলে এখন কী করতে হবে? বাইরের রক্তমাংসের দোষ-গুণে জোড়ানো মেয়েটিকে বা ছেলেটিকে ভেতরের জগতের অনুরূপ করে উপভোগ করতে হবে। তখন বাইরের প্রতিমা ভেতরের রূপ নিয়ে ভাস্বর হয়ে উঠবে আপনার হৃদয় আকাশে।

মনে মনে মানস সীতা তৈরী— আমরা চেষ্টা করলেই পারি। চঞ্চল স্বামীকেও রামচন্দ্র কিংবা কৃষ্ণ বানাতে পারি। নিজের মনের মত করে গড়তে পারি আমাদের

আপনজনকে। এসব আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। অকারণে আদর্শকে ধরে রেখে দুশ্চিন্তায় ভুগে কোন লাভ নেই।

● নতুন পৃথিবীতে আছে অনাবিল আনন্দ— আছে রোমান্সের প্রাণপ্রাচুর্য ●

ব্যস্ততা কিংবা চাঞ্চল্যের মধ্য দিয়ে নতুন পৃথিবী গড়া যায় না। জীবনের গতি যখন মন্থর হয়ে আসবে, সংসারের প্রতি যখন বিতৃষ্ণা আসবে, এই দুনিয়া যখন বিস্বাদ লাগবে, পাশাপাশি লোভ লালসা কামনা বাসনার বৃহৎ ভুজঙ্গগুলো যখন আপনার চারপাশে কিলবিল করবে তখন আপনি ওদের ঐসব মনোবৃত্তিগুলোকে এই পুরানো পৃথিবীর একপাশে 'তিষ্ঠ' বলে রেখে নতুন পৃথিবী গড়ার দিকে ধাবিত হবেন। অনন্ত আকাশের রঙীন হাতছানি— মুক্ত বাতাসের হৃদয়দুলানো ইশারা— নীল অশান্ত সমুদ্রের জলকল্লোল— মহাব্যোম পারাবারের অসীম নীহারিকার মৌনসজাগ কৌতুহলী দৃষ্টি আপনাকে অপার আনন্দ দেবে— আপনার হৃদয়কে বিচিত্র রঙে-বিচিত্র বর্ণে রাঙিয়ে তুলবে। আপনার নতুন পৃথিবী গড়ার কাজে সহায়তা করবে। আকাশ-বাতাস-চন্দ্র-তারা আর সাগরজলে আপনার শুষ্ক হৃদয় হয়ে উঠবে উৎফুল্ল ও শান্তির ঝর্ণা।

অজস্র পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বহু বিচিত্র ফল-ফুলসমন্বিত বর্ণসম্ভারে সুসজ্জিত বনরাজি নীলা, অনন্ত সমুদ্র, রাজ্য-রাজধানী-প্রাসাদ-মঠ-মন্দির দিয়ে সাজিয়ে তুলুন আপনার মনের পৃথিবীকে। সেখানকার অজস্র প্রজাবৃন্দকে পাশে রেখে রাজসিংহাসনে বসুন আপনি। সামনে বহু অলংকার সমন্বিত স্বর্ণখচিত করে আপনার ঈষ্টদেবের একটি মন্দির নির্মাণ করুন। তারপর স্বর্গ থেকে সেই দেবতাকে নামিয়ে আনুন মহাসমারোহে, বহুবিধ বাদ্যবাজনা সহকারে আপনার মন্দির চত্বরে। সহস্র ঘট আর প্রদীপ জ্বেলে সহস্র রূপবান যুবক ও রূপসী দ্বারা নৃত্যারতি সহ সহস্র ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে আপনার অন্তর জগতে নির্মিত ঐ সোনার মন্দিরে সেই দেবকে করুন প্রতিষ্ঠা। আপনার সেই আনন্দ উৎসবে ঈর্ষা করার কেউ নেই— বাধা দেওয়ার কেউ নেই। কর্তৃত্ব করার মতও কারো সাহস নেই। সবকিছুই আপনার নিজস্ব। নিজের দ্বারা পরিচালিত।

তারপর আপনার সৃষ্ট পৃথিবীর মধ্যে সর্বাঙ্গসুন্দর যুবক ও সুন্দরীদের আপনি ইচ্ছামত বিবাহ করে রাজঅন্তপুরে আনবেন। বলতে ভুলে গিয়েছি, আপনি রাজা বা রানী হওয়ার পুর্বে দেশের সেরা শত সহস্র মিস্ত্রিদের এনে আপনার নিজের বিশাল প্রাসাদটি নির্মাণ করবেন। বহু দাস-দাসী, দারোয়ান দিয়ে ভরিয়ে দেবেন সেই প্রাসাদ। আপনার রাজ্য ও রাজপ্রাসাদে কারো কোন দুঃখ নেই, ব্যথা নেই,

হিংসা নেই, ঈর্ষা নেই— সবাই যেন স্বাধীন সুখী বাধা বাঁধনহারা। সেখানে আছে শুধু আনন্দ কেবল। সেখানে মা আছে, মাটি আছে, পাতা নেই শিকারীর কল। প্রজারা সেখানে আপনাকে গভীরভাবে ভালবাসে। দিনের পর দিন উপঢৌকন পাঠায়। তাদের কর দিতে হয় না— কঠোর পরিশ্রম করতে হয় না। ক্ষুধা, তৃষ্ণাও তেমন নেই সেখানে। গাছের ফলে, ঝর্ণার জলে মানুষ আনন্দে উদর পূর্ণ করে। সেখানে জরা নেই, ব্যাধি নেই, জটিলতা নেই, পীড়া নেই, পীড়ন নেই, ভয় নেই— আছে শুধু দয়া-মায়া-স্নেহ-প্রেম আর বাৎসল্য। সেখানকার ভুবন হাসি আর গানে ভরপুর আর আপনার হৃদয়ও আনন্দের কোলাহলে পূর্ণ।

অসংখ্য প্রেমিক-প্রেমিকা নিয়ে আপনি মত্ত রয়েছেন সেখানে। রানীরাও তাতে বাধা দেননি। বরং তারা আপনাকে আনন্দ দিতে সহায়তা করে।

দিনের পর দিন আপনি এক একটি প্রেমিক বা প্রেমিকা নিয়ে মেতে উঠুন আপনার যৌবনকালের মত। নীল আকাশের নীচে সবুজ বনানীর পাশে বাসর সাজিয়ে অপেক্ষা করুন— প্রিয়তমা আসবে। তারপর যখন সে আসবে তাকে আদর সোহাগে কোলে বসান— আলতো করে হাত বুলিয়ে দিন তার কোমল অঙ্গের প্রতিটি ভাঁজে— চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিন তার দেহ আর অস্ফুট সুরে আবেশ বিহ্বল কণ্ঠে গাইতে থাকুন— তোমায় যেদিন দেখেছিলাম ভোরবেলায়
শতদল হয়ে ফুটেছিলে সরোবরে।

এইভাবে গানে গানে আদর আপ্যায়নে ভরিয়ে দিন, কাটিয়ে দিন সেদিনের সেই মধুরাত। মন তৃপ্তিতে যেমন ভরে যাবে, তেমনি আনন্দের প্লাবনে আপনি উচ্ছ্বসিত হবেন।

আপনি যদি আপনার নতুন জগতের রানী হন তাহলে আপনার প্রেমিকাকে নিয়ে আনন্দে মেতে থাকুন। আবার ইষ্টদেবকেই প্রেমিক করে তাকে কোলে নিয়ে রাজরানী মীরার মত গাইতে থাকুন—

'রাজরানী মীরা ভিখারিণী তোমারই লাগিয়া গো
তোমারই লাগিয়া।'

অথবা

'আমার অন্তর মন্দিরে জাগো মাধব কৃষ্ণগোপাল।'

আবার কোনদিন হয়ত আপনি আপনার অভিমানিনী নায়িকার জন্য ভাবছেন। কী করে তার অভিমান ভাঙাবেন। ভাববার কোন কারণ নেই। তাকে দেখে দূর থেকেই বলুন—

'তুমি মোর প্রিয়া হবে এসো রানী
দেবো খোপায় তারার ফুল।'

দেখবেন, সেই নায়িকার মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। তাতে যদি না হয় তাহলে বলুন— ওগো আকাশ, ওগো বাতাস, ওগো নদনদী-বন-পাখী-মহা অরণ্যানী, আমার প্রিয়ার অভিমান ভাঙিয়ে দাও! সে যে তোমাদের কোলে মুখ লুকিয়ে অভিমান করে বসে আছে। বলেই তার কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে বেঁধে তাকে বলুন—

'কত যে সাগর নদী পেরিয়ে এলাম আমি কত পথ হলাম যে পার
তোমার মত এত অপরূপ সুন্দরী কাউকে যে দেখিনিতো আর।'

'সোনালী খামে মোড়া সবুজে সবুজে ভরা' এই পৃথিবীতে আনন্দ হাসি গান নিজের অন্তররাজ্যেই সৃষ্টি করতে হবে। হৃদয়কে বিকশিত না করলে এই আনন্দ লাভ হবে না। তাই মন চাই— রোমান্টিক মন তৈরী করুন। আবীর কুমকুমের মত হৃদয়ের রঙ দিয়ে মনকে রাঙিয়ে অজস্র প্রেমিক-প্রেমিকার ভালবাসা পেতে তাদের চিঠি লিখুন— 'কতদিন দেখিনি তোমায় ওগো,
মনে পড়ে তব মুখখানি।'
অথবা
'ভালবাসা মোরে ভিখারী করেছে
তোমারে করেছে রানী।'

যদি দেবতাই আপনার প্রাণ হয় তবে ইষ্টদেব কৃষ্ণ বা কালীকে নিয়ে মেতে উঠুন। তাকে আপনার মনোজগতের সিংহাসনে বসিয়ে রান্না করে খাওয়ান। তাকে কোলে করে ঘুমোন, তাকে নিয়ে বেড়াতে বের হোন। নতুন দিনের স্বপ্ন দিয়ে গড়ে তুলুন আপনার অন্তরাজ্যের ব্যক্তিগত পৃথিবী— গড়ে তুলুন মর্তের পৃথিবীতে শান্তির স্বর্গ— অমরত্বের অমরাবতী।

ভগবানই তো আমাদের তৃষ্ণার শান্তি। জীবনের সম্পদ স্নিগ্ধশোভন কান্তি, নিখিল সংসারের সন্তাপ ভঞ্জন। আসুন আমরা সবাই নতুন পৃথিবীর মন্দিব প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে সানন্দে পরম পুরুষ দয়াময়ের চরণ কামনা করি।

নবম অধ্যায়

জীবনের শান্তি তুমি

জীবনের শান্তি তুমি প্রভু দয়াময়
প্রণাম জানাই ওগো চরণে তোমার,
তুমি ছাড়া জীবনে কে আছে আপন
তুমি যে আমার ওগো তুমি যে আমার।
যেদিকে তাকাই দেখি তোমারই যে রূপ
জীবের মাঝারে হেরি তোমার স্বরূপ
অরণ্যে-পবনে গিরি-নভনীলে
শশী-তারকায়-তপনে-সলিলে
তুমি যে হয়ে আছো একাকার।
জীবনের শান্তি তুমি, প্রভু দয়াময়
প্রণাম জানাই ওগো চরণে তোমার।

হে প্রভু, আমি নিজেকে চিনি না, জানি না, পাপে তাপে ক্লিষ্ট হয়ে সংসার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে শুধু তোমারই শরণাপন্ন হয়েছি। তুমি আমাকে গ্রহণ কর! আমি তোমার তুমি আমার। এছাড়া আর অন্য কিছু নেই। হে দীনশরণ—পাপহরণ

পাপোহহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুন্ডরীকাক্ষ সর্বপাপ হরো হরিঃ।।
নমস্তে পুন্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম।
নমস্তে সর্বলোকাত্মন্ নমস্তে তিগ্মচক্রিণে।।
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।। (বিষ্ণুপুরাণ)

প্রভু, আমি ভক্তি জানি না— ধ্যান জানি না— পূজা জানি না। বেদধর্ম—লোকধর্ম, লজ্জা-ঘৃণা-ভয় সব ত্যাগ করেছি শুধু তোমার জন্যে। তুমি আমার প্রেম-তুমি আমার আশা-তুমি ভালবাসা, তুমি আমার স্বর্গ তুমি আনন্দধাম। তোমার চরণ লভিতে শরণ আমি যে আকুল হচ্ছি অবিরাম।

তোমার প্রেম যে বইতে পারি এমন সাধ্য নাই,
এ সংসারে তোমার আমার মাঝখানেতে তাই—
কৃপা করে রেখেছ নাথ অনেক ব্যাবধান,
দুঃখ-সুখের অনেক বেড়া ধন জন মান।

শক্তি যারে দাও বহিতে অসীম প্রেমের ভার
একেবারে সকল স্পর্ধা ঘুচায়ে দাও তার।
না রাখো তার ঘরের আড়াল না রাখো তার ধন,
পথে এনে নিঃশেষে তায় করো আকিঞ্চন।
না থাকে তার মান অপমান লজ্জা-শরম ভয়,
একলা তুমি সমস্ত তার বিশ্বভুবনময়। (রবীন্দ্রনাথ)

হে প্রভু, তুমি সর্বভূতময়— সর্বভূতের অন্তরাত্মা, তোমার সত্তায় আমরা সত্তাবান, তোমার শক্তিতে আমরা শক্তিবান, তোমার জ্যোতিতে সকলই জ্যোতিষ্মান। সলিলে তুমি রস, অনলে যে তুমি তেজ, আকাশে তুমি শব্দ, পৃথিবীতে তুমি পুণ্যগন্ধ আর মনুষ্য মধ্যে পরমাত্মা। সূর্যে-চন্দ্রে-অগ্নিতে যে তেজ তা তোমারই। পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্যে যে শক্তি ভূতগণকে নিজ নিজ স্থানে বিধৃত করে রেখেছে— সে শক্তিতো তুমিই। তুমিই তো পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। হে প্রভু, তুমি কেবল জড় শক্তির উৎস নয়— প্রাণশক্তিরও উৎস। তুমিইতো বলেছিলে— উদ্ভিদ যে শক্তিবলে রসগ্রহণ করে, প্রাণধারণ করে— জীবগণ যে শক্তিবলে খাদ্য পরিপাক করে বেঁচে থাকে— সে শক্তি আমারই।

'পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মক ঃ।।
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্।।' (গীতা)

হে প্রভু, তুমি অনন্ত-অব্যক্তরূপে অখিল জগৎ ব্যাপিয়া রয়েছ। তুমি স্বগুণ-স্বরূপা-চিৎ-অচিৎশক্তিযুক্ত হয়ে জগতে লীলা করছ— তুমি সকল শক্তির প্রস্রবণ— তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম।

'অনন্ত-অব্যক্তরূপেণ যে নেদমখিলং ততং।
চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ।।' (ভাগবত)

তুমি সত্য সনাতন— সত্যং শিবং-সুন্দরম্। তুমি রসস্বরূপ। সেই রস পান করে জীব আনন্দিত হয়। তুমি আনন্দস্বরূপ— তাই জীবের এত আনন্দ। তুমি আনন্দের ঝর্ণা। তোমা থেকে উৎসারিত আনন্দধারায় জীবজগৎ প্লাবিত-আনন্দিত। সেই আনন্দ উপভোগ করে জীবসকল বেঁচে রয়েছে। সংসারে জীবের সঙ্গে তোমার যেন আনন্দলীলা। তাইতো—

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিয়ন্ত্রণ।
তোমায় পেয়ে ধন্য হবে আমার এ জীবন।
আমার মাঝে হোক গো আজ তোমার যতেক লীলা,
তাইতো আমি এসেছি ভবে খেলতে তোমার খেলা।

তবে কেন কারণে অকারণে এত ব্যথা দিচ্ছ ভগবান? সংসারকে করলে কেন

দুঃখের কারাগার? ত্রিতাপ দুঃখ থেকে আমাকে মুক্তকর ঠাকুর! হে সচ্চিদানন্দ, দুঃখ-ব্যথা ভুলে আমাকে তোমার আনন্দসাগরে নিমজ্জিত কর! তুমি বলে দাও— আমি কেমন করে তোমার আনন্দ সাগরে অবগাহন করতে পারব? তোমার আনন্দলীলা বুঝাতে হলে আমাকে কি করতে হবে? তুমি বলে দাও ভগবান— তুমি বলে দাও! সংসার মোহে আবদ্ধ থেকে আমি যে কোন কিছুই বুঝতে পারছি না।

তুমি বলেছিলে— তোমার প্রতি অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস থাকলে দুঃখকে দুঃখই মনে হবে না। কিন্তু আমার তা হচ্ছে না কেন? ঠাকুর হরিদাস বাইশ বেত্রাঘাত খেয়েও হরিনাম ভুলেনি। শ্রীবাস পণ্ডিত পুত্র মারা গেছে জেনেও হরিনামে মত্ত ছিলেন। নিদারুণ দুঃখের মধ্যেও তাদের দুঃখবোধ ছিল না— সকল অবস্থাতেই ছিল বিমল আনন্দ। কারণ তাঁরা ছিলেন বিশুদ্ধ ভক্তির অধিকারী। বিশুদ্ধ ভক্তি আনন্দ-স্বরূপিনী। ঈশ্বরপদে এই ভক্তি যাদের হয়েছে আঘাত তাদের আহত করতে পারে না, অনল তাদের দগ্ধ করে না, সলিল তাদের সিক্ত করে না। শোকে তারা সন্তপ্ত হয় না। কিন্তু আমার যে সে ভক্তি নেই ঠাকুর! তুমি আমাকে বলে দাও, কেমন করে সে ভক্তিলাভ করতে পারব? কিভাবে ভক্তিমান হতে পারব?

হে ভগবান, হে প্রাণের সখা, হে প্রাণগোবিন্দ! তুমি সত্যব্রত, সত্যই তোমার সংকল্প, সত্য তোমার প্রাপ্তির সাধন, তুমি তিনকালেই সত্য— নিত্য বর্তমান। তুমি সত্যের কারণ, সত্যে অধিষ্ঠিত, সত্যের সত্য, তুমি সত্যের প্রকাশ, তুমি অন্তর্যামীরূপে— নিয়ন্তারূপে অধিষ্ঠিত— মূল সত্য। ঋত ও সত্য— তুমি এই দুই এর নেত্রস্বরূপ। সর্বতোভাবে তুমি সত্যাত্মক, আমরা সত্যস্বরূপ তোমার শরণ নিলাম।

'সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যং ঋতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ।।' (ভাগবত)

তুমি সকলের চিত্ত আকর্ষণ কর বলেই কৃষ্ণ, সকলের হৃদয় হরণ কর বলেই হরি, সর্ব অমঙ্গল হরণ করেও হরি নামে খ্যাত, তুমি নারের (সর্বদেহীর) অয়ন (আত্মা) বলে নারায়ণ, তুমি সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ বলে বিষ্ণু (বিষ মানে বিস্তারে), তুমি সুবৃহৎ বলেই ব্রহ্ম (বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম), তুমি সর্বভূতে বাস কর বলে বাসুদেব (সর্বভূতাধিবাসশ্চ বাসুদেবস্ততোহ্যহম্)। সকলই এক তত্ত্ব সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

হে জ্যোতির্ময়, আমার মনের আকাশে তুমি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের জ্যোতি। তোমার অনন্ত আকাশের কোটি সূর্য্যালোকে সে জ্যোতি শেষ হয় না। সে জ্যোতিতে আমার অন্তরাত্মা চৈতন্যে সমুদ্ভাসিত। তুমি আমাকে জ্যোতির্ময় কর!

জগতের সমুদয় কার্যে তুমি রয়েছ। তার মধ্যে মনুষ্যে তোমার বেশি আবির্ভাব। এমন কি জড় বস্তুতেও তুমি রয়েছ। জড়বিজ্ঞান বলে, পদার্থের পরমানুসমূহ

গতিশীল। প্রত্যেক পদার্থ অন্যান্য পদার্থকে আকর্ষণ করে। চুম্বকের আকর্ষণে লৌহ ছুটে গিয়ে তাতে সংলগ্ন হয়। পরমাণুসমূহ বিশিষ্টভাবে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে বিবিধ যৌগ পদার্থের সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীরা তার মধ্যে তোমাকে দেখেছে।

হে প্রভু, তুমি সবার মধ্যে আছো বলেই তো জগতে যা কিছু আমাদের নিকট প্রিয় হয়। তুমি না থাকলে সে বস্তু--- সে দেহ মৃত। তুমি দেহ ছেড়ে চলে গেলে আমরা সে দেহকে আর ভালবাসি না। হে পূর্ণাত্মা! পতির প্রতি অনুরাগবশত কোন পত্নী তাকে ভালবাসে না— ভালবাসে শুধু সেই পতির শরীরে তুমি আছ বলে! আত্মার প্রতি অনুরাগবশতঃই পতি প্রিয় হয়। **আত্মনস্তু কামায় পতি প্রিয়ো ভবতি।** পুত্রের প্রতি অনুরাগবশতঃই জগৎ ও জগতবাসী প্রিয় হয়। এই আত্মা পরমাত্মা, অখিলাত্মা তুমিই! তুমি আনন্দস্বরূপ—রসস্বরূপ ও মধুস্বরূপ। জীব কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সংস্পর্শে যে প্রীতি অনুভব করে— যে আনন্দ লাভ করে তা তোমারই এককণা। তুমিই সকল আনন্দের উৎস— সকল প্রেমের সার। 'তুমি পতি-পুত্রাদি অপেক্ষা প্রিয় যে আমার।'

হে ভগবান! তুমি বলেছ— 'যারা সমস্তকর্ম আমাকে সমর্পণ করে আমাতেই চিত্ত একাগ্র পূর্বক আমার ধ্যান করে আমি তাদের অচিরাৎ সংসার সাগর থেকে উদ্ধার করে থাকি। যাঁর কারো প্রতি কোন দ্বেষ নেই, যে সর্বভূতে মৈত্রী ভাবাপন্ন, দয়াবান, মমত্ব বুদ্ধিশূন্য অর্থাৎ যার 'আমার—আমার' জ্ঞান নেই, যে অহংশূন্য, সুখ দুঃখে যার সমজ্ঞান, ক্ষমাশীল, সংযত আত্মা, দৃঢ় নিশ্চয়, যার মনোবুদ্ধি আমাতে অর্পিত— সে আমার প্রিয়— সে আমার ভক্ত।' কিন্তু আমি যে তা পারি না। কেমন করে সংযত হব— তা তুমি বলে দাও! আমি শক্তিহীন-ভক্তিহীন-প্রকৃতির অধীন। আমাকে পাপ প্রলোভন দমনের শক্তি দাও! আমাকে হাত ধরে তুলে নাও ঠাকুর! আমি যে তোমার জন্যে বাণবিদ্ধ পক্ষীর মত যন্ত্রণায় ছটফট করছি। তুমি বলো ভগবান, আমি কেমন করে তোমাকে পাবো!

আমার কুমতি দূর করে সুমতি দাও! তোমার প্রতি যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে। আমি যেন মুহূর্তের জন্য তোমাকে বিস্মৃত না হই! তুমি আমার প্রাণ—তুমি আমার মন—তুমি আমার জীবনের জীবন। সবশেষে তোমার কাছে আমার অন্তিমবাসনা, হে ভগবান! আমাকে তোমার চরণে লীন করে দাও— তুমি আমার প্রাণের শান্তি— জীবনের জীবন— হৃদয়ের ধন—

জীবনের সার তুমি প্রভু দয়াময়
প্রণাম জানাই ওগো চরণে তোমার।
তুমি ছাড়া জীবনে কেউ নেই আপন
আমি যে তোমার প্রভু তুমি যে আমার।।